দাস্তানে মুজাহিদ

নসীম হিজাযী

দাস্তানে মুজাহিদ
নাসীম হিজাযী

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

চতুর্থ মুদ্রণ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0036-8

DASTAN-E-MUJAHID : By Naseem Hijazi, Published by : Muaz Mohammad Tashfi, BhoiGhor : 43 Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
4rd Print : February 2015, First Edition : February 2012 © reserved

Price : 200 Taka only

১

সূর্য কতবার পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গেছে, চাঁদ হাজার বার তার মাসিক সফর শেষ করেছে, তারার দল লক্ষ বার রাতের আঁধারে আলো ছড়িয়ে ভোরের আলোয় আত্মগোপন করেছে। আদম-সন্তানদের মনের বাগানে বার বার বসন্ত এসেছে, আবার এসেছে শরৎ। জান্নাত থেকে নির্বাসিত মানবতার নতুন বাসভূমি হয়েছে এমন এক সংগ্রাম ক্ষেত্র যেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। দুনিয়ায় এসেছে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লব। তাহযিব-তমদ্দুনের হয়েছে নব রূপায়ণ। হাজার হাজার কওম অধোগতির সর্বনিম্ন স্তর থেকে উঠে এসে ঝড় ঘূর্ণিবায়ুর মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে উত্থান-পতনের সম্পর্ক এমনি দৃঢ় শক্তিশালী, তারা কেউ এখানে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারেনি। যে সব জাতি তলোয়ারের ছায়ায় বিজয়-ডংকা বাজিয়ে জেগে উঠেছিলো, তারাই আবার বাদ্য-গীতের সুর-মূর্ছনায় বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপরের নীল আকাশকে প্রশ্ন কর, তার অন্তহীন বিস্তৃত বুকের ক্যানভাসে অংকিত রয়েছে অতীতের যুগ-যুগান্তরের হাজারো কাহিনী; কত জাতির উত্থান-পতন সে দেখেছে; সে কত শক্তিমান বাদশাহকে রাজমুকুট রাজ-সিংহাসন হারিয়ে ফকিরের লেবাস পরতে দেখেছে, আবার কত ফকিরকে দেখেছে রাজমুকুট পরতে। হয়তো বার বার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি দেখে সে নির্বিকার-উদাসীন হয়ে আছে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলতে পারি, আরবের মরুচারী যাযাবরদের উত্থান-পতনের দীর্ঘ কাহিনী আজো তার মনে পড়ে। সে কাহিনী আজকের এ যুগ থেকে কত ব্যতিক্রম। যদিও কাহিনীর কোনো অংশই কম চিত্তাকর্ষক নয়, তবুও আমাদের সামনে আজ তার এমন এক উজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে, যখন পূর্ব-পশ্চিমের উপত্যকা ভূমি, পাহাড়, মরু-প্রান্তর মুসলমানদের অশ্বের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে, তাদের প্রস্তর বিদীর্ণকারী তলোয়ারের

সামনে ইরান ও রোমের সুলতানের মস্তক অবনমিত হয়েছে। এ ছিলো সেই যুগ, যখন তুর্কিস্তান, আন্দালুস ও হিন্দুস্তান মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে তাদের বিজয়-শক্তি পরীক্ষার জন্য।

বসরার প্রায় বিশ মাইল দূরে উর্বর সবুজে ঢাকা বাগিচার মাঝখানে একটি ছোট্ট বস্তি। সে বস্তির একটি সাদাসিধে বাড়ির আঙিনায় এক মধ্যবয়সী নারী সাবেরা আসরের নামায পড়ছেন। আর একদিকে তিনটি বালক-বালিকা খেলাধুলায় ব্যস্ত। দুটি বালক আর একটি বালিকা। বালক দুটির হাতে ছোট ছোট কাঠের লাঠি। বালিকাটি নিবিষ্ট মনে তাদের কর্মকাণ্ড দেখছে। বড় ছেলেটি লাঠি ঘুরিয়ে ছোট ছেলেটিকে বলছে– দেখো নায়ীম, আমার তলোয়ার!

ছোট ছেলেটি তার লাঠি দেখিয়ে বললো– আমারও তলোয়ার আছে। এসো, আমরা লড়াই করি।

বড় ছেলেটি বললো– না, তুমি কেঁদে ফেলবে।

ছোটটির জবাব– না, তুমিই কেঁদে ফেলবে।

বড়টি বুক ফুলিয়ে বললো– তাহলে এসো এবার!

নিষ্পাপ বালক দুটি একে অপরের উপর হামলা শুরু করলো। আর মেয়েটি কিছুটা পেরেশান হয়ে তামাশা দেখতে লাগলো। মেয়েটির নাম আযরা। ছোট ছেলেটির নাম নায়ীম আর বড়টি আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ নায়ীম থেকে তিন বছরের বড়। তার ঠোঁটের উপর লেগে আছে এক টুকরা মিষ্টি হাসি, কিন্তু নায়ীমের মুখ দেখে মনে হয়, সে যেনো সত্যি সত্যি লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নায়ীম হামলা করছে আর আবদুল্লাহ ধীরভাবে সে হামলা প্রতিরোধ করছে। হঠাৎ নায়ীমের লাঠি আবদুল্লাহর বাহুতে লেগে গেলো। আবদুল্লাহ এবার রেগে গিয়ে হামলা করে বসে। এবার নায়ীমের কব্জিতে চোট লাগলো এবং তার হাতের ছড়িটাও ছিটকে পড়ে গেলো।

আবদুল্লাহ বললো– দেখো, এবার কেঁদে ফেলো না।

: আমি না, বরং তুমিই কেঁদে ফেলবে!

নায়ীম রাগে লাল হয়ে আবদুল্লাহর কথার জবাব দিয়ে মাটি থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে তার মাথায় ছুঁড়ে মারলো। তারপর নিজের লাঠিটা তুলে নিয়ে ঘরের দিকে দে ছুট।

আবদুল্লাহ মাথায় হাত দিয়ে তার পিছু পিছু ছুটলো, কিন্তু এরই মধ্যে নায়ীম

গিয়ে সাবেরার কোলের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করছে।

নায়ীম বললো– আম্মি! ভাইয়া আমায় মেরেছে।

আবদুল্লাহ রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো, কিন্তু মাকে দেখে চুপ করে গেলো।

মা প্রশ্ন করলেন– ব্যাপার কি আবদুল্লাহ! বলো তো!

জবাবে সে বললো– মা! ও আমায় পাথর মেরেছে!

নায়ীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সাবেরা বললেন– কেন লড়াই করছিলে বেটা!

: আমরা তলোয়ার নিয়ে লড়াই করছিলাম। ভাইয়া আমার হাতে ঘা মেরেছে, আমি তার বদলা নিয়েছি।

: তলোয়ার কোথায় পেলে তুমি?

: এই দেখুন আম্মি! নায়ীম তার ছড়িটি দেখিয়ে বললো– এটা কাঠের তৈরি, কিন্তু আমার একটা লোহার তলোয়ার চাই। এনে দেবেন? আমি জেহাদে যাবো।

বাচ্চা ছেলের মুখে জেহাদের কথা শোনার খুশি সেই মায়েরাই জানতো, যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে বলতো–

ওগো কাবার প্রভু!

জাদু আমার, বাছা আমার

হোক বীর মুজাহিদ–

মানবতার বাগিচায় তোমার বন্ধুর লাগানো তরুমূলে

সিঞ্চন করুক যৌবনের রক্তধারা।

নায়ীমের মুখে তলোয়ার এবং জেহাদের কথা শুনে সাবেরার মুখ খুশির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাঁর দেহে মনে জাগে অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ। আনন্দের আবেশে তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। অতীত বর্তমান অপসৃত হয়ে গেলো তার চোখের সামন থেকে। কল্পনায় তিনি তার নওজোয়ান বেটাকে মুজাহিদবেশে খুবসুরত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে দেখেতে পেলেন। তাঁর প্রিয় পুত্র দুশমনের সারি ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে বীরের পদভারে। তিনি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে চলেছেন, দুশমনের হাতী ঘোড়া তার নির্ভীক হামলার সামনে দাঁড়াতে না পেরে পেছনে সরে যাচ্ছে। তাঁর নওজোয়ান বেটা পেছনে সরে যাওয়া দুশমনের হাতী ঘোড়াগুলোকে অনুসরণ

করে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গর্জনমুখর দরিয়ার বুকে। বরাবর সে এসে যাচ্ছে দুশমনের নাগালের ভেতরে। শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত হয়ে কালেমা শাহাদত পড়ে নির্বাক হয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখে ভাসছে, যেনো জান্নাতের হুরদল শারাবন তহুরার পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়। সাবেরা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে সেজদায় মাথা নত করে দোয়া করলেন–

ওগো আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ তায়ালা!

মুজাহিদদের মায়েরা যখন তোমার দরবারে হাজির হবেন, তখন আমি যেনো কারুর পেছনে না থাকি। এ বাচ্চাদের তুমি এমন যোগ্যতা দান করো, যেনো তারা পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারে।

দোয়া শেষ করে সাবেরা উঠে দুই পুত্রকে কোলে টেনে নিলেন।

মানুষের জীবনে এমন হাজারো ঘটনা ঘটে, যা বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অন্তর রাজ্যের অন্তহীন প্রসারের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে বেড়ায়। দুনিয়ার যে কোনো ঘটনা যদি আমরা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করি, তাহলে কতো মামুলি ঘটনাও আমাদের কাছে রহস্যময় হয়ে দেখা দেয়। সেগুলো আমরা নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। তাই যেসব ঘটনা আমাদের মানসিক আবেগ থেকে উচ্চ পর্যায়ের মনে হয়, সেগুলো আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। এ কালের মায়েদের কাছে প্রাচীন যুগের বাহাদুর মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা কত বিস্ময়কর প্রতীয়মান হবে। নিজের কলিজার টুকরাকে আগুন ও রক্তের মাঝে খেলতে দেখার আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে কত ভয়ানক! যে মায়েরা আপন বাচ্চাকে বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়, সিংহের মোকাবেলা করার স্বপ্ন তারা কি করে দেখবে!

আমাদের কলেজ, হোটেল আর কফিখানার পরিবেশে পালিত হয় যেসব নওজোয়ান, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কি করে জানবে পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা লঙ্ঘনকারী মুজাহিদদের অন্তরের রহস্য? সারেঙ্গির সুর-মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়ে যেসব নাজুক মেযাজ মানুষ, তীর নেযার মোকাবেলায় এগিয়ে যাওয়া জওয়ানদের কাহিনী তাদের কাছে কতই না বিস্ময়কর! নীড়ের আশপাশে উড়ে বেড়ায় যেসব পাখি, তারা কি করে পরিচিত হবে আকাশচারী ঈগলের উড়ে বেড়ানোর সাথে।

* * *

সাবেরার জিন্দেগীর শৈশব যৌবন কেটেছে এক অতি সাধারণ পরিবেশে। তাঁর শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে আরবের সেই ঘোড় সওয়ারদের রক্ত, যাঁরা কুফর ও ইসলামের গোড়ার দিকের লড়াইয়ে নিজেদের তলোয়ারের শক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর দাদা ইয়ারমুকের লড়াই থেকে এসেছিলেন গাজী হয়ে, তারপর শহীদ হয়েছিলেন কাদেসিয়ার ময়দানে। ছোটবেলা থেকেই গাজী ও শহীদ শব্দগুলো তাঁর কাছে পরিচিত। আধো আধো বুলি দিয়ে তিনি যখন হরফ উচ্চারণ করার চেষ্টা করতেন, তখন মা তাঁকে প্রথমে শিখিয়েছেন 'আব্বা গাজী' তারপর আরো কিছুকাল পরে শিখিয়েছেন 'আব্বা শহীদ'। এমনি এক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলেই যৌবনে ও বার্ধক্যে তাঁর কাছ থেকে আশা করা যেতো এক কর্তব্যনিষ্ঠ মুসলিম নারীর গুণরাজি। ছোট বেলায় তিনি কত আরব নারীর শৌর্যের কাহিনী শুনেছেন। বিশ বছর বয়সে তাঁর শাদী হয়েছিলো আবদুর রহমানের সঙ্গে। নওজোয়ান স্বামী ছিলেন মুজাহিদের যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। বিশ্বস্ত বিবির মহব্বত তাঁকে ঘরের চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ করে রাখেনি; বরং হামেশা তাঁকে জেহাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আবদুর রহমান যখন শেষবার জেহাদের ময়দানে রওনা হলেন, আবদুল্লাহ তখন তিন বছরের শিশু, আর নায়ীমের বয়স তখন তিন মাসেরও কম। আবদুর রহমান আবদুল্লাহকে তুলে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর নায়ীমকে সাবেরার কোল থেকে নিয়ে আদর করলেন। এ সময় তার মুখের উপর বিষণ্নতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করলেন। জীবনসাথীকে লড়াইয়ের ময়দানে যেতে দেখে ক্ষণিকের জন্য সাবেরার মনোজগতে ঝড় বইতে লাগলো, কিন্তু অনেক কষ্টে তিনি চোখের কোণে উছলে-ওঠা অশ্রুধারা সংযত করে রাখেন।

আবদুর রহমান বলে উঠলেন– সাবেরা! আমার কাছে ওয়াদা করো, যদি আমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে না আসি, তাহলে যেনো ছেলেরা আমার তলোয়ারে জং ধরতে না দেয়।

সাবেরার জবাব– আপনি আশ্বস্ত হোন, আমার বাচ্চারা কারো পেছনে পড়ে থাকে না।

'আল্লাহ হাফেজ' বলে আবদুর রহমান ঘোড়ার রেকাবে পা রাখলেন। ...ন বিদায়ের পর সাবেরা সেজদারত হয়ে দোয়া কর... ...ওগো আসমান

জমিনের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা! ওঁর কদম মজবুত রেখো!

স্বামী-স্ত্রী যখন চেহারা ও চালচলনে একে অপরের কাছে আকর্ষণের পাত্র হয়ে ওঠে, তখন তাদের পরস্পরের প্রতি মহব্বত ভালোবাসা আবেগের সীমায় পৌঁছা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিঃসন্দেহে সাবেরা ও আবদুর রহমানের সম্পর্ক ছিলো দেহ মনের সম্পর্কের মতো। আবদুর রহমানের বিদায়-বেলায় তাদের সুকোমল স্পর্শকাতর অন্তরের আবেগ সংবরণ করে রাখা কিছুটা বিস্ময়করই মনে হয়, কিন্তু কোন্ বৃহত্তর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এসব লোক দুনিয়ার সকল লোভ-লালসা, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কুরবান করতেন? কোন্ সে লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যা তিনশ' তের জন সিপাহীর একটি মুষ্টিমেয় দলকে টেনে আনতো হাজার সিপাহীর মোকাবেলা করতে? কোন্ সে আবেগ মুজাহিদ দলের অন্তরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার, উত্তপ্ত অনন্ত প্রসারিত মরু অতিক্রম করার আর আকাশচুম্বী পর্বতচূড়ায় পদচিহ্ন এঁকে যাবার শক্তির সঞ্চার করেছিলো?

এক মুজাহিদই কেবল এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।

আবদুর রহমানের বিদায়ের পর সাত মাস চলে গেছে। একই বস্তির আরও চার জন লোক ছিলো তাঁর সাথী। একদিন আবদুর রহমানের এক সাথী ফিরে এলো এবং উট থেকে নেমে সাবেরার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। তাকে দেখে বহুলোক তার পাশপাশে জমা হলো। কেউ কেউ আবদুর রহমানের কথা জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু সে কোন জবাব না দিয়ে সোজা গিয়ে সাবেরার বাড়ির ভেতর ঢোকে।

সাবেরা নামাযের জন্য অযু করছিলেন। আগন্তুককে দেখে তিনি উঠে এলেন। লোকটি এগিয়ে এসে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো।

সাবেরা তাঁর অন্তর কম্পন সংযত করে প্রশ্ন করলেন— উনি আসেননি?

আগন্তুকের জবাব— উনি শহীদ হয়ে গেছেন।

: শহীদ! সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে সাবেরার আঁখিকোণ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

লোকটি বললো— শেষ মুহূর্তে যখন তিনি জখমে কাতর, তখন নিজের রক্ত দিয়ে তিনি এ চিঠিখানা লেখে আমার হাতে দিয়েছিলেন।

সাবেরা স্বামীর শেষ চিঠিখানা খুলে পড়লেন—

সাবেরা!

আমার আরজু পুরো হয়েছে। এ মুহূর্তে আমি জিন্দেগীর শেষ শ্বাস গ্রহণ করছি। আমার কানে এসে লাগছে এক অপূর্ব সুর-ঝংকার। আমার আত্মা দেহের কয়েদখানা থেকে আজাদ হয়ে সেই সুরের গভীরতায় হারিয়ে যাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেছে। জখমে ক্লান্ত হয়ে আমি এক অপূর্ব শান্তির স্পর্শ অনুভব করছি। আমার আত্মা এক চিরন্তন আনন্দের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। এখানকার আবাস ছেড়ে আমি এমন এক দুনিয়ায় চলে যাচ্ছি, যার প্রতি কণিকা এ দুনিয়ার তামাম রঙের ছটা আপনার কোলে টেনে নিয়েছে।

আমার মৃত্যুতে চোখের পানি ফেলো না। আমার কাঙ্ক্ষিত-বস্তু আমি অর্জন করেছি। মনে করো না, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। স্থায়ী সৌভাগ্যের এক কেন্দ্রভূমিতে এসে আমরা আবার মিলিত হবো। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা নেই, বসন্ত ও শরতের তারতম্য নেই। যদিও সে দেশ চাঁদ সেতারার বহু উর্ধ্বের, তবুও মর্দে মুজাহিদ সেখানে তার শান্তির নীড় খুঁজে পায়। আবদুল্লাহ ও নায়ীমকে সেই গন্তব্য-পথের সন্ধান দেয়া তোমার ফরয দায়িত্ব। আমি তোমায় অনেক কিছুই লেখতাম; কিন্তু আমার রূহ দেহের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হবার জন্য বেকারার হয়ে পড়েছে। আমার অন্তর প্রভুর পদপ্রান্তে পৌছার জন্য অধীর। আমি তোমায় আমার তলোয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাদের এর কদর কীমত বুঝিয়ে দিও। আমার কাছে তুমি যেমন ছিলে এক কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের কাছে তুমি হবে তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ মা। মাতৃস্নেহ যেনো তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে প্রতিবন্ধক না হয়। তাদের বলবে, মুজাহিদের মৃত্যুর সামনে দুনিয়ার জিন্দেগী অবাস্তব অর্থহীন।

ইতি–

তোমার স্বামী

২

আবদুর রহমান শহীদ হবার পর তিন বছর কেটে গেছে। একদিন সাবেরা তাঁর ঘরের সামনে আঙিনায় এক খেজুর গাছের তলায় বসে আবদুল্লাহকে সবক পড়াচ্ছিলেন। নায়ীম একটা কাঠের ঘোড়া তৈরি করে ছড়িয়ে নিয়ে সেটিকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন দরজায় ঘা মারলো। আবদুল্লাহ জলদি ওঠে দরজা খুলে 'মামুজান' বলে আগন্তুকের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সাবেরা ভেতর থেকে আওয়াজ দিলেন– কে?

বাইরে থেকে জবাব এলো– সাঈদ।

সাঈদ একটি ছোট বালিকার হাত ধরে ঘরের আঙিনায় প্রবেশ করলেন। সাবেরা ছোট ভাইকে সুন্দর আহ্বান জানিয়ে মেয়েটিকে আদর করে প্রশ্ন করলেন– এ তো আযরা নয়! এর চেহারা সুরত তো বিলকুল ইয়াসমিনের মতোই!

: হ্যাঁ বোন, এ আযরা। আমি ওকে আপনার কাছে রেখে যেতে এসেছি। আমার পারস্য দেশে যাবার হুকুম হয়েছে। সেখানে খারেজীরা বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টা করছে। আমি সেখানে খুব শিগগির পৌছে যেতে চাই। আগে ভেবেছিলাম, আযরাকে আর কারো সাথে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো, পরে নিজেই এখান হয়ে যাওয়া ভালো মনে করলাম।

সাবেরা প্রশ্ন করলেন– এখান থেকে কখন রওয়ানা হবার ইরাদা করেছো?

: আজ চলে গেলেই ভালো হয়। আজ আমাদের ফৌজ বসরায় থাকবে, আগামীকাল ভোরে আমরা ওখান থেকে পারস্য দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হবো।

আবদুল্লাহ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো। নায়ীম এতক্ষণ কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলছিলো, এবার সেও এসে দাঁড়ালো আবদুল্লাহর পাশে। সাঈদ নায়ীমকে টেনে কোলে নিলেন। তাকে আদর করে আবার বোনের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। নায়ীম আবার খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু খানিকক্ষণ পর কিছু চিন্তা করে সে আবদুল্লাহর কাছে এসে আযরার দিকে ভালো করে তাকাতে লাগলো। কি যেনো বলতে চাচ্ছিলো সে, কিন্তু লজ্জা তাকে বাধা দিচ্ছিলো। খানিকক্ষণ পর সে সাহস করে আযরাকে বললো, তুমিও ঘোড়া নেবে?

আযরা লজ্জা শরমে সাঈদের পেছনে লুকালো।

সাঈদ আযরার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– যাও বেটি! তোমার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে খেলা করো।

আযরা লাজুক মুখে এগিয়ে গিয়ে নায়ীমের হাত থেকে একটা ছড়ি নিয়ে দু'জনে আঙিনার অপর পাশে গিয়ে নিজ নিজ কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হলো। তাদের মধ্যে ভাব জমতে খুব একটা দেরি হলো না।

নায়ীমের কর্মকাণ্ডে আবদুল্লাহ খুশি হতে পারছিলো না। সে বার বার তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলো, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নায়ীম তার নতুন সঙ্গীর সাথে এতটা ভাব জমিয়ে ফেলেছে, যাতে আবদুল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে আবার অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবদুল্লাহ যখন তাকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগলো তখন সে আর বরদাশত করতে পারলো না।

: দেখুন আম্মি, ভাইয়া আমায় মুখ ভ্যাংচাচ্ছে!

মা বললেন– আবদুল্লাহ! ওকে খেলতে দাও।

আবদুল্লাহ গম্ভীর হয়ে গেলে নায়ীম এবার তাকে মুখ ভ্যাংচাতে শুরু করলো। বিরক্ত হয়ে আবদুল্লাহ মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো।

* * *

আযরা কাহিনী সাবেরার কাহিনী থেকে আলাদা কিছু নয়। দুনিয়ায় এসে কিছু বুঝার মতো বয়স হবার আগেই সে পিতা-মাতার স্নেহের ছায়া হারিয়ে ফেলেছে।

আযরার বাপ ছিলেন ফেস্তাতের বিশিষ্ট লোকদের একজন। বিশ বছর বয়সে

ইরানী মেয়ে ইয়াসমিনের সঙ্গে তাঁর শাদী হয়।

ইয়াসমিনের শাদীর পর প্রথম রাত। প্রিয়তম স্বামীর কোলের কাছে থেকে সে গড়ে তুলছিলো আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন জগত। কামরায় জ্বলছিলো কয়েকটি মোমবাতি। নববধূ ইয়াসমিন আর স্বামী জহিরের চোখে ছিলো নেশার ঘোর, কিন্তু সে নেশা ঘুমের নেশা থেকে আলাদা।

জহিরের প্রশ্ন– ইয়াসমিন! সত্যি সত্যি বলো তো, তুমি খুশি হয়েছো কি না?

নব-দুলহান অনন্ত সুখের আবেশে আধো নির্মীলিত চোখ দুটি একবার ওপরে তুলে আবার নীচু করলো।

জহির আবার একই প্রশ্ন করলেন। এবার ইয়াসমিন স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। লজ্জা ও আনন্দের গভীর আবেগে আত্মহারা হয়ে এক মুগ্ধকর হাসি টেনে এনে সে স্বামীর হাতের উপর হাত রাখলো। তার এ বাকহীন জবাব কতো বেশি অর্থপূর্ণ! এ সেই মুহূর্ত, যখন রহমতের ফেরেশতার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দগীতি আর ইয়াসমিনের কম্পিত অন্তর জহিরের অন্তর-কম্পনের জবাব দিচ্ছে। মুখের কথা যেনো হারিয়ে ফেলেছে তার বাস্তবতা। জহির আবার একই প্রশ্ন করলেন।

: নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করুন! ইয়াসমিন জবাব দিলো।

জহির বললেন– আমার অন্তরে তো আজ খুশির তুফান উদ্বেল হয়ে ওঠছে। আমার মনে হয় যেনো আজ সৃষ্টির সব কিছুই আনন্দে মুখর। আহা! এর ঝংকার যদি চিরন্তন হতো!

: আহা! ইয়াসমিনের মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত আগে তার যে কালো কালো ডাগর চোখ দুটি ছিলো আনন্দ-আবেগে উচ্ছ্বল, ভবিষ্যতের চিন্তায় তা হঠাৎ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জহির প্রিয়তমা পত্নীর চোখ অশ্রুসজল দেখে কেমন যেনো আপন ভোলা হয়ে গেলেন।

: ইয়াসমিন! ইয়াসমিন! কেঁদে ফেললে তুমি? কেন?

: না। ইয়াসমিন হাসার চেষ্টা করে জবাব দিলো। অশ্রুভেজা হাসি যেনো তার রূপের ছটা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো।

: না, কেন? সত্যি সত্যি তো কাঁদছো তুমি। ইয়াসমিন, কি মনে পড়লো তোমার? তোমার চোখের আঁসু দেখা যে আমার বরদাশতের বাইরে।

ইয়াসমিন মুখের উপর হাসির আভা টেনে আনার চেষ্টা করে জবাব দিলো– একটা কথা আমার মনে এসেছিলো!

জহির প্রশ্ন করলেন– কি কথা?

: এমন কিছু নয়। হালিমার কথা মনে পড়ছিলো আমার। বেচারীর শাদীর পর এক বছর না যেতেই ওর স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

জহির বললেন– এ ধরনের মরণের কথা ভেবে আমি ঘাবড়ে উঠি। বেচারা রোগে বিছানায় পা ঘষে ঘষে জান দিলো। এর চাইতে একজন মুজাহিদের মৃত্যু কতো ভালো! কিন্তু আফসোস, সে সৌভাগ্য ওর হলো না। বেচারার নিজেরও কোনো কসুর ছিলো না এতে। ছেলেবেলা থেকেই ও ছিলো নানারকম ব্যাধির শিকার। মৃত্যুর ক'দিন আগে আমি যখন ওর অবস্থা জানতে গেলাম, তখন ও এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে। ও আমায় পাশে ডেকে বসালো। আমার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'তুমি খুবই খোশ-কিসমত! তোমার বাহু লোহার মতো মজবুত। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তুমি যুদ্ধ ময়দানে দুশমনের তীর নেযার মোকাবেলা কর, আর আমি এখানে পড়ে পা ঘষে ঘষে মরছি। দুনিয়ায় আমার আসা না আসা সমান। ছোটবেলায় আমার চোখে ছিল মুজাহিদ হবার স্বপ্ন। কিন্তু যৌবনে এসে বিছানা ছেড়ে কয়েক পা চলাও আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লো। কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আমি ওকে কতো সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু ও ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলো। জেহাদে যাবার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়েই ও চলে গেছে, কিন্তু ওর ভেতরে ছিলো এক মুজাহিদের অন্তর। মৃত্যুকে ওর ভয় ছিলো না, কিন্তু এ ধরনের মরণ ও চায়নি।'

জহিরের কথা শেষ হলে দু'জনই গভীর চিন্তায় অভিভূত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ভোরের আভাস তখন দেখা দিচ্ছে। মুয়ায্যিন দুনিয়ার মানুষের গাফলতের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নামাযে শরীক হবার খোদায়ী হুকুম শুনিয়ে দিচ্ছে। তারা দু'জনই সে হুকুম তামিল করার জন্য তৈরি হচ্ছে, অমনি কে যেনো দরজায় আঘাত করে। জহির দরজা খুলে দেখলেন, সামনে সাঈদ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লৌহ-আবরণে ঢেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রয়েছেন। সাঈদ ঘোড়া থেকে নামলেন। জহির এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে বুক মিলালেন।

সাঈদ আর জহির ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের দোস্ত। এ দোস্তি তাঁদের সহোদর ভাইয়ের চাইতেও কাছে টেনে এনেছে। দু'জন লেখাপড়া করেছেন একই জায়গায়। একই জায়গায় তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা শিখেছেন, আর কত ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাহুর শক্তি আর তলোয়ারের তেজ দেখিয়েছেন। সাঈদ

জহিরকে এমন হঠাৎ আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

সাঈদ বললেন– কায়রুনের গভর্নর আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

: সব খবর ভালো তো!

: না। জবাব দিলেন সাঈদ। আফ্রিকায় দ্রুতগতিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে। রোমের লোকেরা জাহেল-মূর্খ বার্বারদের উস্‌কানি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই বিদ্রোহের আগুন নেভাতে নতুন ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। গভর্নর দরবারে খেলাফতে সাহায্যের আবেদন করে বিফল হয়েছেন। নাসারা শক্তি আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পারলে আমরা চিরদিনের জন্য বিশাল ভূখণ্ড হারিয়ে ফেলবো। তাই গভর্নর এই চিঠি দিয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

জহির চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠির মর্ম হচ্ছে– 'সাঈদ তোমায় আফ্রিকার অবস্থা খুলে বলবে। মুসলমান হিসেবে তোমার ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, যতো সিপাহী সংগ্রহ করতে পার, তাদের নিয়ে শিগ্‌গিরই এখানে পৌঁছবে। খলিফার দরবারেও আমি এক চিঠি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আরবের লোকেরা নানারকম গৃহবিবাদে লিপ্ত রয়েছে। তাতে ওখান থেকে আমার কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। নিজের তরফ থেকে তুমি চেষ্টা করো।

জহির এক নওকরকে ডেকে সাঈদের ঘোড়াটি তার হাওয়ালা করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন ঘরের এক কামরায়। তাঁর চোখ থেকে ততক্ষণে প্রিয়া মিলনের রাতের নেশা কেটে গেছে। অপর কামরায় গিয়ে দেখলেন ইয়াসমিন আল্লাহর দরগায় সেজদায় পড়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তার অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে। তিনি ফিরে এসে সাঈদের কাছে দাঁড়ান। বলেন– সাঈদ! আমার শাদী হয়ে গেছে!

: মোবারক হোক! কবে?

: গতকাল।

: মোবারক হোক! সাঈদের মুখে হাসি, কিন্তু মুহূর্তে সে হাসি কোথায় উবে গেলো। তিনি পুরনো বন্ধুর চোখের উপর চোখ রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি যেনো সুধাচ্ছে, এই যে শাদীর আনন্দ, তা তোমায় জেহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখবে না তো? জবাবে জহিরের চোখ প্রকাশ করছিলো সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

* * *

দুনিয়ার কম বেশি প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অবশ্য এমন সব মুহূর্ত আসে যখন সে উচ্চস্তরে পৌঁছার অথবা মহৎকর্ম করার সুযোগ পায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা লাভ-লোকসানের হিসাব করে সে মওকা হারিয়ে ফেলি।

সাঈদ প্রশ্ন করলেন– চিঠি সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করলেন?

জহির হাসতে হাসতে সাঈদের কাঁধে হাত রেখে বললেন– এতে আমার চিন্তার কি আছে, চলো!

'চলো' কথাটা বাইরে খুবই সহজ, কিন্তু জহিরের মুখে কথাটা শুনে সাঈদের মন যে পরিমাণ খুশি হয়, তা আন্দাজ করা কঠিন। নিজের অলক্ষ্যে তিনি বন্ধুর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। জহিরের মুখে আর কোনো কথা নেই। তিনি সাঈদকে সাথে নিয়ে ঘরের বাইরে মসজিদের দিকে চললেন।

ফজরের নামাযের পর জহির বক্তৃতা করতে উঠলেন। মুজাহিদের কথায় প্রভাব বিস্তার করতে না লাগে সুন্দর সুন্দর শব্দ সংযোজন আর না লাগে লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি। তাঁর সাদাসিধা আবেগপূর্ণ কথাগুলো লোকের অন্তরে বসে গেলো। বক্তৃতার মধ্যে তিনি উঁচু গলায় বললেন–

মুসলমান ভাইগণ!

আমাদের স্বার্থচিন্তা ও গৃহবিবাদ আমাদের কখনোই রক্ষা করতে পারবে না। রোম ও ইউনান (গ্রিস)-এর যে সালতানাতকে আমরা বহুবার পদদলিত করেছি, আজ এ মুহূর্তে তারা আর একবার আমাদের মোকাবেলা করার সাহস করছে। তারা ইয়ারমুক ও আজনাদাইনের পরাজয় ভুলে গেছে। আসুন! আমরা তাদেরকে আরেকবার জানিয়ে দেই, ইসলামের মর্যাদা হেফাজত করার জন্য মুসলমান অতীতের মতো আজো তার বুকের খুন অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে। তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র করে আফ্রিকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। তাদের ধারণা, গৃহবিবাদের ফলে আমরা দুর্বল শক্তিহীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি বলতে চাই, যতক্ষণ একটিমাত্র মুসলমানও বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ আমাদের দিকে তাদেরকে তাকাতে হবে ভীতির দৃষ্টিতে।

মুসলমানগণ!

আসুন, আমরা আবার তাদেরকে বলে দেই, হযরত উমর (রা.)-এর জমানায় যেমন ছিলো, আজো আমাদের সিনায় রয়েছে সেই একই উদ্যম, বাহুতে

রয়েছে সেই শক্তি আর তলোয়ারে রয়েছে সেই তেজ।

জহিরের বক্তৃতার পর আড়াইশ' নওজোয়ান তাঁর সাথী হবার জন্য তৈরি হলো।

* * *

ইয়াসমিনের জিন্দেগীর সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল স্বামী তার চোখের সামনে থেকে বিদায় নিয়ে চলেছেন যুদ্ধ ময়দানের দিকে। তার মনের আগুন চোখের পথে বেরিয়ে আসতে চাইছে আঁসুর ধারায়। কিন্তু স্বামীর সামনে নিজেকে সাহসহীন প্রমাণিত করতে তার আত্মমর্যাদাবোধ বাধা দিচ্ছে। চোখের আঁসু চোখেই চাপা পড়ে যাচ্ছে।

জহির তাকালেন তাঁর বিবির মুখের দিকে। দুঃখ ও বিষণ্ণতার মূর্তরূপ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চোখের সামনে। তাঁর অন্তর বলছে আরো এক লহমা দেরি করতে, আরো কয়েকটি কথা বলতে, কিন্তু সে অন্তরেরই আর এক দাবী– আর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে।

'আচ্ছা ইয়াসমিন, আল্লাহ হাফেয' বলে জহির লম্বা লম্বা কদম ফেলে দরজার দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে বাইরে যাবার উপক্রম করলেন। কি যেনো ভেবে হঠাৎ আপনা থেকেই তিনি থেমে গেলেন। যে ধারণা তিনি কখনো মনের কাছেও আসতে দেননি, তা যেনো বিদ্যুৎগতিতে তার মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেললো। অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি তার ক্ষীণ দুর্বল আওয়াজে শুধু জানিয়ে দিলো, হয়তো এই-ই তাদের শেষ মোলাকাত। মুহূর্তের মধ্যে এ ধারণা যেনো এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিলো। জহিরের পা আর এগুতে চাইছে না। ইয়াসমিন কয়েক কদম এগিয়ে এলো। জহির চোখ বন্ধ করে দু'বাহু প্রসারিত করে দিলেন। ইয়াসমিন কান্নাভারাতুর চোখে আত্মসমর্পণ করলো তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে।

: ইয়াসমিন!

: স্বামী!

যে অশ্রুধারা ইয়াসমিন তার অন্তরের গভীরে গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো, অলক্ষ্যে তা এবার বাঁধমুক্ত হলো। দু'জনেরই অন্তর তখন কাঁপছে, কিন্তু কাঁপন অতি মৃদু এবং ধীরে ধীরে তা যেনো মৃদুতর হয়ে আসছে। সমগ্র

সৃষ্টি যেনো এক অপূর্ব সুর-ঝংকারে মুখর। কিন্তু সে সুরের তান যেনো আগের চাইতে আরো গভীর হয়ে আসছে। মুজাহিদের পরীক্ষার মুহূর্ত সমাগত। তা হলো প্রেম আর কর্তব্যের অনুভূতির সংঘাত। সৃষ্টির সুর-মূর্ছনা মৃদুতর হয়ে এসেছে আর সে মুহূর্তে জহিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসমিন– কেবলই ইয়াসমিন। সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বের প্রতিমূর্তি ইয়াসমিন। বর্ণগন্ধময় দুনিয়া! আর অপর দিকে অন্তরাত্মার হুকুম। সেই গভীর সুরের জগতে আবার লাগে কাঁপন। মৃদু সুরঝংকার আবার তীব্রতর হয়ে ওঠে। জহির তার কম্পিত পা দু'খানি আবার সামলে নেন। হাতের চাপ ঢিলা হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত দু'জন সামনা সামনি আলাদা হয়ে দাঁড়ান।

জহির বললেন– ইয়াসমিন! এ যে কর্তব্যের ডাক!

ইয়াসমিন জবাব দেয়– স্বামী! আমি তা জানি।

: আমার ফিরে আসা পর্যন্ত হানিফা তোমার প্রতি খেয়াল রাখবে। তুমি ঘাবড়াবে না তো?

: না, আপনি আশ্বস্ত হোন।

: ইয়াসমিন! এবার হেসে দেখাও তো আমায়! এমনি মুহূর্তে বাহাদুর নারী কখনো চোখের পানি ফেলে না। তুমি এক মুজাহিদের বিবি।

স্বামীর হুকুম তামিল করতে গিয়ে ইয়াসমিন হাসলো, কিন্তু সে হাসির সাথে সাথেই দুটি বড় অশ্রুবিন্দু তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো।

: স্বামী, আমায় মাফ করুন! অশ্রু মুছে ফেলতে ফেলতে সে বললো– আহা! আমিও যদি এক আরব মায়ের কোলে পালিত হতাম! কথাটি শেষ করতে করতে সে এক গভীর বেদনার আবেশে চোখ মুদলো। আর একবার সে তার বাহু প্রসারিত করলো জহিরের দিকে। কিন্তু চোখ খুলে সে দেখলো, তার প্রিয়তম স্বামী আর নেই সেখানে।

ইয়াসমিন পালিত হয়েছিলো এক ইরানী মায়ের কোলে। তাই আরব-নারীর তুলনায় তার ভেতর নারীসুলভ কোমলতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিলো বেশি। জহির বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর তার অস্থিরতা চাঞ্চল্য সীমা ছাড়িয়ে গেলো। তার চোখে বদলে গেলো দুনিয়ার রূপ। পুরনো পরিচারিকা হানিফা সব রকম চেষ্টা করে তার মন আশ্বস্ত করতে চাইতো। কয়েকমাস পরে ইয়াসমিন বুঝলো, তার দেহের মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছে আর একটি নতুন মানুষ। এরই মধ্যে স্বামীর কাছ থেকে কয়েকখানি চিঠিও এসেছে তার কাছে।

হানিফা জহিরকে লিখে জানিয়েছে– তোমার ঘরে শিগ্গিরই এক ছোট্ট মেহমান আসবে। ফিরে এসে দেখবে, ঘরের রওনক বেড়ে গেছে অনেকখানি। হ্যাঁ, তোমার বিবি কঠিন মর্মপীড়ার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছুটি পেলে কয়েক দিনের জন্যে এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যেয়ো।

আট মাস পর জহির লেখলেন– দু'মাসের মধ্যে তিনি ঘরে ফিরে আসবেন। এ চিঠি পেয়ে প্রতীক্ষার জ্বালা ইয়াসমিনের কাছে আগের চাইতে বেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে। দিনের প্রশান্তি আর রাতের নিদ্রা তার জন্য হারাম হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে শরীরও ভেঙ্গে পড়ে।

জহিরের অপেক্ষার সাথে সাথে ছোট্ট মেহমানের অপেক্ষাও বেড়ে চললো। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার মেয়াদ শেষ হলো এবং জহিরের ঘরের নীরব পরিবেশ একটি শিশুর কলশব্দে কিছুটা প্রাণময় হয়ে ওঠে। এ শিশুই আযরা।

আযরার পয়দায়েশের পর ইয়াসমিনের হুঁশ হলে চোখ খুলেই সে প্রথম প্রশ্ন করলো– উনি এলেন না?

হানিফা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললো– উনিও এসে যাবেন।

: এ-ত দেরি? আল্লাহ জানেন, কবে আসবেন তিনি!

* * *

আযরা জন্মাবার পর তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। ইয়াসমিনের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙ্গে পড়ছে। রাতে ঘুমের মধ্যে বারংবার সে জহিরের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উঠে বসে। কখনো আবার ঘুমের মধ্যে চলতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়।

হানিফা ঘুমে, জাগরণে, ওঠা-বসায় তাকে সান্ত্বনা দেয়। এছাড়া আর সে কি-ই বা করতে পারে?

একদিন দুপুর বেলা ইয়াসমিন তার বিছানায় শুয়ে আছে। হানিফা তার কাছে এক কুরসিতে বসে আযরাকে আদর করছে। এমন সময় কে যেনো ঘা দিলো দরজার উপর।

ইয়াসমিন নেহায়েত ক্ষীণ দুর্বল আওয়াজে বলল– কে যেনো ডাকছে।

হানিফা আযরাকে ইয়াসমিনের পাশে শুইয়ে রেখে বাইরে গিয়ে দরজা খুলে

দিলো। সামনে সাঈদ দাঁড়ানো।

হানিফা পেরেশান হয়ে বললো– সাঈদ! তুমি এসেছো? জহির কোথায়? সে এলো না?

ইয়াসমিনের কামরা যদিও বাইরের দরজা থেকে বেশ দূরে, তবুও হানিফার কথাগুলো তার কানে পৌঁছে গেছে। সাঈদের নাম শুনেই তার কলিজা ধড়ফড় করে ওঠে। এক লহমার মধ্যে তার মনে হাজারো দুর্ভাবনা জেগে ওঠে। হাতে কম্পিত বুকখানি চেপে ধরে সে বিছানা থেকে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো হানিফার কাছ থেকে দু'তিন কদম পেছনে। হানিফা দরজায় দাঁড়িয়ে তখনও চেয়ে আছে সাঈদের মুখের দিকে, তাই ইয়াসমিনের আগমন সে লক্ষ্য করতে পারেনি। সাঈদ দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরজার বাইরে। তাই ইয়াসমিনকে দেখতে পাননি।

হানিফা আর একবার প্রশ্ন করলো, কিন্তু সাঈদ নীরব।

: সাঈদ! হানিফা বললো– জবাব দিচ্ছো না কেন, তবে কি সে...?

সাঈদ গর্দান তুলে হানিফার দিকে তাকালেন। তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু কথা ফুটছে না তাঁর মুখে। তার বড় বড় খুবসুরত চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠেছে অসাধারণ দুঃখ ও বিষাদের ছাপ।

হানিফা আবার বললো– সাঈদ...! কথা বলো!

: উনি শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আফসোস, আমি জিন্দা ফিরে এসেছি!

কথা বলতে বলতে সাঈদের চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো।

সাঈদের মুখের কথা শেষ হতেই হানিফার পেছনে একটা চিৎকার-ধ্বনি শোনা গেলো এবং ধপ্ করে জমিনের উপর কিছু পড়ে যাবার আওয়াজ এলো। হানিফা ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে ফিরলো। সাঈদও হয়রান হয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। ইয়াসমিন ততক্ষণে নীচের দিকে মুখ দিয়ে পড়ে রয়েছে।

সাঈদ জলদি করে তাকে তুলে কামরায় নিয়ে বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। তার হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চললো। অবশেষে হতাশ হয়ে তিনি ছুটলেন হাকিম ডাকতে। খানিকক্ষণ পর হাকিম নিয়ে ফিরে এসে সাঈদ দেখলেন, মহল্লার বহু নারী জমা হয়েছে জহিরের ঘরে। হাকিমকে দেখে একজন বললো– এখন আর আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। সে চলে গেছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে শহরের হাকিম ইয়াসমিনের জানাযা পড়ালেন।

জহিরের শাহাদাতের খবর রটে গেলো চারদিকে। তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হলো। তারপর দোয়া করা হলো জহির ও ইয়াসমিনের স্মরণচিহ্ন আযরার দীর্ঘজীবন কামনায়।

সাঈদ সে দিনই আযরাকে এক ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন। হানিফাকে বললেন– তুমি জহিরের বাড়িতে থাকতে চাইলে আমি তোমার সব খরচ বহন করতে তৈরি। আর আমার বাড়িতে থাকা পছন্দ করলে আমি তোমার খেদমত করবো।

হানিফা বললো– আমি হলবে নিজের ঘরে চলে যেতে চাই। ওখানে আমার এক ভাই রয়েছে। ওখানে মন না বসলে আমি আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে।

সাঈদ হানিফার সফরের ব্যবস্থা করে পাঁচশ' দিনার দিয়ে তাকে বিদায় করলেন।

দু'বছর পর সাঈদ আযরাকে ধাত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে নিজেই তাকে লালন পালন করতে লাগলেন। পারস্যে খারেজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাবার সময় তিনি আযরাকে সাবেরার নিকট রেখে গেলেন।

৩

লোকালয়ের বাগ-বাগিচার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। পোষা জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য লোকালয়ের বাসিন্দারা নদীর কিনারে একটি তালাব খুদে গেছে। এটি নদীর পানিতে ভরে থাকে। তালাবের আশপাশে দেখা যায় খেজুর গাছের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। লোকালয়ের ছেলেমেয়েরা প্রায় সব সময়েই এসে খেলা করে এখানে।

একদিন আবদুল্লাহ, নায়ীম ও আযরা মহল্লার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেখানে খেলতে গেলো। আবদুল্লাহ তার সমবয়সী ছেলেদের সাথে গোসল করতে নামলো তালাবের মধ্যে। নায়ীম আর আযরা তালাবের কিনারে দাঁড়িয়ে রইলো। সেখান থেকে তারা বড় ছেলেদের সাঁতার কাটা, লম্ফঝম্প ও দাপাদাপি দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠছে। কোনো ব্যাপারেই নায়ীম তার ভাইয়ের পেছনে পড়ে থাকতে চায় না। সাঁতার কাটতে সে শেখেনি, কিন্তু আবদুল্লাহকে সাঁতার কাটতে দেখে সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। আযরার দিকে তাকিয়ে সে বললো– এসো আযরা! আমরাও গোসল করবো।

আযরা জবাব দিলো– আম্মিজান রেগে যাবেন।

: আবদুল্লাহর ওপর তো তিনি রাগ করেন না। আমাদের ওপর কেন রাগ করবেন তাহলে?

: উনি তো বড়ো। উনি সাঁতরাতে জানেন। তাই আম্মি রাগ করেন না।

: আমরা গভীর পানির দিকে যাবো না; বরং এসো আমরা চলে যাই।

আযরা মাথা নেড়ে বললো– উঁহু!

: ডর লাগছে তোমার?

: না তো!

: তবে চলো।

নায়ীম যেমন সব কিছুতে আবদুল্লাহর অনুসরণ করতে চায়– শুধু তাই নয়; বরং তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, তেমনি আযরাও নায়ীমের সামনে তার দুর্বলতা স্বীকার করতে চায় না। নায়ীম হাত বাড়িয়ে দিলে আযরা তার হাত ধরে পানিতে ঝাঁপ দিলো। কিনারের দিকে পানি খুব গভীর নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে চললো গভীর পানির দিকে। আবদুল্লাহ ছেলেদের সাথে অপর কিনারে খেজুর গাছের একটা গুঁড়ির ওপর থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। আবদুল্লাহর নজর যখন নায়ীম ও আযরার ওপর পড়লো, তখন পানি তাদের গর্দান বরাবর ওঠেছে। তখনও দু'জন পরস্পরের হাত ধরে রয়েছে। আবদুল্লাহ ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো। কিন্তু তার আওয়াজ পৌঁছার আগেই আযরা ও নায়ীম গভীর পানিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। আবদুল্লাহ দ্রুত সাঁতার কেটে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। তার আসার আগেই নায়ীমের পা জমিনের নাগাল পেয়েছে। কিন্তু আযরা তখনও হাবুডুবু খাচ্ছে। আবদুল্লাহ নায়ীমকে নিরাপদ দেখে এগিয়ে গেলো আযরার দিকে।

আযরা হাত-পা মারছে তখনও। আবদুল্লাহ কাছে এলে সে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তার বোঝা বয়ে নিয়ে সাঁতার কাটার সাধ্য আবদুল্লাহর নেই। আযরা তাকে এমন ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সে তার বাহু ঠিকমতো নাড়তে পারছে না। দু'তিন বার সে পানিতে ডুবে ডুবে ভেসে উঠলো আবার। এরই মধ্যে নায়ীম কিনারে চলে গেছে। সে আর সব ছেলেদের সাথে মিলে শুরু করলো ডাক-চিৎকার। তখন এক রাখাল উটকে পানি খাওয়াতে এসেছিলো তালাবের দিকে। ছেলেদের ডাক-চিৎকারে সে ছুটে এলো এবং কিনারে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেই কাপড়-চোপড় নিয়েই পানিতে ঝাঁপ দিলো। আযরা ততক্ষণে বেহুঁশ হয়ে আবদুল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছে তার বাহুবন্ধন থেকে। সে তখন এক হাতে আযরার মাথার চুল ধরে অপর হাত দিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে।

রাখাল দ্রুতগতিতে গিয়ে আযরাকে ধরে ওপরে তুললো। আবদুল্লাহ আযরার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে কিনারের দিকে সাঁতরে গেলো। রাখাল আযরাকে পানি থেকে তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো সাবেরার ঘরের দিকে।

আবদুল্লাহ তালাব থেকে উঠে এলে নায়ীম ঝট করে ছুটে গেলো অপর কিনারে। সেখান থেকে সে আবদুল্লাহর কাপড়গুলো নিয়ে এলো। আবদুল্লাহ কাপড় পরতে পরতে নায়ীমের পানে তার ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানলো। নায়ীম আগেই হতভম্ব হয়ে গেছে। ভাইয়ের ক্রোধের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে সে হু হু

করে কেঁদে ফেললো। আব্দুল্লাহ নায়ীমকে কাঁদতে দেখেছে খুব কম। নায়ীমের চোখের পানি তার মনকে মোমের মতো গলিয়ে দেয়। সে বললো– তুমি একটা গাধা হয়ে গেছো। ঘরে চলো।

নায়ীম কান্না জড়ানোকণ্ঠে বললো– আম্মি মারবেন। আমি যাবো না।

আবদুল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– মারবেন না।

আবদুল্লাহর সান্ত্বনা-ভরা কথা শুনে নায়ীমের চোখের পানি শুকিয়ে গেলো। সে এবার চললো ভাইয়ের পিছু পিছু।

রাখাল আযরাকে নিয়ে যখন সাবেরার ঘরে পৌঁছলো, তখন সাবেরার পেরেশানীর আর অন্ত নেই। আশপাশের ছেলেমেয়েরাও জমা হয়েছে সেখানে। বহু চেষ্টার পর আযরার হুঁশ ফিরে এলো। সাবেরা রাখালকে লক্ষ্য করে বললেন– এসব নায়ীমের দুষ্টুমির ফল হবে। আযরাকে ওর সঙ্গে বাইরে পাঠাতে আমি সব সময়ই ভয় করি। পরশুও একটা ছেলের মাথা ফুটো করে দিয়েছে। আচ্ছা, আজ একবার ঘরে এলেই হয়!

রাখাল বললো– এতে নায়ীমের কোন কসুর নেই। সে তো কেবল কিনারে দাঁড়িয়ে ডাক-চিৎকার দিচ্ছিলো। তার আওয়াজ শুনেই আমি তালাবের কাছে ছুটে এসে দেখি, আপনার বড় ছেলে আযরার চুল ধরে টানছে আর সে হাবুডুবু খাচ্ছে।

: আবদুল্লাহ! সাবেরা হয়রান হয়ে বললেন, সে তো এমন নয় কখনও!

রাখাল বললো– আজ তো আমিও তার কর্মকাণ্ড দেখে হয়রান হয়ে গেছি। আমি সময়মতো না পৌঁছলে নিষ্পাপ মেয়েটি ডুবেই মারা যেতো!

ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ ঘরে পৌঁছলো। নায়ীম তার পিছু পিছু মাথা নীচু করে হাঁটছে। আবদুল্লাহ সাবেরার মুখোমুখি হলে নায়ীম গিয়ে তার পেছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো।

সাবেরা রাগ-গোস্সার স্বরে বলে ওঠলেন– আবদুল্লাহ, যাও! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আমার ধারণা ছিলো, বুঝি তোমার কিছুটা বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, কিন্তু আজ তুমি নায়ীমেরও থেকে চার পা এগিয়ে গেছো। আযরাকে সঙ্গে নিয়েছিলে ডুবিয়ে মারার জন্য?

সারা পথ আবদুল্লাহ নায়ীমকে বাঁচাবার কৌশল চিন্তা করেছে। এ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনায় সে হয়রান হয়ে গেলো। সে বুঝলো, নায়ীমের কসুর তার ঘাড়েই চেপে বসেছে। সে পেছন ফিরে তাকালো। ছোট্ট ভাইটির চোখে সে দেখতে পেলো এক আকুল আবেদন। তাকে বাঁচাবার একটিমাত্র উপায় আবদুল্লাহর

সামনে। যে অপরাধ সে করেনি, তাই তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। ভেবে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মায়ের ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা সে নীরবে হজম করে গেলো।

রাতের বেলা আযরার কাশিসহ জ্বর দেখা দিলো। সাবেরা শিয়রে বসে রয়েছেন। নায়ীমও নেহায়েত বিষণ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে আছে। আবদুল্লাহ ভেতরে ঢুকলো। চুপি চুপি সে গিয়ে দাঁড়ালো সাবেরার পাশে। সাবেরা তার দিকে লক্ষ্য না করে আযরার মাথা টিপে দিচ্ছিলেন। নায়ীম হাত দিয়ে আবদুল্লাহকে চলে যেতে ইশারা করলো এবং হাত মুঠো করে তাকে বুঝাতে চাইলো, এখ্‌খুনি তার চলে যাওয়া উচিত; নইলে ফল ভালো হবে না। আবদুল্লাহ মাথা নেড়ে জবাব দিলো, সে যাবে না।

নায়ীমকে ইশারা করতে দেখে সাবেরা আবদুল্লাহর দিকে নজর তুললেন। আবদুল্লাহ মায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ঘাবড়ে গেলো। সে বললো– আযরা কেমন আছে?

সাবেরা আগে থেকেই রেগে রয়েছেন। এবার আর সামলাতে পারলেন না। 'দাঁড়াও বলছি'– বলে তিনি উঠে আবদুল্লাহর কান ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আঙ্গিনার একধারে আস্তাবল। সাবেরা আবদুল্লাহকে সেদিকে নিয়ে গিয়ে বললেন– আযরা কেন এখনও মরেনি, তাই দেখতে গিয়েছিলে বুঝি? রাতটা এখানেই কাটাও। আবদুল্লাহকে হুকুম দিয়ে সাবেরা গিয়ে আবার আযরার শিয়রে বসলেন।

নায়ীম যখন খেতে বসলো, তখন ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ে গেলো। লোকমা তার গলা দিয়ে সরতে চাইলো না। ভয়ে ভয়ে সে মাকে জিজ্ঞেস করলো– আম্মি! ভাইয়া কোথায়?

: আজ সে আস্তাবলেই থাকবে।

: আম্মি, তাকে খাবার দিয়ে আসবো?

: না। খবরদার, তার কাছে গেলে...!

নায়ীম কয়েকবার লোকমা তুললো, কিন্তু তার হাত মুখের কাছে গিয়ে থেমে গেলো।

সাবেরা প্রশ্ন করলেন– খাচ্ছো না?

: খাচ্ছি আম্মি। নায়ীম জলদি করে একটি লোকমা মুখে দিয়ে জবাব দিলো। সাবেরা এশার নামাযের অযু করতে উঠলেন। অযু করে ফিরে এসে নায়ীমকে তেমনি বসে থাকতে দেখে বললেন– নায়ীম! তোমার আজ বড্ড দেরি হচ্ছে।

এখনও খেলে না?

নায়ীম জবাবে বললো– আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

প্লেটে তখনও খাবার পড়ে রয়েছে। সাবেরা তা তুলে অপর কামরায় রেখে নায়ীমকে ঘুমাতে যেতে বললেন। নায়ীম বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সাবেরা নামাযে দাঁড়ালে সে চুপি চুপি উঠে নিঃশব্দে পাশের কামরা থেকে খাবার তুলে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চললো। আবদুল্লাহ একটি ঘোড়ার মুখের উপর হাত বুলাচ্ছিলো। দরজা দিয়ে চাঁদের রোশনী এসে পড়েছে তার মুখে। নায়ীম খাবার তার সামনে রেখে বললো– আম্মি নামায পড়ছেন। জলদি খেয়ে নাও।

আবদুল্লাহ নায়ীমের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো– নিয়ে যাও, আমি খাবো না।

: কেন? আমার ওপর নারাজ হয়েছো, না? অশ্রুসজল চোখে বললো নায়ীম।

: না নায়ীম, এটা আম্মিজানের হুকুম। তুমি যাও।

: আমিও যাবো না। আমিও থাকবো এখানেই।

: যাও নায়ীম! আম্মিজান তোমায় মারবেন।

নায়ীম আবদুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে বললেন– না, আমি যাবো না।

নায়ীমের পীড়াপীড়িতে আবদুল্লাহ চুপ করে গেলো।

এদিকে সাবেরার নামায শেষ হলো। মাতৃস্নেহ তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না। 'ওহ! কী জালেম আমি!' নামায শেষ করেই তিনি আস্তাবলের দিকে গেলেন। নায়ীম মাকে আসতে দেখে পালালো না; বরং ছুটে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠলো– আম্মি! ভাইয়ার কোনো কসুর নেই। আমিই আযরাকে গভীর পানিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাইয়া তো শুধু তাকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছে।

সাবেরা খানিকক্ষণ পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন– আমারও সে খেয়ালই ছিলো। আবদুল্লাহ! এদিকে এসো।

আবদুল্লাহ ওঠে এলে সাবেরা আদর করে কপালে হাত বুলালেন। তারপর তার মাথাটা চেপে ধরলেন বুকের সাথে।

আবদুল্লাহ বললো– নায়ীমকে আপনি মাফ করে দিন, আম্মি!

সাবেরা নায়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন– বেটা! কেন তুমি আগে দোষ

স্বীকার করলে না?

নায়ীম জবাব দিলো– আমি কি জানতাম ভাইয়াকে আপনি সাজা দেবেন?

: আচ্ছা, তুমি খাবার তুলে নাও।

নায়ীম খাবার তুলে নিলো। তারপর তিন জন গিয়ে প্রবেশ করলেন বড় কামরায়। তখনও কারোই কিছু খাওয়া হয়নি। ফলে তিন জন আবার একই জায়গায় খেতে বসলেন।

* * *

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষাই ছিলো সাবেরার জিন্দেগীর সকল আকর্ষণের কেন্দ্র। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী জীবনে যে নিঃসঙ্গতা অনুভূত হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর জীর্ণ গৃহখানি একটি আড়ম্বরপূর্ণ শহরের চাইতে কম ছিলো না।

রাতের বেলা তিনি যখন এশার নামায শেষ করে অবকাশ পেতেন, আবদুল্লাহ, আযরা আর নায়ীম তখন তাঁর কাছে বসে গল্প শোনার দাবি জানাতো। সাবেরা তাদেরকে কুফর ও ইসলামের গোড়ার দিকের যুদ্ধের কাহিনী শোনাতেন। আর শোনাতেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিন্দেগীর কিস্‌সা।

ছেলেমেয়েদের নিরুদ্দেশ জীবন বয়ে চলেছে সাবলীল গতিতে। সাবেরার শিক্ষার গুণে তাদের অন্তরে সিপাহীসুলভ গুণের বিকাশ ঘটছে দিনের পর দিন। আবদুল্লাহ বয়সে যেমন বড়, নায়ীম ও আযরার তুলনায় তেমনি সে প্রশান্ত। তেরো বছর বয়সেই সে কুরআন মজীদ এবং আরও কতগুলো ছোটখাটো কিতাব পড়ে শেষ করেছে। নায়ীম যেমন বয়সে ছোট, তেমনি খেলাধুলায় তার উৎসাহ বেশি; তাই পড়াশোনায় সে আবদুল্লাহর পেছনে রয়েছে। তার চঞ্চল স্বভাব ও দুরন্তপনা তামাম লোকালয়ে মশহুর। সে যেমন উঁচু গাছে চড়তে পারে; তেমনি যত দুর্দান্ত ঘোড়াই হোক, সেটির পিঠে সে সওয়ার হয়ে যায় অনায়াসে। ঘোড়ার নাঙ্গা পিঠে চড়তে গিয়ে কতবার সে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে। প্রত্যেকবার সে উঠে এসেছে হাসিমুখে আর আগের চেয়েও বেশি সাহস নিয়ে মোকাবেলা করেছে বিপদে। এগারো বছরে পা দিতেই তামাম লোকালয়ে তার ঘোড়-সওয়ারী ও তীরন্দাযির আলোচনা শোনা যায়।

একদিন আবদুল্লাহ সাবেরার সামনে বসে সবক শোনাচ্ছে। নায়ীম তখন তীর

ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো। সাবেরা আওয়াজ দিলেন– নায়ীম, এদিকে এসো। আজ তুমি সবক শেখোনি কেন?

: যাই আম্মি!

সাবেরা আবার আবদুল্লাহর দিকে মনোযোগ দিলেন। আচানক একটা কাক উড়ে এলো সেদিকে। নায়ীম তীরের নিশানা করলো তখ্খুনি। কাকটি হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো সাবেরার কাছে। সাবেরা ঘাবড়ে গিয়ে ওপর দিকে তাকালেন। নায়ীম ধনুক হাতে বিজয়গর্বে হাসছে। সাবেরা মুখের হাসি চাপা দিয়ে বললেন– বহুত নালায়েক হয়েছো তুমি!

: আম্মি, ভাইয়া আজ বলছিলো, আমি নাকি উড়ে যাওয়া পাখির উপর নিশানা করতে পারি না!

: ভারী তো বাহাদুর হয়েছো! এবার এসে সবক শোনাও।

চৌদ্দ বছর বয়সে আবদুল্লাহ দীনি এলেম ও যুদ্ধবিদ্যা শেখার উদ্দেশে বসরার এক মকতবে দাখিল হবার জন্য বিদায় নিয়ে গেলো। আযরার দুনিয়ার অর্ধেকটা খুশি আর মায়ের মহব্বত ভরা অন্তরের একটা টুকরা সে নিয়ে গেলো সঙ্গে করে। আবদুল্লাহ আর নায়ীম দু'জনের ওপরই ছিলো আযরার অন্তহীন মহব্বত কিন্তু দু'জনের মধ্যে কার ওপর তার আকর্ষণ বেশি? তার নিষ্পাপ অন্তরের উপর কে বেশি দাগ কেটেছে? তার চোখ কাকে বার বার দেখার জন্য অধীর পেরেশান থাকে, আর কার আওয়াজ কানের কাছে গুঞ্জন করে যায় সংগীত সুরের মতো?

প্রকাশ্যে আযরা নিজেও এ প্রশ্নের কোনো ফয়সালা করতে পারেনি। তার কাছে আবদুল্লাহ ও নায়ীম একই দেহের দুটি ভিন্ন নাম। তার কাছে নায়ীমকে বাদ দিয়ে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহকে বাদ দিয়ে নায়ীমের কল্পনাই অসম্ভব। সে কখনও তার অন্তরে এদের দু'জনকে তুলনা করে দেখার চেষ্টা করেনি। দু'জনাই যখন তার কাছে ছিলো, তখন তাদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনই হয়নি কখনও। দু'জনের কেউ যখন হেসেছে, তখন সে তাতে শরীক হয়েছে, তারা গম্ভীর হলে সেও গম্ভীর হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ বসরায় চলে যাবার পর এসব প্রশ্ন নিয়ে তার চিন্তা করার মওকা মিললো। সে জানতো, কিছুকাল পর নায়ীমও সেখানে চলে যাবে। কিন্তু নায়ীমের বিচ্ছেদের চিন্তা তার কাছে আবদুল্লাহর বিচ্ছেদের চাইতে আরও অসহনীয় মনে হতে লাগলো। আবদুল্লাহ বয়সে বড়, তার প্রশান্ত গাম্ভীর্য

আযরার অন্তরে মহব্বত ভালোবাসার সাথে শ্রদ্ধার সঞ্চারও করেছিলো। নায়ীমের মতো সেও তাকে ভাইয়া বলে ডাকতো এবং তাকে বড় মনে করে তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো, অবাধে মিশতে পারতো না। নায়ীমের প্রতিও তার শ্রদ্ধার কমতি ছিলো না। কিন্তু তার সাথে অবাধ চলাফেরায় তাদের মধ্যে লজ্জার বাঁধন ছিলো না। তার দুনিয়ায় আবদুল্লাহ ছিলো সূর্যের মতো। মুগ্ধকর দীপ্তি সত্ত্বেও যেনো তার দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। তার কাছে যেতে যেনো মন ঘাবড়ে যায়। কিন্তু নায়ীমের প্রত্যেক কথা যেনো বেরিয়ে আসে তার নিজেরই মুখ থেকে। আবদুল্লাহ চলে যাবার পর নায়ীমের চালচলনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। আবদুল্লাহর বিচ্ছেদ নায়ীমের মনে বেশি করে বাজাবে, অথবা সেও একদিন বসরার মাদরাসায় দাখিল হবার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে, হয় তো এ চিন্তাই তাকে ছেলেবেলার চালচলন থেকে ফিরিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী করে তুলে। একদিন সে সাবেরাকে শুধালো– আম্মি, আমায় কবে বসরায় পাঠাবেন?

মা জবাব দিলেন– বেটা, যতক্ষণ তুমি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করছো, ততক্ষণ কি করে পাঠাবো? লোকে বলবে, আবদুল্লাহর ভাই ঘোড়ায় চড়া আর তীর চালানো ছাড়া লেখাপড়া কিছুই জানে না। এসব কথা আমি পছন্দ করি না।

মায়ের কথাগুলো নায়ীমের স্পর্শকাতর মনের উপর ছুরির মতো লাগলো। অশ্রু সংবরণ করে সে বললো– আম্মি! কেউ আমায় জাহেল বলতে সাহস করবে না। এ বছরই আমি সবগুলো কিতাব শেষ করবো।

সাবেরা আদর করে নায়ীমের মাথায় হাত রেখে বললেন– তোমার পক্ষে কিছুই মুশকিল হবে না বেটা! মসিবত হচ্ছে, তুমি কিছু করতে চাও না।

: নিশ্চয়ই করবো আম্মি! আমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ থাকবে না আপনার।

* * *

মাহে রমযানের ছুটিতে আবদুল্লাহ ঘরে ফিরে এলো। তার সারা গায়ে সিপাহীর লেবাস। লোকালয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হয়রান। তাকে দেখে নায়ীমের খুশির অন্ত নেই। আযরা তাকে দূর থেকে দেখে লজ্জায় মুষড়ে পড়ে। সাবেরা বার বার চুমো খান তার পেশানীতে। নায়ীম আবদুল্লাহকে তার মাদরাসা সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। আবদুল্লাহ তাকে বলে– সেখানে লেখাপড়ার চেয়ে বেশি সময় লাগানো হয় নানা রকম রণ-কৌশল শেখাতে।

নেযাবাজি, তেগ তরবারি চালানো আর তীরন্দাজি শেখানো হয় তাদের মাদরাসায়। তীরন্দাজির কথা শুনে নায়ীমের অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে। অনুনয়ের স্বরে বলে– ভাইয়া! আমাকেও ওখানে নিয়ে চল।

নায়ীমের আবদারের জবাবে আবদুল্লাহ বললো– এখনও তুমি খুবই ছোট। ওখানকার সব ছেলেই তোমার চাইতে অনেক বড়। আরও কিছুকাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে।

নায়ীম কতক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলো– ভাইয়া! মাদরাসায় আপনি সব ছেলের চেয়ে ভালো করছেন না?

আবদুল্লাহ জবাব দিলো– না। বসরার একটি ছেলে রয়েছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তার নাম মুহম্মদ বিন কাসেম। তীরন্দাজি আর নেযাবাজিতে সে মাদরাসার সব ছেলের চাইতে ভালো। তেগ-তরবারি চালনায় আমরা দু'জন সমান। আমি তোমার কথা তাকে বলেছি। তোমার কথা শোনে সে খুব হাসে।

: হাসে? নায়ীম উত্তেজিত হয়ে বললো– আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে দেবো যে, লোকজন আমার কথা শোনে হাসবে, আমি তেমন নই।

আবদুল্লাহ নায়ীমের রাগ দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে খুশি করার চেষ্টা করলো।

রাতের বেলায় আবদুল্লাহ লেবাস বদল করে ঘুমালো। নায়ীম তার কাছে শুয়ে অনেকখানি রাত জেগে কাটালো। ঘুমিয়ে পড়লে সে স্বপ্নে দেখলো, যেনো সে বসরার মাদরাসার ছেলেদের সাথে তীরন্দাজিতে ব্যস্ত। ভোরে সে সবার আগে ওঠলো। জলদি করে সে আবদুল্লাহর উর্দি পরে গিয়ে আযরাকে জাগিয়ে বললো– দেখো তো আযরা! এ লেবাস আমায় কেমন মানায়?

আযরা উঠে বসলো। নায়ীমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে সে হেসে বললো– এ লেবাস বেশ মানিয়েছে তোমাকে।

: আযরা! আমিও ওখানে যাবো আর এ লেবাস পরে আসবো!

এ কথায় আযরার মুখের উপর কেমন একটা উদাস ভাব ছেয়ে গেলো। সে প্রশ্ন করলো– তুমি কবে যাবে ওখানে?

জবাবে নায়ীম বললো– আম্মির কাছ থেকে আমি শিগ্‌গিরই এজাযত নেবো।

৪

৩৫ হিজরী থেকে ৭৫ হিজরী সাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস এমন সব রক্তরাঙা ঘটনায় ভরপুর, যার আলোচনা করতে গিয়ে বিগত কয়েক শতাব্দীতে বহু অশ্রুপাত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আফসোস ও অশ্রুপাত ছাড়া তা স্মরণ করা যাবে না। যে তলোয়ার আল্লাহ তায়ালার নামে কোষমুক্ত হয়েছিলো তা চলতে লাগলো তাদেরই গলায়, যারা আল্লাহ তায়ালার নাম নিচ্ছে। মুসলমান যেমন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার দিকে দিকে, তেমনি দ্রুতগতিতে তাদের মধ্যে এ বিপদের প্রসার ঘটলো। আশঙ্কা হতে লাগলো– যেনো তেমনি দ্রুতবেগে দুনিয়ার সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে তারা আরব উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। কুফা ও বসরা তখন নানারকম ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিলো। মুসলমান তাদের প্রারম্ভিক ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে জেহাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাদের সামনে স্বার্থপরতা ও লোভ চরিতার্থ করার সংগ্রাম এবং ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যে কোনো ব্যাপারে কলহ সৃষ্টি ব্যতীত আর কোন চিন্তাই ছিলো না। তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলমানদের এক কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এক লৌহ-কঠিন হাতের দরকার ছিলো।

মরুর আরবে এক উদগিরণকারী পাহাড় ফেটে পড়ে এবং আরব-আজমের ধুমায়মান বিদ্রোহের আগুন সেই অগ্নি-উদগিরণকারী পাহাড়ের ভয়াবহ শিখার মোকাবেলায় এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এ আগুন উদগিরণকারী পাহাড় হচ্ছে– হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। প্রচণ্ড কঠোর কঠিন, নির্মম হাজ্জাজ, বেরহম জালিম হাজ্জাজ, কিন্তু কুদরত আরব মরুর অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ খতম করে মুসলমানদের দ্রুতগামী বিজয় অশ্বের গতি পূর্ব ও পশ্চিমের লড়াইয়ের ময়দানের দিকে চালিত করার মহাকর্তব্য ন্যস্ত করেছিলেন এ মানুষটির উপর।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে যেমন বলা যায় মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, তেমনি বলা যায় নিকৃষ্টতম দুশমন। সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলা যায় এ কারণে, তিনিই এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতির তিনটি জবরদস্ত রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন। এক পথ দিয়ে মুসলিম ফৌজ এগিয়ে গেলো ফারগানা ও কাশগড় পর্যন্ত, দ্বিতীয় পথে মুসলমানদের সৌভাগ্য অশ্ব পৌঁছে গেলো মরক্কো, স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তে এবং তৃতীয় পথ ধরে মুহাম্মদ বিন কাসেমের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী পৌঁছে সিন্ধুর উপকূল ভূমিতে।

নিকৃষ্টতম দুশমন বলার কারণ, তার যে খুন-পিয়াসী তলোয়ার উম্মুক্ত হতো অনিষ্টকারী উচ্ছৃঙ্খল লোকদের দমন করার জন্য, কখনও কখনও তা সীমা ছাড়িয়ে নিষ্পাপ মানুষের গর্দান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাত যদি মজলুমের খুনে রেঙে না ওঠতো, তাহলে ইতিহাসে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি না পাবার কোনো কারণই থাকতো না। তিনি ছিলেন এমন এক ঘূর্ণিবাত্যার মতো, যা কাঁটা-ঝাড়ের সাথে সাথে ইসলামের গুলশান থেকে অসংখ্য সুরভি ফুল ও সবুজ শাখাও উড়িয়ে নিয়েছে।

হাজ্জাজের শাসনকাল একদিক ছিলো অন্তহীন বিভীষিকাপূর্ণ, আরেক দিক ছিলো অন্তহীন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তিনি ছিলেন এমন এক ঝড়ের মতো, যা সবুজ বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটন করে ভূপাতিত করে। কিন্তু তার কোলে লুকানো মেঘরাজি বারিবর্ষণ করে প্রাণময় সবুজ ও ফলপুষ্পে শোভিত করে দেয় হাজারো শুষ্ক বাগিচাকে।

আরব মরুভূমির গৃহবিবাদের অবসান হলো হিজরী ৭৫ সালে। মুসলমান আবার জেগে ওঠলো এক হাতে কুরআন ও অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে। তখনকার যমানায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামের সাথেই ওঠে আসতো যায়েদ বিন আমেরের নাম। যায়েদ বিন আমেরের বয়স তখন আশি বছর। ইরানে খসরুর এবং শাম ও ফিলিস্তিনে সিজারের সালতানাত পয়মাল করেছিলো যে ঘোড়সওয়ার বাহিনী, যৌবনে তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গী। বার্ধক্যে যখন তার আর তলোয়ার ধরার ক্ষমতা নেই, তখন ইরানের এক সুবায় তিনি হলেন কাজী। আরবে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইবনে আমের গিয়ে পৌঁছালেন কুফায়। তিনি তাবলীগ করে সেখানকার অবস্থার পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার চেষ্টা নিষ্ফল হলো।

কুফার লোকদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে ইবনে আমের বসরায় গেলেন।

সেখানকার অবস্থাও কুফা থেকে আলাদা কিছু ছিলো না। ধনী ও দুষ্কৃতকারীরা তার দিকে আমলও দিলো না। নওজোয়ান ও বুড়োদের দিক থেকে হতাশ হয়ে ইবনে আমের তার তামাম আশা-আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যবস্তু বানালো ছোট্ট ছেলেমেয়েদের। তার সবটুকু চেষ্টা, সবটুকু মনোযোগ তিনি নিয়োগ করলেন তাদের শিক্ষাদীক্ষায়। শহরের বাইরে তিনি একটি মাদরাসা কায়েম করলেন। বসরায় শান্তি ফিরে এলে সেখানকার বিশিষ্ট লোকেরা ইবনে আমেরকে উৎসাহিত করলেন। মাদরাসায় শুধু দীনি কিতাবপত্রই পড়ানো হতো না, যুদ্ধবিদ্যাও শেখানো হতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার এ নিঃস্বার্থ খেদমতে মুগ্ধ হয়ে মাদরাসার তামাম ব্যয়ভার নিজের জিম্মায় নিয়ে নেন। ছাত্রদের রণকৌশল, ঘোড়সওয়ারী প্রভৃতি শেখাবার জন্য উত্তম জাতের ঘোড়া আর নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা হলো এবং ঘোড়ার জন্য তিনি মকতবের কাছেই তৈরি করে দিলেন এক শানদার আস্তাবল।

প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্ররা এসে জমা হতো এক প্রশস্ত ময়দানে। সেখানে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো হাতে-কলমে। শহরের লোক সন্ধ্যা বেলায় সেই ময়দানের আশপাশে জমা হয়ে ছাত্রদের তরবারি চালনা, নেযাবাজি ও ঘোড়সওয়ারীর নতুন নতুন কায়দা দেখতো।

এ মাদরাসার সুখ্যাতি শুনে সাঈদ সাবেরাকে চিঠি লেখে পরামর্শ দিলেন আবদুল্লাহকে সেখানে পাঠাতে। এ নতুন পরিবেশে এসে আবদুল্লাহর তরক্কী হতে লাগলো দ্রুতগতিতে। তার তরক্কী দেখে সহপাঠীদের মনে ঈর্ষা জাগতো। রণকৌশল শিক্ষায়ও সে অধিকার করলো একটি বিশেষ স্থান।

আবদুল্লাহ বসরায় আসার দু'বছরের মধ্যে পরিচিত হয়ে গেলো সেখানকার ছেলেবুড়ো সবার কাছে। এ প্রতিভাবান শাগরেদের কৃতিত্ব অজানা ছিলো না ইবনে আমেরেরও।

* * *

একদিন দুপুর বেলা এক কিশোর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শহরে ঢুকলো। আগন্তুকের এক হাতে নেযা, অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম। কোমরে ঝুলানো একখানা তলোয়ার। গলায় কুরআন মজীদ ও পিঠে ঝুলানো তূণীর। ধনুক বাঁধা রয়েছে ঘোড়ার যিনের পেছন দিকে। তার তলোয়ার শরীরের উচ্চতা অনুপাতে অনেকটা বড়। কিশোর ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে মজবুত হয়ে।

প্রত্যেক পথচারী ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে তার দিকে। কেউ তাকে দেখে মৃদু আর কেউ বা হো হো করে হাসছে। তার সমবয়সী ছেলেরা তামাশা দেখতে জমা হচ্ছে তার আশপাশে। কিছু সময়ের মধ্যেই তার আগে পিছে এসে জমলো বিস্তর লোক। তারা আগে বাড়ার ও পিছু হটার রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালো। একটি ছেলে তার দিকে ইশারা করে 'বদ্দু' বলে চিৎকার করে উঠলো। আর সবাই তার সাথে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। অপর একটি বালক তার দিকে কাঁকর ছুঁড়ে মারে। অমনি আর সব ছেলেরাও কাঁকর ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু আগন্তুক নেযা ধরে রাখলো মজবুত হাতে। সে ঘোড়ার লাগাম টেনে দ্রুত ঘোড়া চালালো। ঘোড়া ছুটার উপক্রম করলে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলো ছেলেগুলো। আগন্তুক নেযা উদ্যত করে দলের সরদারের পেছনে লাগিয়ে দিলো তার ঘোড়া। ভয় পেয়ে সে ছুটে পালালো। আগন্তুক হালকা গতিতে চললো। তার পিছু পিছু বাকী ছেলেরা ছুটে আসছে। মজার কাণ্ড দেখে কতক বয়স্ক লোকও এসে শামিল হয়েছে ছেলের দলে। আগের ছেলেটির পা একটা কিছুতে লাগলে অমনি সে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। আগন্তুক ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছনের ছেলেদের দিকে ফিরে তাকিয়ে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো। মালেক বিন ইউসুফ নামে এক মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এলো দলের ভেতর থেকে। লোকটি বেঁটে, সুগঠিত শরীর। মাথায় বড় এক আমামা। তাঁর সামনের দাঁতগুলো খানিকটা উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে, যেনো সে হাসছে। সামনে এগিয়ে এসে সে আগন্তুককে প্রশ্ন করলো– কে তুমি?

কিশোর সদর্পে জবাব দিলো– মুজাহিদ।

: বেশ ভালো নাম তো! তুমি বেশ বাহাদুর।

: আমার নাম নায়ীম।

: তাহলে তোমার নাম মুজাহিদ নয়?

: না, আমার নাম নায়ীম।

মালেক প্রশ্ন করলো– তুমি কোথায় যাবে?

: ইবনে আমেরের মকতবে, আমার ভাই ওখানে পড়ে।

: তারা এখন আখড়ায়। চলো, আমিও যাচ্ছি ওখানে।

নায়ীম মালেকের সাথে চললো। কয়েকটা ছেলে কিছুদূর সাথে এসে ফিরে গেলো। আর কিছু ছেলে নায়ীমের পেছনে চললো।

নায়ীম তার সাথীকে শুধালো– আখড়ায় তীরন্দাযিও হয় তো?

: হ্যাঁ, তুমি তীর চালাতে জানো?

: হ্যাঁ। আমি উড়ন্ত পাখিকে ফেলে দিতে পারি।

মালেক পিছু ফিরে নায়ীমের দিকে তাকালো। নায়ীমের চোখ দুটো তখন খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

আখড়ায় প্রচুর লোক পৃথক পৃথক দলে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের তীরন্দাযি, তরবারি চালনা ও নেযাবাজি দেখছে। মালেক সেখানে পৌঁছে নায়ীমকে বললো– তোমার ভাই এখানেই আছে হয়তো। খেলা শেষ হবার আগে তুমি তার দেখা পাবে না। আপাতত এসব তামাশা দেখতে থাক।

নায়ীম বললো– আমি তীরন্দাজি দেখবো।

মালেক তাকে তীরন্দাজদের আখড়ার দিকে নিয়ে গেলো। তামাশা দেখতে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা দু'জন গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো।

আখড়ার এক কোণে লাগানো রয়েছে একটা কাঠের ফলক। তার মাঝখানে একটা কালো নিশানা। ছেলেরা পালা করে তার ওপর তীর ছুঁড়ছে। তীরন্দাজদের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে এ কাঠের ফলক। নায়ীম বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখলো। বেশির ভাগ তীর গিয়ে লাগছে কাষ্ঠফলকে। কিন্তু একজন ছাড়া আর কারো তীরই কালো নিশানায় লাগেনি।

নায়ীম মালেককে বললো– লোকটি কে? এর নিশানা তো ভারী চমৎকার!

জবাবে মালেক বললো– ইনি হচ্ছেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসেম।

: মুহাম্মদ বিন কাসেম!

: হ্যাঁ, তুমি ওঁকে জানো?

: হ্যাঁ, ইনি আমার ভাইয়ের দোস্ত। ভাই ওঁর নিশানার বহুত তারিফ করেছেন। কিন্তু এ নিশানায় তো মুশকিল কিছু নেই!

: মুশকিল আবার কোথায়? হয়তো আমিও লাগাতে পারবো এ নিশানা। দেখি, তোমার ধনুকটা দাও তো। হাজ্জাজের ভাতিজা ভাবছেন দুনিয়ায় বুঝি আর তীরন্দাজ নেই।

বলতে বলতে সে নায়ীমের ঘোড়ার যিন থেকে ধনুকটা খুলে নিলো। নায়ীম তূণীর থেকে একটা তীর দিলো তার হাতে। মালেক এক কদম এগিয়ে গিয়ে

নিশানা করলো। লোকগুলো তাকে দেখে হাসতে লাগলো। মালেকের কাঁপা হাতের তীর লক্ষ্যস্থল থেকে কয়েক কদম দূরে মাটিতে গেঁথে রইলো। দর্শকদের তুমুল অট্টহাসি শোনা গেলো। মালেক লজ্জিত হলো। মুহাম্মদ বিন কাসেম হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তীরটি জমিন থেকে তুলে মালেকের হাতে দিয়ে বললেন– আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন।

মালেক ততক্ষণে ঘেমে গেছে। সে মুহাম্মদ বিন কাসেমের হাত থেকে তীরটি নিয়ে নায়ীমকে এগিয়ে দিলো। এবার দর্শকদের নজর পড়লো নায়ীমের ওপর। তারা একে একে নায়ীমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মুহাম্মদ বিন কাসেম স্বভাবসুলভ হাসিমুখে নায়ীমের কাছে এসে বললেন– আপনিও একবার দেখুন!

একথা শুনে দর্শকরা হেসে ওঠলো। তার এ বিদ্রূপ ও দর্শকদের হাসি নায়ীমের বরদাশত হলো না। সে ঝট করে তার নেযা নীচে গেড়ে রেখে ধনুকে তীর যোজনা করে ছুঁড়লো। তীর লক্ষ্যস্থলে গিয়ে নিশানার মাঝখানে লেগে গেলো। মুহূর্ত মধ্যে জনতা নির্বাক হয়ে গেলো এবং পরক্ষণেই এক তুমুল আনন্দধ্বনি ওঠলো।

নায়ীম আরেকটি তীর বের করলো তূণীর থেকে। তামাম লোক নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে তার চারদিকে জমা হলো। দ্বিতীয় তীরটিও লাগলো ঠিক লক্ষ্যস্থলে। চারদিক থেকে 'মারহাবা' 'মারহাবা' ধ্বনি ওঠলো। নায়ীম একবার দৃষ্টি হানলো সমবেত জনতার দিকে। সবারই সপ্রশংস দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। মুহাম্মদ বিন কাসেম হাসিমুখে এগিয়ে এসে নায়ীমের হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন– তোমার নাম কি?

: আমায় সবাই নায়ীম বলে জানে।

: নায়ীম! নায়ীম বিন...?

: নায়ীম বিন আবদুর রহমান।

: আবদুল্লাহর ভাই তুমি?

: জি হ্যাঁ।

: এখানে কবে এলে?

: এইমাত্র।

: আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

: এখনও হয়নি।

: তোমার ভাই হয় তো নেযাবাজি অথবা তলোয়ার চালানোর অভ্যাস করছে। তুমি তলোয়ার চালাতে জানো?

: আমাদের এলাকার একটা লোকের কাছে আমি শিখেছিলাম।

: তোমার তীরন্দাজি দেখে আমার মনে হয়েছে, তুমি তলোয়ার চালানোও ভালোই শিখেছো। আজ একটি ছেলের সাথে তোমার মোকাবেলা হবে।

: মোকাবেলার কথা শুনেই নায়ীমের শিরায় যেনো রক্তের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠলো। সে প্রশ্ন করলো– ছেলেটি কত বড়?

: তোমার চাইতে খুব বেশি বড় নয়। বুঝে-সুঝে কাজ করলে জিতে যাওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। হ্যাঁ, তোমার তলোয়ার খানিকটা ভারী। বর্মটাও অনেকটা ঢিলে। আমি এখ্খুনি তার ব্যবস্থা করছি। তুমি ঘোড়া থেকে নেমে এসো।

মুহাম্মদ বিন কাসেম একটি লোককে বললেন তাঁর বর্ম, লোহার টুপি ও তলোয়ার নিয়ে আসতে।

* * *

খানিকক্ষণ পর নায়ীম এক নতুন বর্ম পরিধান করে, হাতে একখানা হালকা তলোয়ার নিয়ে দর্শকদের কাতারে দাঁড়িয়ে আমেরের শাগরেদদের তরবারি চালনার কৌশল দেখছে। তার মাথার ইউনানী টুপি মুখ ঢেকে দিয়েছিলো চিবুক পর্যন্ত। তাই যারা তার তীরন্দাজি দেখে সঙ্গে এসেছিলো, তারা ছাড়া কেউ জানতেই পারেনি সে এক আগন্তুক।

ইবনে আমের দর্শকদের ভিড় থেকে দূরে ময়দানের মাঝে দাঁড়িয়ে শাগরেদদের হেদায়াত দিচ্ছেন। একটি বালকের মোকাবেলা করার জন্য পর পর কয়েকটি বালক এসে নামলো ময়দানে, কিন্তু কেউ দাঁড়াতে পারলো না তার সামনে। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে হারিয়ে দিলো কোনো না কোনো রকমে। অবশেষে ইবনে আমের মুহাম্মদ বিন কাসেমের দিকে তাকিয়ে বললেন– মুহাম্মদ! তুমি তৈরি হওনি?

মুহাম্মদ বিন কাসেম এগিয়ে এসে ইবনে আমেরকে চাপা গলায় কি যেনো বললেন। ইবনে আমের হাসতে হাসতে নায়ীমের দিকে তাকালেন। আদর

করে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– তুমি আবদুল্লাহর ভাই?

: জি হ্যাঁ।

: এ ছেলেটির সাথে মোকাবেলা করবে?

: জি, আমার তেমন বেশি অভ্যাস নেই। তাছাড়া এ তো আমার চেয়ে বড়ও বটে!

: কোনো ক্ষতি নেই তাতে।

: কিন্তু আমার ভাই কোথায়?

: সেও এখানেই আছে। তার সাথে তোমার দেখা করিয়ে দেবো। আগে এর সাথে মোকাবেলা করে দেখাও!

নায়ীম দ্বিধাকুণ্ঠিত পদে ময়দানে নামলো। দর্শকরা এতক্ষণে নীরবতা ভেঙে কথা বলতে শুরু করলো।

দুই তলোয়ারের ঠোকাঠুকি শুরু হলো। ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়ে ওঠতে লাগলো তলোয়ারের ঝংকার। নায়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বী খানিকক্ষণ তাকে ছোট বালক মনে করে শুধু তার হামলা ঠেকাতে লাগলো। কিন্তু নায়ীম আচানক পাঁয়তারা বদলে তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। বালকটি যথাসময়ে তার অপ্রত্যাশিত হামলা ঠেকাতে পারলো না। নায়ীমের তলোয়ার তার তলোয়ারের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে লাগলো তার লোহার টুপিতে। দর্শকরা প্রশংসাসূচক ধ্বনি তুললো।

নায়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ব্যাপার বিলকুল নতুন। রাগে ফুঁসে উঠে সে কয়েকবার আক্রমণ চালালো তীব্রতার সাথে এবং নায়ীমকে পেছন দিকে হটাতে লাগলো। কয়েক কদম হটে যাবার পর নায়ীমের পা কেঁপে গেলে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো।

নায়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়-গর্বে তার তলোয়ার নীচু করে উঠে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

নায়ীম রাগে লাল হয়ে উঠে এলো এবং তরবারি চালনার যাবতীয় নীতি উপেক্ষা করে অন্তহীন গতি ও বেগ সহকারে হামলা চালালো তার ওপর। নায়ীমকে সিপাহীসুলভ রীতির বাইরে যেতে দেখে সে পুরো শক্তি দিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে হামলা করলো তার ওপর। নায়ীম তার তলোয়ার দিয়ে এ হামলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তলোয়ার তার হাত থেকে কয়েক কদম দূরে ছিটকে পড়লো। নায়ীম পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে

লাগলো। মুহাম্মদ বিন কাসেম ও ইবনে আমের হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। ইবনে আমের এক হাত শাগরেদের ও অপর হাত নায়ীমের কাঁধে রেখে নায়ীমকে বললেন– এসো! এবার তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

: জি হ্যাঁ, ভাই কোথায়?

ইবনে আমের দ্বিতীয় বালকটির লোহার টুপিটা নামাতে নামাতে বললেন– এদিকে তাকাও!

নায়ীম ভাইজান বলে আবদুল্লাহকে জড়িয়ে ধরলো। আবদুল্লাহর অন্তহীন পেরেশানী লক্ষ্য করে মুহাম্মদ বিন কাসেম নায়ীমের টুপিটাও খুলে ফেলে বললেন– আবদুল্লাহ! এ নায়ীম। হায়! এ যদি আমার ভাই হতো!

* * *

ইবনে আমেরের মতো দক্ষ ওস্তাদের যত্নে সাবেরার পুত্রদের আত্মিক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তরক্কী হতে লাগলো অসাধারণ দ্রুতগতিতে। মকতবে আবদুল্লাহর নাম ছিলো সবার আগে। কিন্তু আখড়ায় নায়ীমের স্থান ছিলো সবার পুরোভাগে। মুহাম্মদ বিন কাসেম কখনও আখড়ায় আসতেন এবং তার কোন কোন যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হতো নায়ীমকে।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের তরবারি চালনার যোগ্যতা ছিলো সবচাইতে বেশি। নেযাবাজিতে দু'জনের ছিলো সমান দক্ষতা। নায়ীম শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলো তীরন্দাজিতে। প্রতিক্ষেত্রে সম্মানের অধিকারী হবার মতো গুণরাজি ছেলেবেলা থেকেই বিকাশ লাভ করেছিলো মুহাম্মদ বিন কাসেমের মধ্যে। একটা বড় কিছু করার জন্য তিনি পয়দা হয়েছেন বলে তাঁর তারিফ করতেন ইবনে আমের।

আবদুল্লাহ ও নায়ীমের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসেমের দোস্তির সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে মজবুত হতে লাগলো। বাইরে মুহাম্মদ বিন কাসেমের নজরে তারা দু'জন ছিলো সমান; কিন্তু নায়ীম যে তাঁর বেশি নিকটতর, এ কথা আবদুল্লাহ নিজে অনুভব করতো। নায়ীমের মকতবে দাখিল হবার পর আট মাস অতীত হলে মুহাম্মদ বিন কাসেম শিক্ষা সমাপ্তির পর ফৌজে শামিল হলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসেম চলে যাবার পর নায়ীমের আর একটি গুণের বিকাশ হতে লাগলো মকতবে। মাদরাসার ছেলেরা সপ্তাহে একবার করে কোনো কোনো

বিষয় নিয়ে নিয়মিত বিতর্ক সভা করতো। বিষয়টি নির্ধারণ করে দিতেন ইবনে আমের নিজে। ভাইয়ের দেখাদেখি নায়ীমও এক বিতর্ক সভায় শরীক হয়। প্রথম বিতর্কে সে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা বলে ঘাবড়ে গেলো এবং সলজ্জভাবে মিম্বর থেকে নেমে এলে ছেলেরা বিদ্রূপ করলে ইবনে আমের তাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু সারাদিন তার বিষণ্ণতা কাটলো না। রাতের বেলা সে বার বার ঘুমহারা চোখে পাশ ফিরতে থাকলো। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে সে চলে গেলো বাইরে। দুপুর পর্যন্ত এক খেজুর গাছের ছায়ায় বসে সে বারংবার তার বক্তৃতা পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। পরের সপ্তাহে সে আবার গিয়ে হাজির হলো বিতর্ক সভায়। এবার সে এক তেজোময় বক্তৃতা করে অবাক করে দিলো শ্রোতৃবর্গকে। ক্রমাগত তার দ্বিধাসংকোচ কাটতে লাগলো। এর পর থেকে সে নিয়মিত শরীক হতে লাগলো প্রত্যেক বিতর্ক মজলিসে। বেশির ভাগ বিতর্কে আবদুল্লাহ ও নায়ীম দু'জনই যোগ দিতো। এক ভাই বিষয়ের সমর্থনে বক্তৃতা করলে অপর ভাই তার বিরোধিতা করতো। শহরের যেসব লোক তাদের গুণগ্রাহী ছিলো, তারা এবার তাদের বক্তৃতা শুনেও আনন্দ পেতে লাগলো। ইবনে আমের নায়ীমের শিরায় শিরায় কেবল সিপাহীর উষ্ণ রক্তধারাই লক্ষ্য করেননি; বরং তার দিল দেমাগে দেখেছেন এক অসামান্য বক্তার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। তার এ যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কয়েকটি বক্তৃতার পর সে কেবল মাদরাসার শ্রেষ্ঠ বক্তা বলেই স্বীকৃতি পেলো না; বরং বসরার অলিগলিতে শোনা যেতে লাগলো তার চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার তারিফ।

ইবনে আমেরের শাগরেদদের সংখ্যা বেড়ে চললো দিনের পর দিন, কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণতার পথে বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বসরার ওয়ালীর কাছে তিনি মাদরাসার জন্য একজন অভিজ্ঞ ওস্তাদের প্রয়োজন জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। সাঈদ তখন সাইপ্রাসের ওয়ালী; বসরার ওয়ালী এ কাজের জন্য তাঁর চাইতে যোগ্য আর কোন লোক খুঁজে পেলেন না। হাজ্জাজ খলিফার দরবারে দরখাস্ত করলে সাঈদকে অবিলম্বে বসরায় পৌছার হুকুম দেয়া হলো।

এক নতুন ওস্তাদ আসছেন– এ খবর নায়ীম ও আবদুল্লাহর অজানা ছিলো না। কিন্তু তাদের মামাই যে ওস্তাদ হয়ে আসছেন, তা তারা জানতো না। সাইপ্রাসের এক নওমুসলিম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে শাদী হয়েছে সাঈদের। বিবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে তিনি গেলে সাবেরার কাছে। তারপর কয়েকদিন সেখানে থেকে চলে এলেন বসরায়। মকতবে এসে তিনি কাজ শুরু করে

দিলেন পূর্ণোদ্যমে। তার ভাগ্নেরাই তার সেরা ছাত্র জেনে তিনি অন্তহীন আনন্দ অনুভব করলেন।

কয়েক মাস পরে আবদুল্লাহ ও তার জামায়াতের আরো কয়েক নওজোয়ান শিক্ষা সমাপ্ত করলো। তাদের বিদায় উপলক্ষে ইবনে আমের যথারীতি এক বিদায় সভা ডাকলেন। বসরার ওয়ালী হাজির থাকলেন সে জলসায়। বিদায়ী ছাত্রদের দরবারে-খেলাফত থেকে বিতরণ করা হলো ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র।

ইবনে আমের তাঁর বিদায় সম্ভাষণে বললেন– নওজোয়ান দল! আজ এক কঠোর বিপদসংকুল দুনিয়ায় পা বাড়াবার সময় এসেছে তোমাদের সামনে। আমি আশা করছি, আমার মেহনত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি– এ কথা প্রমাণ করার জন্য তোমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করবে। যে সব কথা তোমাদের বহুবার বলেছি, তা আবার নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমি মাত্র কয়েকটি কথার পুনরাবৃত্তি করবো। হে নওজোয়ান দল! জিন্দেগী হচ্ছে এক ধারাবাহিক জেহাদ এবং মুসলমানের জিন্দেগীর পবিত্রতম কাজ হচ্ছে তার পরওয়ারদেগারের মহব্বতে জান পর্যন্ত কুরবান করতে তৈরি থাকা এবং তোমাদের অন্তর সেই পবিত্র মনোভাবে পরিপূর্ণ থাকবে। তোমাদের সামনে যেনো দুনিয়া ও আখেরাত দুই-ই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। দুনিয়ায় তোমরা সম্মানিত হয়ে শির উঁচু করে চলবে এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা থাকবে খোলা। মনে রেখো, এ পবিত্র মনোভাব থেকে বঞ্চিত হলে যেমন দুনিয়ায় তোমাদের কোনো স্থান থাকবে না, তেমনি আখেরাতও হবে তোমাদের চোখে অন্ধকার। ভীরুতা দুর্বলতা তোমাদের এমন করে আঁকড়ে ধরবে, হাত-পা নাড়াবার শক্তিও তোমাদের থাকবে না। কুফরের যেসব শক্তি মুজাহিদদের পথে ধূলিকণার মতো উড়ে গেছে, তাই আবার তোমাদের সামনে দেখা দেবে মজবুত পাহাড় হয়ে। দুনিয়ার কূটকৌশলী জাতিসমূহ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের তাদের গোলাম বানাবে। তোমরা এমন সব নির্মম বিধানের আবর্তে জড়িয়ে পড়বে যা থেকে নাজাত পাওয় অসম্ভব হবে। তখনও তোমরা নিজেকে মুসলমান বলেই দাবি করবে, কিন্তু ইসলাম থেকে তোমরা থাকবে বহু দূরে। সত্যের ওপর ঈমান এনেও যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের জন্যে কুরবানী দেবার আকাঙ্ক্ষা পয়দা না হয়, তাহলে বুঝবে, তোমাদের ঈমান দুর্বল শক্তিহীন। ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আগুন ও খুনের দরিয়া অতিক্রম করে চলা অপরিহার্য। মরণ যখন তোমাদের চোখে জিন্দেগীর চাইতে প্রিয়তর হবে, তখন বুঝবে তোমরা জিন্দা-দিল; আর মরণের ভয় যখন তোমাদের শাহাদাত স্পৃহার ওপর বিজয়ী হবে, তখন তোমাদের অবস্থা হবে

এমন এক মুরদার মতো, যে শ্বাস নেবার জন্যে কবরে থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে।

ইবনে আমের বক্তৃতার মাঝখানে এক হাতে কুরআন উপরে তুলে বললেন– এ আমানত রাসূলে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর খোদায়ে কুদ্দুসের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং দুনিয়ায় তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপন করে এ আমানত আমাদের হাতে সোপর্দ করে গেছেন। রাসূলে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন-জিন্দেগীতে প্রমাণ করে গেছেন, তলোয়ারের তেজ ও বাহুবল ব্যতীত আমরা এ আমানতের হেফাজত করতে পারবো না। যে পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি কোণে তা পৌঁছে দেয়া।

ইবনে আমের তাঁর বক্তৃতা শেষ করে বসলেন। তারপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিস্তারিতভাবে জেহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করে নিজের জেব থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন– এ চিঠি মারভের গভর্নরের কাছ থেকে এসেছে। তিনি জায়হুন নদী পার হয়ে তুর্কিস্তানের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। এ চিঠিতে তিনি প্রচুর সংখ্যক সিপাহী পাঠাবার দাবি জানিয়েছেন। আপাতত কয়েকদিনের মধ্যে আমি বসরা থেকে দু'হাজার সিপাহী পাঠাতে চাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, এ বাহিনীতে শরীক হতে রাজি?

ছাত্রদের সবাই তার কথা শুনে হাত উঁচু করে সম্মতি জানালো।

হাজ্জাজ বললেন– আমি তোমাদের জেহাদী মনোভাবের প্রশংসা করি, কিন্তু যারা শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, বর্তমান মুহূর্তে আমি কেবল তাদেরই দাওয়াত দেবো। এ বাহিনীর নেতৃত্ব আমি এ মাদরাসারই এক যোগ্য শিক্ষার্থীর ওপর সোপর্দ করতে চাই। আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই শুনেছি। তাই এ বাহিনীর দায়িত্ব তার ওপরই সোপর্দ করছি। তোমাদের ভেতর থেকে যেসব নওজোয়ান তার সাথী হতে রাজি, বিশ দিনের মধ্যে তারা নিজ নিজ ঘর থেকে ঘুরে এসে বসরায় এসে পৌঁছবে।

৫

সাবেরার নিয়মিত কাজ ছিলো, তিনি রোজ ফজরের নামায শেষ করে আযরাকে সামনে বসিয়ে তার মুখ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন। আযরার মধুর আওয়াজ কখনও কখনও আশপাশের মেয়েদের পর্যন্ত টেনে আনতো সাবেরার ঘরে। এরপর সাবেরা গাঁয়ের কয়েকটি মেয়েকে পড়াতে ব্যস্ত পড়তেন। আর আযরা ঘরের দৈনন্দিন কাজকর্ম সেরে তীরন্দাজির অভ্যাস করতো। একদিন সূর্যোদয়ের আগে আযরা যথারীতি কুরআন তেলাওয়াত করে উঠে যাচ্ছে, অমনি সাবেরা তার হাত ধরে কাছে বসিয়ে খানিকক্ষণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন– আযরা! কতবার আমি ভাবি, তুমি না এলে আমার দিন কত কষ্টে কাটতো। তুমি আমার নিজের মেয়ে হলেও হয় তো এর চাইতে বেশি স্নেহ আমি তোমায় দিতে পারতাম না।

আযরা জবাব দিলো– আম্মি! আপনি না হলে আমি...। আযরা আর কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠলো।

সাবেরা ডাকলেন– আযরা!

: জি আম্মি!

সাবেরা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অমনি বাইরের দরজা খুলে গেলো এবং ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে আবদুল্লাহ ঘরে এসে ঢুকলেন। সাবেরা উঠে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ সালাম করলেন। মা ও ছেলে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখোমুখি।

পুত্রকে ছেড়ে মায়ের নজর তখন চলে গেছে দূরে– বহু দূরে। বিশ বছর আগে

ঠিক এমনি লেবাস পরে এমনি আকৃতি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছিলেন আবদুল্লাহ পিতা।

: আম্মি!

: হ্যাঁ, বেটা!

: আপনাকে আগের চাইতে দুর্বল মনে হচ্ছে...!

: না বেটা! আজ তো আমায় দুর্বল মনে হবার কথা নয়...। দাঁড়াও, আমি তোমার ঘোড়া বেঁধে আসি। ... বলে সাবেরা ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে আদর করে ঘোড়াটির গর্দানে হাত বুলাতে লাগলেন।

মায়ের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে আবদুল্লাহ বললেন– ছাড়ুন আম্মি! এ কি করে হতে পারে!

সাবেরা বললেন– বেটা, তোমার বাপের ঘোড়া তো আমি বাঁধতাম।

: কিন্তু আপনাকে তকলিফ দেয়া যে আমি গুনাহ মনে করি!

: জেদ করো না বেটা, ছেড়ে দাও!

আবদুল্লাহ মায়ের কণ্ঠস্বরে অভিভূত হয়ে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিলেন।

সাবেরা ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই আযরা এসে তাঁর হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরে বললো– আম্মি, ছাড়ুন! আমি বেঁধে আসি।

সাবেরা স্নেহ করুণ হাসি-ভরা মুখে আযরার দিকে তাকিয়ে একটুখানি চিন্তা করে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিলেন তার হাতে।

আবদুল্লাহ তার ছুটির বিশ দিন কাটিয়ে দিলেন বাড়িতে। এ সময় তিনি লক্ষ্য করলেন বাড়ির অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন। আযরা আগেও তার সামনে কিছুটা দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে চলতো। আর এখন সে যেনো শরমে মরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আবদুল্লাহর ছুটির দিন শেষ হয়ে এলো। অতি আদরের পুত্রের জন্য মায়ের সবচাইতে বড় তোহফা ছিলো তার দাদার আমলের একখানি খুবসুরত তলোয়ার।

আবদুল্লাহ যখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন, ঠিক তখুনি আযরা তার নিজ হাতের তৈরি একখানা রুমাল সাবেরার হাত দিয়ে সলজ্জভাবে ইশারা করলো আবদুল্লাহর দিকে। রুমাল খুলে আবদুল্লাহ দেখতে পেলেন, তার মাঝখানে লাল রঙের রেশমি সূতা দিয়ে তোলা রয়েছে কালামে ইলাহীর এ ক'টি কথা–

'... অনিষ্ট অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'

আবদুল্লাহ রুমালখানা জেবে রেখে আযরার দিকে তাকালেন। পর মুহূর্তেই তার দিক থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে এজাযত চাইলেন।

সাবেরা মাতৃসুলভ কোমল ও নাজুক মনোভাব সংযত করে বললেন– এখন আর তোমায় নসীহতের প্রয়োজন নেই। তোমরা কার আওলাদ তা ভুলে যেয়ো না। তোমার পূর্বপুরুষ কখনও পেছনে ফিরে রক্ত দান করেননি। আমার দুধ আর তাদের নামের ইজ্জত রেখে চলবে।

আবদুল্লাহর জেহাদে যোগ দেবার পর এক বছর কেটে গেছে। সাবেরার কাছে তার দেয়া কয়েকখানা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে, পুত্র-গর্বে গর্বিতা মাতার প্রত্যাশার চাইতেও বেশি সুনাম তিনি হাসিল করছেন। সাঈদের চিঠিতে এবং বসরা থেকে তাদের এলাকায় যারা আসা-যাওয়া করে তাদের মুখে সাবেরা শুনেন মকতবে নায়ীমের সুনাম-সুখ্যাতির খবর। নায়ীমের এক চিঠিতে সাবেরা জানলেন, তিনি শিগ্‌গিরই শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসবেন বাড়িতে। একদিন সাবেরা বেড়াতে গেলেন পাশের এক বাড়িতে। আযরা তীর-ধনুক নিয়ে আঙিনায় বসে নানা রকম জিনিসের উপর লক্ষ্যভেদ করছে। একটা কাক হঠাৎ উড়ে এসে বসলো আযরার সামনে একটা খেজুর গাছের ওপর। কাকটা কেবল ওপরে উঠেছে মাত্র, অমনি অপরদিক থেকে একটি তীর এসে তাকে জখম করে নীচে ফেলে দিলো। আযরা হয়রান হয়ে ওঠে এসে কাকের দেহ থেকে তীরটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিক। ফটকের কাছে গিয়ে সে বাইরে তাকালো। ঘোড়সওয়ার ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাসিমুখে। আযরার ফর্সা চেহারা লজ্জায় ও খুশিতে লাল হয়ে ওঠলো। এগিয়ে গিয়ে সে ফটক খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। নায়ীম ঘোড়া থেকে নেমে এসে ভেতরে ঢুকলেন।

নায়ীম বসরা থেকে বাড়ি এসেছেন অনেক কিছু বলার আর অনেক কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে একটির বেশি কথা বেরুলো না। তিনি বললেন– ভালো আছো আযরা?

আযরা কোনো জবাব না দিয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। পরক্ষণেই সে তার চোখ অবনত করে বললো– ভালো আছি।

নায়ীম জিজ্ঞেস করলো– আম্মি কোথায়?

: তিনি একটি মেয়ের অসুখ দেখতে গেছেন।

খানিকক্ষণ দু'জনই নির্বাক।

: আযরা! তোমায় আমি হররোজ মনে করেছি।

আযরা চোখ ওপরে তুললো– কিন্তু সিপাহীর লেবাসে সৌন্দর্য ও মহিমার প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে দেখার সাহস হলো না তার।

: আযরা! তুমি আমার ওপর নারাজ হয়েছো?

জবাবে আযরা কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু নায়ীমের রাজকীয় ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে বললো– আচ্ছা, আমি আপনার ঘোড়াটা বেঁধে রেখে আসি।

: না আযরা! তোমার হাত এসব কাজের জন্য তৈরি হয়নি। এ কথা বলে নায়ীম ঘোড়াটি নিয়ে গেলেন আস্তাবলের দিকে।

নায়ীম তিন মাস বাড়িতে থেকে জেহাদে যাবার জন্য বসরার ওয়ালীর হুকুমের অপেক্ষা করতে থাকলেন।

ঘরে ফিরে এসে নায়ীমের দিনগুলো খুশিতে কাটবে না, এরূপ প্রত্যাশা তিনি করেননি। যৌবনের প্রথম অনুভূতি আযরা ও তার মাঝখানে সৃষ্টি করে তুলেছে লজ্জার এক দুস্তর ব্যবধান। ছেলেবেলার ফেলে আসা দিনগুলো তার মনে পড়ে, যখন আযরার ছোট্ট হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন লোকালয়ের বাগ-বাগিচায়। সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো আজ তার কাছে স্বপ্ন। কম-বেশি আযরারও সেই একই অবস্থা। নায়ীম তার ছেলেবেলার সাথী, কিন্তু তার চোখে তিনি যেনো আজ কত নতুন। কোথায় তার চালচলনে দ্বিধা-সংকোচ কমে আসবে, তা না হয়ে যেনো তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। নায়ীম তার দেহ মনকে ঘিরে অনুভব করছেন কারাপ্রাচীরের বন্ধন, তাঁর মনের ওপর চেপে রয়েছে এক গুরুভার বোঝা। আযরা তার হৃদয়তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছে মহব্বত ভালোবাসার এক ছন্দময় সংগীত সুর তার ছোটবেলা থেকেই। নায়ীম চান, এই মরুদুলালী হুরের সামনে খুলে ধরবেন তার হৃদয়পর্দা। কিন্তু রাজ্যের লজ্জা এসে যেনো চেপে ধরে তার মুখ। তবু যেনো তারা দু'জনই শুনতে পান পরস্পরের হৃদয়ের স্পন্দন।

নায়ীম ঘরে ফেরার চার মাস পর আবদুল্লাহ এলেন ছুটি নিয়ে। সাবেরার ঘরের রওনক দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। রাতের খাবার খেয়ে নায়ীম ও আবদুল্লাহ বসলেন মায়ের কাছে। আবদুল্লাহ তাদের শোনাচ্ছেন তার ফৌজি তৎপরতার

কথা, আরও শোনাচ্ছেন তুর্কিস্তানের অবস্থা। আযরা আবদুল্লাহর কথা শুনছে খানিকটা দূরে পাঁচিলের আড়ে দাঁড়িয়ে। আলোচনা শেষে আবদুল্লাহ বললেন– আমি বসরা হয়ে এসেছি।

সাবেরা প্রশ্ন করলেন– তোমার মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?

: জি হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তা ছাড়া একটা চিঠিও দিয়েছেন আমার হাতে।

: কেমন চিঠি?

আবদুল্লাহ জেব থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন– পড়ে দেখুন।

: তুমিই পড়ে শোনাও বেটা।

আবদুল্লাহ সলজ্জভাবে জবাব দিলেন– আম্মি! চিঠিটা আপনার নামে।

সাবেরা চিঠিটা নায়ীমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন– আচ্ছা বেটা, তুমিই পড়ো।

নায়ীম চিঠি হাতে নিয়ে আযরার দিকে তাকালেন। আযরা বাতিটা তুলে নিয়ে নায়ীমের পাশে দাঁড়ালো।

চিঠির বিষয়বস্তুর দিকে নজর ফেলতেই নায়ীমের মনের ওপর এসে এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। মাকে তিনি শোনাতে চান, কিন্তু চিঠির কথাগুলো যেনো তার মুখে চেপে ধরেছে। তিনি দ্রুত চিঠির আগোগোড়া দ্রুত দেখে ফেললেন। চিঠির বিষয়বস্তু নায়ীমের কাছে না-করা গুনাহর সাজা পাবার হুকুমনামার চেয়েও ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকদিরের অমোঘ ফয়সালা পড়ে তিনি যেনো কিছুক্ষণের জন্য সম্বিতহারা হয়ে গেলেন। এক অসহনীয় বোঝা যেনো তাকে টেনে নিচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত জমিনের অভ্যন্তরে, কিন্তু মুজাহিদের স্বভাবসুলভ হিম্মত জয়ী হলো। অন্তহীন চেষ্টায় তিনি মুখের উপর হাসি টেনে এনে বললেন– মামা ভাইয়ার শাদীর কথা লেখেছেন। আপনি পড়ুন।

নায়ীম এ কথা বলে চিঠিখানা মায়ের হাতে দিলেন। সাবেরা বাতির আলোর দিকে এগিয়ে পড়তে শুরু করলেন–

বোন!

আযরার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি এখনও কোন ফয়সালা করতে পারিনি। আমার কাছে আবদুল্লাহ ও নায়ীম দু'জনই সমান। আযরার মতো শরীফ

খান্দানের মেয়ের ভবিষ্যতের জামিন হতে পারে এমন গুণরাজি এদের দু'জনের ভেতরেই মজুদ রয়েছে। বয়সের দিক বিবেচনা করে আবদুল্লাহকেই এ আমানতের বেশি হকদার মনে হয়। তার দু'মাসের ছুটি মিলেছে। আপনি কোনো পছন্দমতো দিন ধার্য করে আমায় খবর দেবেন, দু'দিনের জন্য আমি চলে আসবো।

এ বাচ্চাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনিই আমার চাইতে বেশি ওয়াকেফ রয়েছেন। এটা আযরার ভবিষ্যতের প্রশ্ন, খেয়াল রাখবেন।

ইতি–

সাঈদ।

* * *

নায়ীমের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের পরিণাম তার প্রত্যাশার বিপরীত হয়ে প্রকাশ পেলো। তার এতদিনের ধারণা, তিনি আযরার আর আযরাও তারই। কিন্তু মামার এ চিঠি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক তিক্ত বাস্তবের মুখোমুখি।

আযরা, তার নিষ্পাপ আযরা! এখন সে তার ভাবী হতে চলেছে। দুনিয়া এবং তার ভেতরকার সব কিছুই যেনো নায়ীমের চোখে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার অন্তরে থেকে থেকে জেগে ওঠছে এক অপূর্ব বেদনার অনুভূতি, কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করে রেখেছেন যথাসাধ্য। মনের গোপন ব্যথা তিনি প্রকাশ করেননি কারো কাছে। আযরার অবস্থাও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আবদুল্লাহ ও সাবেরা নায়ীম এবং আযরার পেরেশানীর কারণ জানতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাইয়ের প্রতি নায়ীমের ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা। আর আযরা? সাবেরা, সাঈদ ও আবদুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা যেনো তাকে বেঁধে ফেলেছে। তাই দু'জনই নির্বাক রইলেন। কোনো কথাই তাদের মুখ থেকে বের হলো না। মনের আগুন মনই পোড়ায়, এর কোনো দোসর নেই।

আবদুল্লাহর আনন্দের দিন যত নিকটে ঘনিয়ে এলো, ততই নায়ীম ও আযরার কল্পনার দুনিয়া অন্ধকার-তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে এলো। নায়ীমের অশান্ত মনের কাছে ঘরের চার দেয়ালের ভেতরটা হয়ে এলো জিন্দাখানার মতো। হররোজ সন্ধ্যায় তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াতে চলে যান দূরে বহু দূরে। মধ্যরাত পর্যন্ত মরুপথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এদিক-ওদিক।

আবদুল্লাহর শাদীর আর এক সপ্তাহ বাকী। নায়ীম এক রাতে লোকালয়ের বাইরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াচ্ছেন। আসমানে ঝিকিমিকি করছে সেতারার দল। চাঁদের মন-ভুলানো দীপ্তিতে ঝকঝক করছে মরুভূমির বালু তরঙ্গ। লোকালয়ে আবদুল্লাহর শাদীর খুশিতে নওজোয়ান মেয়েরা গান গাইছে দফ বাজিয়ে। নায়ীম ঘোড়া থামিয়ে খানিকক্ষণ শুনলেন সে সঙ্গীত সুর। তিনি ছাড়া গোটা সৃষ্টিই যেনো আজ আনন্দে মশগুল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি শুয়ে পড়লেন ঠাণ্ডা বালুর বিছানায়। চাঁদ, সেতারা, ঠাণ্ডা মন-ভোলানো হাওয়া আর এলাকার বাগ-বাগিচার মুগ্ধকর দৃশ্য যেনো তার নিষ্পাপ দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়া প্রশান্তির জন্য তাকে আবার পাগল করে তুললো। আপন মনে তিনি বলতে লাগলেন–

আমি ছাড়া সৃষ্টির অণু-পরমাণু আনন্দে বিভোর। এ বিপুল পসারের মাঝখানে আমার হাহাকারের বাস্তবতা কতটুকু। ওহ্! ভাই ও মায়ের খুশি, মামার খুশি এবং হয় তো আযরার খুশিও আমায় বিষণ্ন মর্মাহত করে তুলেছে। কত স্বার্থপর আমি। ...কিন্তু স্বার্থপরও তো নই আমি। ভাইয়ের জন্যই তো আমি আমার নিজের খুশি কুরবান করে দিয়েছি!... কিন্তু তাও মিথ্যা! আমার মনে ভাইয়ের জন্য এতটুকু ত্যাগের মনোভাব নেই, যাতে তাঁর খুশিতে শরীক হয়ে আমি নিজের দুঃখ-বেদনা ভুলে যাবো। রাতদিন এমনি করে বাইরে থাকা, কোন কথা না বলা, এমনি বেদনাতুর হয়ে থাকা তার কাছে কি প্রকাশ করেছে...! আর আমি এমন করবো না। তিনি আমার বিষণ্ন মুখ আর দেখবেন না। ... কিন্তু তাও তো আমার হাতে কিছু নেই। আমি হয় তো অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সংযত করে রাখতে পারি, কিন্তু অনুভূতি তো সংযত করতে পারব না। তার চাইতে ভালো, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাই। ... হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে। ... এখ্‌খুনি চলে যাচ্ছি না কেন? ... কিন্তু না, এমনি করে নয়। ভোরের দিকে মায়ের এজাযত নিয়ে তবে যাবো।

এ সংকল্প নায়ীমের অন্তর কিছুটা আশ্বস্ত করলো।

পর দিন ভোরে ফজরের নামায পড়ে নায়ীম মায়ের কাছে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য বসরা যাবার এজাযত চাইলেন।

: বেটা! তোমার ভাইয়ের শাদী! তুমি ওখানে যাবে কি আনতে?

: আম্মি! শাদীর একদিন আগেই আমি এসে যাবো।

: না বেটা! শাদী পর্যন্ত তোমায় থাকতেই হবে বাড়িতে।

: আম্মি! আমায় এজাযত দিন।

সাবেরা রাগের ভাব দেখিয়ে বললেন– নায়ীম! আমার ধারণা ছিলো তুমি সত্যি সত্যি এক মুজাহিদের বেটা, কিন্তু আমার অনুমান ভুল হয়েছে। তুমি আপন ভাইয়ের খুশিতে শরীক হতে চাও না। নায়ীম! তোমার ও আবদুল্লাহর মধ্যে ঈর্ষা?

: ঈর্ষা? আম্মি! আপনি কি বলছেন? ভাইয়ের প্রতি আমি ঈর্ষা কেন পোষণ করবো? আমি তো চাই, আমার সবটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাকেই নজরানা দেবো।

নায়ীমের কথাগুলো সাবেরার অন্তর স্পর্শ করলো। খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে তিনি বলে ওঠলেন– বেটা! আল্লাহ করুন, আমার এ ধারণা যেনো মিথ্যাই হয়, কিন্তু তোমার এমনি নীরবতা, অকারণ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর অর্থ আর কি হতে পারে?

: আম্মি, আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

সাবেরা এগিয়ে এসে নায়ীমকে বুকে চেপে ধরে বললেন– বেটা! মুজাহিদের সিনা প্রশস্তই হয়ে থাকে।

সন্ধ্যা বেলায় নায়ীম আর বাইরে গেলেন না। রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় পড়ে তিনি বিভোর হয়ে রইলেন গভীর চিন্তায়। তার মনে আশঙ্কা জাগলো, তার চালচলনে মায়ের মনে যে ধারণা জন্মেছে, আবদুল্লাহর মনেও যদি তেমনি ধারণা জন্ম নিয়ে থাকে! এ চিন্তা তার বাড়ি থেকে চলে যাবার ইরাদা-সংকল্প আরও মজবুত করে দিলো।

মধ্যরাতে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠলেন। তারপর কাপড় বদল করে আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার উপর যিন বাঁধলেন। ঘোড়া নিয়ে বাইরে যাবার মতলব করতেই তার অন্তরে এক নতুন খেয়াল জাগলো। ঘোড়া সেখানেই রেখে তিনি আঙিনা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন আযরার বিছানার পাশে।

আযরাও কয়েকদিন ধরে রাত জেগে কাটাচ্ছে নায়ীমের মতো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে দেখছে নায়ীমের কার্যকলাপ। নায়ীম কাছে এলে তার অন্তরে জাগলো প্রচণ্ড কম্পন। ঘুমের ভান করে সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো। নায়ীম বহু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। চাঁদের রোশনী এসে পড়েছে আযরার মুখের ওপর। মনে হচ্ছে যেনো আসমানের চাঁদ উঁকি মেরে দেখছে জমিনের চাঁদকে। নায়ীমের দৃষ্টি এমন করে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে আযরার মুখের উপর, যাতে তিনি খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গেছেন চারদিকের বাস্তবকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলে ওঠলেন– আযরা! তোমার শাদী মোবারক হোক!

নায়ীমের কথা আযরার সারা দেহে কম্পন অনুভূত হলো। তার মনে হলো, যেনো কেউ তাকে গর্তের ভেতরে ফেলে উপর থেকে মাটি-চাপা দিচ্ছে। তার দম যেনো বন্ধ হয়ে আসছে। সে চিৎকার করতে চায়, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য হাত যেনো জোর করে তার মুখ চেপে ধরে। সে চায় নায়ীমের পায়ে মাথা রেখে প্রশ্ন করতে যে, কী তার কসুর! কেন তিনি এ কথা বললেন? কিন্তু সে কথা কম্পিত অন্তরেই গুমরে মরে। চোখ খুলে সে নায়ীমের দিকে তাকাতেও পারে না।

ঘোড়া বের করার জন্য নায়ীম আবার চলে গেলেন আস্তাবলের ভেতরে। আযরা বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। নায়ীম ঘোড়া নিয়ে বাইরে এলেন। আযরা এগিয়ে এসে নায়ীমের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

: নায়ীম! কোথায় যাচ্ছো তুমি?

: আযরা তুমি? তুমি জেগে ওঠেছো?

: কখনই বা আমি ঘুমিয়েছিলাম? দেখো নায়ীম...

আযরার মুখ থেকে আর কোন কথা বের হলো না। কথা শেষ না করেই সে এগিয়ে গিয়ে নায়ীমের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরলো।

: আযরা! আমায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করো না। যেতে দাও আমায়।

: কোথায় যাবে নায়ীম? বহুকাল পর আযরা নায়ীমকে নাম ধরে ডাকছে।

: কয়েক দিনের জন্য আমি বসরা যাচ্ছি আযরা!

: কিন্তু এ সময়ে কেন?

: আযরা, কেন এ সময়ে যাচ্ছি জানতে চাচ্ছ? তুমি জানো না কিছুই?

আযরা সবই জানে। তার অন্তর ধুক ধুক করছে। ঠোঁট কাঁপছে। নায়ীমের ঘোড়ার বাগ ছেড়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখ দুটি দু'হাতে চেপে ধরলো সে।

নায়ীম বললেন- তুমি হয় তো জানো না আযরা, তোমার অশ্রুর কি দাম আমার কাছে, কিন্তু আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমি নিজে এমনি উদাস থেকে তোমাদের পীড়িত করে তুলছি। বসরায় কয়েকদিন থেকে আমার তবিয়ত ঠিক হয়ে আসবে। তোমাদের শাদীর দু'একদিন আগেই আমি ফিরে আসার চেষ্টা করবো। আযরা! একটা কথায় আমি খুশি হয়েছি, আর তোমারও খুশি হওয়া উচিত। তোমার স্বামী হবেন যিনি, তিনি আমার চাইতে অনেক

বেশি গুণের অধিকারী। আহা! তুমি যদি জানতে, আমার ভাইকে আমি কতো ভালোবাসি! এ অশ্রু তাঁর কাছে যেনো ধরা না পড়ে কোনোদিন।

: তুমি সত্যি সত্যি চললে? আযরা প্রশ্ন করলো।

: আমি চাই না, এমনি করে হররোজ আমার সংযমের পরীক্ষা চলতে থাকুক। আযরা, তুমি যাও! আমার দিকে অমনি করে চেয়ো না!

আযরা আর একটি কথাও না বলে ফিরে এলো। কয়েক কদম এসে একবার সে ফিরে তাকালো নায়ীমের দিকে। এক পা ঘোড়ার রেকাবে রেখে নায়ীম তখনও তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আযরা দ্রুত পা ফেলে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেললো।

নায়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মাত্র কয়েক কদম এগিয়ে গেছেন, অমনি তার পেছন থেকে কে যেনো ছুটে এসে তার ঘোড়ার বাগ ধরলেন। নায়ীম অবাক-বিস্ময়ে দেখলেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ। ভাইয়া! নায়ীম হয়রান হয়ে বললেন।

আবদুল্লাহ কঠোর আওয়াজে বললেন– নীচে নেমে এসো।

: ভাইয়া, আমি বাইরে যাচ্ছি।

: আমি জানি। তুমি নীচে নেমে এসো।

নায়ীম ঘোড়া থেকে নামলেন। আবদুল্লাহ এক হাতে ঘোড়ার বাগ অপর হাতে নায়ীমের বাহু ধরে ফিরে চললেন। বাড়ির সীমানায় পৌঁছে তিনি বললেন– ঘোড়া আস্তাবলে বেঁধে এসো।

নায়ীমের কিছু বলার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু আবদুল্লাহ তার সামনে এমন এক গুরুগম্ভীর প্রভুত্বব্যঞ্জক রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হুকুম মেনে চলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তিনি ঘোড়া আস্তাবলে রেখে এসে আবার দাঁড়ালেন ভাইয়ের কাছে। আযরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছেন এ অপূর্ব দৃশ্য। আবদুল্লাহ আবার নায়ীমের বাজু ধরে তাকে নিয়ে ঘরের একটি কামরায় চলে গেলেন।

আযরা কাঁপতে কাঁপতে উঠে চুপি চুপি পা ফেলে সেই কামরার কাছে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ও নায়ীমের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

আবদুল্লাহ বললেন– বাতি জ্বালাও!

নায়ীম বাতি জ্বালালেন। কামরার মধ্যে একটা বড় পশমী কাপড় বিছানো।

আবদুল্লাহ তার ওপর বসে নায়ীমকে বসতে ইশারা করলেন।

: ভাইয়া, আমাকে কি বলতে চান আপনি?

: কিছু না, বসে পড়।

: আমি যাচ্ছিলাম এক জায়গায়।

: তোমায় আমি যেতে মানা করবো না, বসো। তোমার সাথে একটা জরুরি কাজ আছে আমার।

নায়ীম পেরেশান হয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ কাগজ-কলম বের করলেন একটা সিন্দুক থেকে। তারপর লিখতে শুরু করলেন। লেখা শেষ করে আবদুল্লাহ নায়ীমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি সহকারে বললেন– নায়ীম! তুমি বসরায় চলে যাচ্ছ?

জবাবে নায়ীম বললো– ভাইয়া! আপনি যে গুপ্তচর, তা আমার জানা ছিলো না।

: আমি মাফ চাই নায়ীম। আমি তোমার নই, আযরার গুপ্তচর।

: ভাইয়া! অতো শিগ্‌গির আপনি আযরা সম্পর্কে কোনো রায় কায়েম করবেন না।

এ জবাব শুনে আবদুল্লাহ নায়ীমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। নায়ীম ভয় পেয়ে ঘাড় নীচু করলেন। আবদুল্লাহ আদর করে এক হাতে তার চিবুক স্পর্শ করে মুখখানা ওপরে তুলে ধরে বললেন– নায়ীম! আমি তোমার ও আযরা সম্পর্কে কখনও ভুল ধারণা পোষণ করতে পারি না। তুমি আমার চিঠিখানা বসরায় মামার কাছে নিয়ে যাবে।

এ বলে আবদুল্লাহ তার লেখা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন নায়ীমের হাতে।

: ভাইয়া! এতে কি লিখেছেন আপনি?

: তুমি নিজে পড়ে দেখো। এতে আমি তোমার সাজার ব্যবস্থা করেছি।

নায়ীম চিঠিটা পড়লেন–

প্রিয় মামা!

আসসালামু আলাইকুম!

যেহেতু আযরার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মত আমিও উদ্বিগ্ন, তাই আমি

আমার নিজের চাইতে নায়ীমকে তার ভবিষ্যতের মোহাফেয ও আমানতদার হতে দেখলে আরো বেশি খুশি হবো। আর বেশি কি লিখবো? এ চিঠি কেন লিখেছি তা আপনি বুঝবেন। আশা করি আপনি আমার কথায় আমল দেবেন। আমার ইচ্ছা, আমার ছুটি শেষ হবার আগেই নায়ীম ও আযরার শাদী হয়ে যাক। সুবিধামতো তারিখ আপনিই ঠিক করে দেবেন।

আপনার আবদুল্লাহ

চিঠি শেষ করতে করতে নায়ীমের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন– ভাইয়া! আমি এ চিঠি নিয়ে যাবো না। আযরার শাদী আপনার সাথেই হবে। আমায় মাফ করুন ভাইয়া!

আবদুল্লাহ বললেন– তুমি কি মনে করো, নিজের খুশির জন্য আমি আমার ছোট ভাইয়ের সারা জীবনের খুশি কুরবান হতে দেবো?

: আমায় আর শরম দেবেন না আপনি।

: তোমার জন্য কিছুই করছি না আমি। তোমার চাইতে আযরার খুশির দিকেই আমার নজর বেশি। আগে থেকেই আমি ওকে তোমার জোড়া মনে করেছি। তুমি আমার জন্য যা কিছু করতে চাচ্ছ, তাই আমি করছি আযরার জন্য। যাও, ভোর হয়ে এলো। কাল পর্যন্ত অবশ্যই ফিরে আসবে। মামা হয় তো তোমার সঙ্গেই চলে আসবেন। চলো।

: ভাইয়া, কি বলছেন আপনি? আমি যাবো না!

: নায়ীম জেদ করো না। আযরাকে খুশি রাখার দায়িত্ব আমাদের দু'জনেরই।

: ভাইয়া...!

: চলো। আবদুল্লাহ মুখের ভাব বদল করে বললেন এবং নায়ীমের বাজু ধরে কামরা থেকে বাইরে গেলেন।

আযরা তাদের দেখে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। নায়ীমকে ইতস্তত করতে দেখে আবদুল্লাহ নিজে আস্তাবলে গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর ঘোড়া। তারপর দু'ভাই বেরিয়ে গেলেন বাড়ির বাইরে। খানিকক্ষণ পরই আযরার কানে এলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

আবদুল্লাহ ফিরে এসে আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরগুজার করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

ভোরবেলা সাবেরা নায়ীমের বিছানা খালি দেখে আস্তাবলের দিকে গেলেন। আবদুল্লাহ তখন সেখানে তার ঘোড়ার সামনে চারা দিচ্ছিলেন। সাবেরা নায়ীমের ঘোড়া না দেখে পেরেশান হয়ে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলেন– আম্মি! আপনি নায়ীমকে তালাশ করছেন?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোথায় নায়ীম?

জবাবে আবদুল্লাহ বললেন– সে একটা জরুরি কাজে বসরায় গেছে। তারপর খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে মাকে বললেন– আম্মি, নায়ীমের শাদী কবে হবে?

: তোমার শাদী তো হোক বেটা, তার পালাও আসবে!

: আম্মি, আমার ইচ্ছা, ওর শাদী আমার আগেই হোক।

: বেটা! আমি জানি, সে তোমার কত আদরের। তার সম্পর্কে আমি গাফেল নই। তার জন্য আমি সম্পর্ক তালাশ করছি বই কি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় হয় তো আযরার মতো কোন মেয়ে মিলে যাবে।

: আম্মি! আযরা আর নায়ীম তো ছোটবেলা থেকেই পরস্পরের সাথী।

: হ্যাঁ বেটা।

: আম্মি, আমার ইচ্ছা, ওরা চিরকাল এমনি একত্র হয়ে থাক।

: তোমার মতলব তা হলে ...

: জি হ্যাঁ, আমার বড় সাধ, আযরার শাদী নায়ীমের সাথেই হোক।

সাবেরা হয়রান হয়ে আবদুল্লাহর দিকে তাকালেন এবং স্নেহ আদরে দু'হাত তার মাথার ওপর রাখলেন।

৬

বসরা শহরে প্রবেশ করেই নায়ীমের দেখা হলো এক সহপাঠীর সাথে। তার নাম তালহা। তার মুখে নায়ীম শুনলেন জুমআর নামাযের পর শহরের মসজিদে এক আজীমুশ্‌শান জলসা হবে আর তাতে সভাপতিত্ব করবেন ইবনে আমের। মুসলিম বাহিনী সিন্ধুর উপর হামলা করার সংকল্প করেছে এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের ওপর। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরার লোকদের জেহাদে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব ইবনে আমেরের ওপর ন্যস্ত করে নিজে কুফার লোকদের ফৌজে ভর্তি করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইবনে আমেরের বক্তৃতা শুনে বসরার লোকদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক অবস্থা সৃষ্টি হবে, এরূপ আশা করার কারণ রয়েছে। কিন্তু কতগুলো দুষ্ট দুষ্কৃতকারী লোক গোপনে গোপনে সিন্ধুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার বিরোধিতা করছে। তারা জলসায় শরীক হয়ে হয় তো একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলবে, এমনি একটা আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

নায়ীম তালহার সাথে কথা বলতে বলতে তার বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে ঘোড়া রেখে দু'জন রওয়ানা হলেন মসজিদের দিকে। মসজিদে সেদিন জনসমাগম হয়েছে বরাবরে চাইতে অনেক বেশি।

নামাযের পর ইবনে আমের বক্তৃতা করতে মিম্বরের ওপরে ওঠেন। তিনি কোনো কথা বলার আগেই বাইরে থেকে দু'হাজার লোকের একটি দল কোলাহল করতে করতে এসে মসজিদে ঢোকে। তাদের পুরোভাগে একটি মোটাসোঁটা লোক। পরিধানে তার কালো জুব্বা। মাথায় সাদা পাগড়ি ও গলায় ঝুলছে অনেক মূল্যবান মোতির হার। তালহা আগন্তুকের দিকে ইশারা করে বললেন– দেখুন, এই যে ইবনে সাদেক এলো। আমার ভয় হচ্ছে, লোকটা নিশ্চয়ই জলসায় কোনো হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে।

ইবনে সাদেক নায়ীমের আসন থেকে কয়েক গজ দূরে আর তার দলের লোকেরাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসে পড়লো।

ইবনে আমের তাদের চুপ করে বসার অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বললেন– হে আল্লাহর রাসূলের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী বীরদের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সন্তান-সন্ততিরা! বিগত আশি নব্বই বছর ধরে দুনিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা পরাক্রম এবং শক্তির পরীক্ষা নিয়েছে। সে যুগে আমরা দুনিয়ার বড় বড় শক্তির মোকাবেলা করেছি। বড় বড় পরাক্রান্ত গর্বিত বাদশাহর মস্তক অবনমিত হয়েছে আমাদের সামনে। আমাদের সৌভাগ্যের কাহিনী শুরু হয়েছে তখন থেকে, যখন কুফরের ঘূর্ণিঝড় রেসালাতের দীপশিখার আকর্ষণে ধাবমান পতঙ্গদলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এগিয়ে এসেছে মদীনার চার দেয়ালের দিকে; তখন ইসলামের বৃক্ষমূল বুকের খুনে সিঞ্চিত করে উর্বর করে তুলার মানসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে আত্মদানকারী তিনশ' তেরো জন বীর সিপাহী কাফের বাহিনীর তীর, নেযা ও তলোয়ারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এ আজীমুশ্‌শান বিজয়ের পর তাওহিদের ঝাণ্ডা উঁচু করে আমরা কুফরের পেছনে ধাওয়া করে ছড়িয়ে পড়েছি দুনিয়ার দিক-দিগন্তে। বিপুল বিরাট দুনিয়ায় রয়েছে বহু অঞ্চল, যেখানে আল্লাহ তায়ালার আখেরী পয়গাম আজো পৌঁছেনি। আমাদের কর্তব্য আমাদের প্রভু পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার আখেরী পয়গাম আমরা দুনিয়ার সকল দেশে পৌঁছে দেবো। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কানুন বয়ে এনেছেন, তা আমরা জানিয়ে দেবো দুনিয়ার তামাম মানুষকে। তারই বদৌলতে দুনিয়ায় কায়েম হবে শান্তি, আর দুনিয়ায় দুর্বল ও শক্তিমান কওমসমূহ মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে মানব-সাম্যের এক বিপুল ক্ষেত্র। মজলুম অসহায় মানুষ আবার ফিরে পাবে তাদের হারানো অধিকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যে কোনো শক্তিই এ আজীমুশ্‌শান কানুনের মোকাবেলা করতে দাঁড়িয়েছে, তারই ভাগ্যলিপি হয়েছে ধ্বংস।

মুসলমান ভাইয়েরা! আমাদের শৌর্য পরীক্ষার সাহস সিন্ধুরাজের কি করে হলো, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। তিনি কি করে বুঝলেন, মুসলমান গৃহবিবাদের ফলে এতটা দুর্বল শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে, তারা তাদের মা-বোন ও কন্যাদের অবমাননা নীরবে বরদাশত করে যাবে!

বীর মুজাহিদ দল! তোমাদের শৌর্য পরীক্ষার মুহূর্ত সমাগত। আমার কথার মর্ম এ নয়– তোমরা অন্তরে প্রতিহিংসাবৃত্তি নিয়ে জেগে ওঠবে। সিন্ধুরাজকে

আমরা মাফ করতে পারি, কিন্তু মানব-সাম্যের নিশান-বরদার হয়ে আমরা হিন্দুস্তানের মজলুম কওমসমূহের ওপর তার নির্মম স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নেবো না। রাজা দাহির কয়েকজন মুসলমানকে কয়েদখানায় আটক করে আমাদের দাওয়াত করেছেন সিন্ধুর লাখো মানুষকে তার লৌহকঠিন নিষ্পেষণ থেকে নাজাত দেবার জন্য। মুজাহিদ দল! জেগে ওঠো! বিজয়ভেরী বাজিয়ে তোমরা পৌঁছে যাও হিন্দুস্তানের শেষ সীমানা পর্যন্ত!

ইবনে আমেরের বক্তব্য শেষ হবার আগেই ইবনে সাদেক উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললো– মুসলমানগণ! আমি ইবনে আমেরকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মনে করি। তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার আফসোস এমনি উচ্চ চরিত্রের লোকও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো ক্ষমতালোভীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তোমাদের সামনে দুনিয়ার শান্তি বিপর্যস্ত করার ভয়াবহ মন্ত্রণা পেশ করছেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অতীত জুলুমের ফলে বসরার বেশির ভাগ লোকই ছিলো তার বিরোধী। তারা বহুদিন ধরে এমন একটি লোকের সন্ধান করছিলো, যে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস রাখে। তারা অবাক বিস্ময়ে ইবনে সাদেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ইবনে আমের কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইবনে সাদেকের বুলন্দ আওয়াজ তাঁর ক্ষীণকণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠলো–

সমবেত জনগণ! হুকুমত তোমাদের রাজত্ব ও গনিমত লাভ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে এ ধরনের যুদ্ধাভিযানে উদ্বুদ্ধ করছে না; কিন্তু একবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, অতীতে এমনি রাজ্য ও গনিমতের লোভে কত জান কুরবান করতে হয়েছে, কত শিশু এতিম ও কত নারী বিধবা হয়েছে! আমি নিজের চোখে তুর্কিস্তানের ময়দানে তোমাদের নওজোয়ান ভাই-বেটাদের হাজারো লাশ কবর ও দাফন ছাড়া পড়ে থাকতে দেখেছি। কত আহতকে তড়পাতে আর মাথা খুঁড়ে মরতে দেখেছি। এ অবমাননাকর দৃশ্য দেখে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মুসলমানের খুন এতটা সস্তা নয়– হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিজয়খ্যাতি ছড়াবার জন্য অকাতরে বইয়ে দিতে হবে।

মুসলমান ভাইয়েরা!

আমি জেহাদের বিরোধিতা করছি না। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো, গোড়ার দিকে আমাদের জেহাদের প্রয়োজন হয়েছিলো। কারণ আমরা ছিলাম দুর্বল। কাফের শক্তি আমাদের হটিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। এখন

আমরা শক্তিমান। কোনো দুশমনের ভয় নেই আমাদের। এখন আমাদের নজর দিতে হবে দুনিয়াকে শান্তির আবাস বানানোর দিকে।

মুসলমান ভাইয়েরা!

হাজ্জাজের রাজ্যলোভ চরিতার্থ করার জন্য যে সব যুদ্ধ করা হচ্ছে, তার সাথে জেহাদের লেশমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সমবেত জনগণকে ইবনে সাদেকের কথায় প্রভাবিত হতে দেখে ইবনে আমের বুলন্দ আওয়াজে বললেন– মুসলমান ভাইয়েরা! আমার ধারণা ছিল না, আজো আমাদের মধ্যে এমনি অনিষ্টকারী লোক বিদ্যমান রয়েছে, যে...!

ইবনে সাদেক ইবনে আমেরের কথা শেষ হতে না দিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠলো– আমার বলতে শরম বোধ হচ্ছে, ইবনে আমেরের মতো সম্মানিত ব্যক্তিও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গুপ্তচর দলে শামিল।

এ সময় ইবনে সাদেকের এক সাথী বলে উঠলো– হাজ্জাজের গুপ্তচরকে বাইরে বের করে দাও।

ইবনে সাদেকের কৌশল সফল হলো। কেউ কেউ হাজ্জাজের গুপ্তচর বলে চিৎকার জুড়লো, কেউ কেউ আবার ইবনে আমেরকে অপমানজনক গালি-গালাজ করতে লাগলো। ইবনে আমেরের এক শাগরেদ এক ব্যক্তির মুখে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের গালমন্দ বরদাশত করতে না পেরে তার মুখের উপর এক চড় বসিয়ে দিলো। ফলে মসজিদে রীতিমতো হাঙ্গামা বেধে গেলো। জনগণ পরস্পরে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসেম এতক্ষণে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠেছেন। তাঁর হাত বারংবার তলোয়ারের কব্জির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিচ্ছেন ওস্তাদের ইশারায় আর মসজিদের মর্যাদার খাতিরে।

এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে নায়ীম জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন মিম্বরের দিকে। তারপর মিম্বরে উঠে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন বুলন্দ ও শিরীন আওয়াজে। কুরআনের আওয়াজ সমবেত জনতার মধ্যে প্রশান্ত ভাব ফিরিয়ে আনলো এবং তারা পরস্পরকে চুপ করার পরামর্শ দিতে লাগলো। ইবনে সাদেক এসেছে জলসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার জন্য। তাই তার ইচ্ছা, আর একবার একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের ফলে জলসায় সমবেত জনগণের মনোভাব আর নিজের জানের আশঙ্কা বিবেচনা করে সে চুপ করে গেলো। জনতা চুপ করে গেলে নায়ীম তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

বসরার বদকিসমত লোকেরা! তোমরা আল্লাহ তায়ালার গজব কহরের ভয় করো এবং ভেবে দেখো, তোমরা কোথায় দাঁড়িয়ে কি করছো! আফসোস! যেসব মসজিদ গড়ে তোলার জন্য তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা দেহের খুন আর অস্থি পেশ করতেন, আজ তোমরা সেই মসজিদে ঢুকেও গোলযোগ সৃষ্টি করতে দ্বিধা করছো না।

নায়ীমের কথায় মসজিদের প্রশান্তি ফিরে আসে। গলার আওয়াজ খানিকটা বিষণ্ন করে তিনি বলে যেতে লাগলেন–

এ সেই জায়গা, যেখানে ঢুকেই তোমাদের পূর্বপুরুষ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কেঁপে ওঠতেন। দুনিয়ার সব ব্যাপার পেছনে ফেলে এখানে ঢুকতেন তাঁরা। আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, তোমাদের মনের এ রকম পরিবর্তন কী করে হলো! তোমাদের ঈমান এতটা দুর্বল হয়ে গেছে, তা আমি ভাবতেও পারি না। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পথে জানবাজি রাখতেন যে মুজাহিদ দল, তোমরা তাদেরই সন্তান, তাদেরই বংশধর। কোনোদিন সেই পূর্বপুরুষের কাছে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে হবে, এ অনুভূতি যতক্ষণ তোমাদের রয়েছে, ততক্ষণ তোমরা এমনি জঘন্য কার্যকলাপের পথে যেতে পারো না। আমি জানি, তোমাদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি করছে অপর কোন লোক।

নায়ীমের বক্তৃতায় ইবনে সাদেক চমকে ওঠলো। নাজুক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সে শ্রোতাদের মন থেকে নায়ীমের কথার প্রভাব দূর করার চেষ্টা করলো। সে চিৎকার করে বললো– দেখুন, এও হাজ্জাজের গুপ্তচর, একে বের করে দিন।

সে আরও কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু রাগে কাঁপতে কাঁপতে নায়ীম বুলন্দ আওয়াজে বললেন– আমি হাজ্জাজের গুপ্তচর, তাই ঠিক, তাই ঠিক; কিন্তু ইসলামের গাদ্দার নই। বসরার বদনসীব লোকেরা! তোমরা এ ব্যক্তির জবান থেকে শুনেছো আমাদের জেহাদের প্রয়োজন ছিল তখন, যখন আমরা দুর্বল শক্তিহীন ছিলাম; কিন্তু একথা শুনেও তোমাদের দেহের খুন গরম হয়ে ওঠেনি। তোমাদের মধ্যে কেউ একথা ভাবলো না, আগের দিনের প্রত্যেক মুসলমান শক্তি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে এ যুগের সকল মুসলমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারতেন। তাঁরা কি ছিলেন আর কি করে গেছেন? তাঁদের ভেতরে কি ছিলো, তা তোমাদের জানা নেই? তাঁদের ভেতরে ছিলো সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর আন্তরিকতা, উমর ফারুক (রা.)-এর মহৎ মন, উসমান (রা.)-এর বদান্যতা, আলী মুরতাযা (রা.)-এর শৌর্য এবং আসমান-জমিনের মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম রাসূলের দোয়া। তোমাদের মনে পড়ে, যেদিন কুফর ও ইসলামের পহেলা লড়াইয়ে তলোয়ার ও কাফন নিয়ে

তারা তিনশ' তেরো জন বেরিয়েছিলেন, সেদিন দীন-দুনিয়ার রহমতের নবী বলেছিলেন– আজ পুরো ইসলাম কুফরের পূর্ণ শক্তির মোকাবেলা করতে যাচ্ছে, কিন্তু আজ এক নীচ মানুষ তোমাদের মুখের উপর বলছে, আমাদের চাইতে তাঁরা ছিলেন দুর্বল। নাউযুবিল্লাহ!

নায়ীমের কথাগুলো সবার মনের ওপরই দাগ কাটে। একজন আল্লাহু আকবার তকবীর ধ্বনি করলো, আর সবাই তার সাথে আওয়াজ তুললো। এর পর সবাই ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো ইবনে সাদেকের দিকে। কেউ কেউ চাপা গলায় তার নিন্দাও শুরু করলো। নায়ীম বক্তৃতা করে চললেন–

আমাদের বুযুর্গ দোস্তগণ! আল্লাহ তায়ালার রাহে জান মাল ও দুনিয়ার তামাম স্বাচ্ছন্দ্য কুরবান করেন যে মুজাহিদ দল, তাঁদের উপর রাজ্য ও মালে-গনিমতের লোভের অপবাদ আরোপ করা না-ইনসাফী। যদি দুনিয়ার লোভ তাঁদের ভেতর থাকতো, তাহলে মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুজাহিদ যেভাবে অগণিত কাফের সৈন্যের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন আত্মদানের সে উদ্যম-উৎসাহ তোমরা দেখতে পেতে না। রাজ্য লোভ নিয়ে বের হলে তাঁরা বিজিত কওমকে সমঅধিকার দিতে পারতেন না। আজো আমাদের ভেতরে এমন কেউ নেই, যে শাহাদাতের পরিবর্তে মালে গনিমতের লোভ নিয়ে জেহাদের ময়দানে যাচ্ছে। মুজাহিদ শাসন-ক্ষমতা চায় না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রাহে যারা সব কিছু কুরবান করে দিতে তৈরি, সব দিক দিয়ে দুনিয়ায় তাঁদের মাথা উঁচু থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। সালতানাত মুজাহিদের মহিমারই অংশ।

মুসলমান ভাইয়েরা! আমাদের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেমন সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ঈমান ও আন্তরিকতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ, তেমনি আবদুল্লাহ বিন উবাইর মুনাফেকির কাহিনী থেকেও তা মুক্ত নয়। সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের সামনে হামেশা যেমন থাকে ইসলামের সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি আবদুল্লাহ বিন উবাইর উত্তরাধিকারীরা হামেশা ইসলামের তরক্কির পথে বাধার প্রাচীর তুলে দেয়; কিন্তু তার ফল কি হয়ে থাকে? আমি আবদুল্লাহ বিন উবাইর এ উত্তরাধিকারীর কাছে জিজ্ঞেস করছি।

ইবনে সাদেকের অবস্থাটা তখন চারদিক থেকে শিকারীর বেড়াজালের মধ্যে অবরুদ্ধ শিয়ালের মতো হয়ে পড়েছে। সে তখন ঠিকই বুঝে নিয়েছে, কথার যাদুকর এ নওজোয়ান আরো কিছু কথা বললে সমবেত লোকজন সবাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি

দেখে পেছন দিকে সরতে লাগলো। একজন বলে উঠলো– মুনাফেক পালাচ্ছে, ধর। এক নওজোয়ান 'ধর ধর' আওয়াজ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাথীরা তাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জনতার ভিড়ে টিকতে পারলো না। কেউ তাকে ধাক্কা মারে আর কেউ বা মারে চড়চাপ্পড়। মুহাম্মদ বিন কাসেম ছুটে এসে জনতার হাত থেকে বহু কষ্টে তার জান বাঁচিয়ে দিলেন।

ইবনে সাদেক কোনমতে বিপদ-মুক্ত হয়ে ছুটে পালালো। কয়েকটি দুর্দান্ত নওজোয়ান শিকার হাতছাড়া হচ্ছে দেখে ছুটতে চাইলো পিছু পিছু। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসেম তাদের বাধা দেন। ইবনে সাদেকের দলের লোকেরা একে একে বেরিয়ে গেলো মসজিদ থেকে। আবার সবাই চুপ করে নায়ীমের দিকে মনোযোগ দিলে তিনি বলতে লাগলেন–

যে অগণিত অসহায় মানুষ কুফরের জুলুমের আগুনে জ্বলছে– বদর, হোনায়ন, কাদেসিয়া, ইয়ারমুক ও আজনাদাইনের যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পূর্বপুরুষদের তাকবির ধ্বনি ছিলো তাদেরই আর্ত হাহাকারের জবাব; আর আজকের দুর্গত মানবতা সিন্ধুর ময়দানে আমাদের তলোয়ারের ঝংকার শোনার জন্য বেকারার অস্থির পেরেশান হয়ে আছে। মুসলমান! তোমাদের কওমের যে মেয়েগুলো সিন্ধুরাজের কয়েদখানায় বন্দিনী, তাদের ফরিয়াদ শুনেছো? আমি তোমাদের সিন্ধু বিজয়ের খোশ্‌খবর দিতে চাই!

মুজাহিদ হচ্ছে আল্লাহর তলোয়ার। যে শির তার সামনে উঁচু হয়ে ওঠবে, সে-ই হবে ধূলিলুণ্ঠিত। সিন্ধুরাজ তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন তলোয়ারের তীক্ষ্ণধার ও বাজুর শক্তি পরীক্ষা করতে।

মুজাহিদ দল! জেগে ওঠে প্রমাণ করে দাও, এখনও তোমাদের শিরায় আরবের ঘোড়সওয়ারদের রক্তধারা জমে যায়নি। একদিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জেহাদী মনোভাবের পরীক্ষা নেবেন, অপরদিকে দুনিয়া তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধের পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে। তোমরা এ পরীক্ষার জন্য তৈরি?

: আমরা সবাই তৈরি, আমরা সবাই তৈরি– এ গগনভেদী আওয়াজ তুলে বুড়ো-জোয়ান সবাই তরুণ মুজাহিদের ডাকে সাড়া দিলো।

নায়ীম বৃদ্ধ ওস্তাদের দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি আর চোখে আনন্দের অশ্রু। ইবনে আমের আবার ওঠে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর ভর্তির জন্য নাম পেশ করার জরুরি নির্দেশ দিলেন। এর পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

* * *

রাতের বেলা মুহাম্মদ বিন কাসেমের ঘরে ইবনে আমের, সাঈদ, নায়ীম ও শহরের আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দিনের ঘটনাবলীর আলোচনায় ব্যস্ত। নায়ীমের প্রভাব কেবল বসরার নওজোয়ানদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েনি; বরং তাঁর প্রশংসা শোনা যাচ্ছে বয়স্ক লোকদেরও মুখে মুখে। ইবনে আমের তাঁর সুযোগ্য শাগরেদকে ভালো করেই জানতেন। তিনি জানতেন, অকুতোভয়ে যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো যোগ্যতা তার ভেতর পুরোমাত্রায় রয়েছে। কিন্তু নায়ীম আজ যা করেছেন, তা তাঁর প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশি। সাঈদেরও খুশির সীমা নেই। তিনি বার বার নওজোয়ান ভাগ্নের মুখের দিকে তাকান আর তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তার দীর্ঘ জীবন কামনার নেক দোয়া। বক্তৃতা শেষে নায়ীমকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি সবার আগে ফৌজে শামিল হবার জন্য নিজের নাম পেশ করেছেন এবং মকতবে তার খেদমতের সবচাইতে জরুরি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন। ইবনে আমেরের দুর্বল হাতে তলোয়ার ধরার শক্তি আর নেই, তবুও তিনি তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ মুহাম্মদ বিন কাসেম ও নায়ীমের সাথী হবার ইরাদা জানিয়েছেন। কিন্তু বসরার লোকেরা তাঁকে বাধা দিয়ে একবাক্যে বলেছে— মাদরাসায় আপনার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। বসরার লোকেরা সাঈদকেও বাধা দিতে চেয়েছে; কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসেম অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বের জন্য একজন অভিজ্ঞ সালারের প্রয়োজন অনুভব করে তাঁকে সেনাবাহিনীতে শামিল করে নিয়েছেন।

নায়ীম প্রতি মুহূর্তে এক মনযিলের নিকটবর্তী হচ্ছেন, আর এক মনযিল থেকে সরে যাচ্ছেন দূরে বহুদূরে। তিনি মজলিসে বসে বেপরোয়া হয়ে শুনছেন সব আলোচনা। ইবনে আমের অভ্যাসমতো বর্ণনা করে যাচ্ছেন কুফর ও ইসলামের গোড়ার দিকের সংঘাতের কাহিনী। তিনি আলোচনা করছেন ইসলামের আজীমুশ্‌শান মুজাহিদ খালেদ বিন অলিদের হামলার বিভিন্ন তরিকা।

কে যেন বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত করলো। মুহাম্মদ বিন কাসেমের গোলাম দরজা খুলে দিলো। এক বৃদ্ধ আরব এক হাতে একটি পুঁটলি এবং

অপর হাতে লাঠি নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। বার্ধক্যে বৃদ্ধের ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। তাঁর মুখে পুরনো জখমের দাগ। দেখে মনে হয় এককালে তিনি তলোয়ার নেযা নিয়ে খেলেছেন। ইবনে আমের তাঁকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে মোসাফাহা করলেন। বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন– মকতবে আমি আপনাকে খুঁজে এসেছি। সেখানে শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন।

: আপনি বড়ই তকলিফ করেছেন। বসুন।

বৃদ্ধ ইবনে আমেরের কাছে বসলেন। ইবনে আমের তাঁকে বললেন– বহুদিন পর আপনার জিয়ারত নসীব হলো। বলুন, কি করে এলেন?

বৃদ্ধ বললেন– আজকের মসজিদের ঘটনা শুনেছি লোকের মুখে। যে নওজোয়ানের হিম্মতের তারিফ করছে বসরার বাচ্চা বুড়ো সকলে, আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। শোনলাম, সে নাকি আবদুর রহমানের বেটা। আবদুর রহমানের বাপ ছিলেন আমার অতি বড় দোস্ত। ছেলেটির সাথে দেখা হলে আমার তরফ থেকে কয়েকটি জিনিস আপনি তাকে দেবেন।

বৃদ্ধ তাঁর পুঁটলি খুলে বললেন– পরশু তুর্কিস্তান থেকে খবর পেয়েছি, ওবায়দা শহীদ হয়েছে।

: কোন ওবায়দা? আপনার নাতি? ইবনে আমের প্রশ্ন করলেন।

: হ্যাঁ তাই। আমার ঘরে তার এই তলোয়ার আর বর্ম ফালতু পড়ে ছিলো। আমার ঘরে এসব জিনিসের হক আদায় করার মতো আর কেউ নেই। তাই আমার ইচ্ছা কোন মুজাহিদকে এগুলো নজরানা দেবো।

ইবনে আমের নায়ীমের দিকে তাকালেন। তাঁর মতলব বুঝতে পেরে নায়ীম উঠে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে বসতে বসতে বললেন– আপনার গুণগ্রাহিতায় আমি ধন্য। যথাসাধ্য আপনার তোহফার সদ্ব্যবহার আমি করবো। আমায় আপনি দোয়া করুন।

মধ্যরাতের কাছাকাছি মজলিস শেষ হলে সবাই যার যার ঘরে চলে গেলেন। নায়ীম তাঁর মামার সাথে যেতে চাইলেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসেম তাকে নিজের কাছে রেখে দেন।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের অনুরোধে সাঈদ নায়ীমকে সেখানে থাকতে বললেন। ইবনে আমের ও সাঈদকে বিদায় দেবার জন্য নায়ীম এবং মুহাম্মদ বিন কাসেম ঘরের বাইরে এলেন এবং কিছু দূর তাঁদের সাথে সাথে গেলেন। নায়ীমের সাথে তখনও সাঈদের কোনো আলাপ হয়নি বাড়ি ঘর সম্পর্কে।

চলতে চলতে তিনি প্রশ্ন করলেন– নায়ীম! বাড়ির খবর সব ভাল তো?

: জি হ্যাঁ মামা! বাড়িতে সবাই ভাল। আম্মি...। নায়ীম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চিঠিটা বের করার মতলব করে তিনি হাত ঢোকালেন জেবের মধ্যে, কিন্তু কি যেন চিন্তা করে খালি হাতই জেব থেকে বের করলেন।

: হ্যাঁ, বোন কি বলেছিলেন?

: তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

বাকি রাতটা নায়ীম বিছানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ করে কাটালেন। ভোর হবার খানিকটা আগে তার চোখে নামলো ঘুমের মায়া। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি যেনো তার এলাকার মুগ্ধকর পরিবেশে মহব্বতের সুরঝংকারের মাঝখানে প্রিয়তমার সান্নিধ্য থেকে দূরে বহু দূরে সিন্ধুর দিগন্তপ্রসারী ময়দানে যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পরদিন নায়ীম ফৌজের একজন সিপাহ্সালার হিসেবে রওয়ানা হয়ে গেলেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি যেনো তাঁর পুরনো লোকালয় ভেঙে চলেছেন, আর সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন নতুন আকাঙ্ক্ষার দুনিয়া গড়তে। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে তাঁর লশ্‌কর চলেছে এক উঁচু টিলার ওপর দিয়ে। যে বাগিচার ছায়ায় নায়ীম কত সুখ-শান্তির দিন কাটিয়েছেন তারই দিকে নজর পড়ছে এখান থেকে। এ পথ থেকে দু'ক্রোশ দূরে রয়েছে তার যৌবনের নিষ্পাপ আশার প্রতীক, তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন। মন চায় তখ্‌খুনি তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান সেই মরুভূমির হুরের কাছে, তাঁকে দুটো কথা বলেন, দুটো কথা শুনে আসেন তার কাছ থেকে এ বিদায় মুহূর্তে, কিন্তু মুজাহিদদের আত্মা এ সূক্ষ্ম অনুভূতির ওপর বিজয়ী হয়। পকেট থেকে তিনি চিঠিটা বের করেন, পড়েন, আবার তা গুঁজে রাখেন পকেটে।

* * *

বাড়িতে আবদুল্লাহ ও নায়ীমের শেষ কথাবার্তা শোনার পর আযরার খুশির অন্ত নেই। তার রূহ যেন আনন্দের সপ্তম আসমানে উড়ে বেড়াচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে যেন শুনতে পাচ্ছে আসমানের সেতারাদের নির্বাক সংগীত। সারা রাত জেগে থেকেও যেন তার মুখে ফুটে ওঠেছে আগের চাইতে বেশি খুশির আভাস। হতাশার আগুনে জ্বলে পুড়ে যাবার পর আশাতরু আবার ফুলে

ফুলে সবুজ হয়ে ওঠেছে।

আবদুল্লাহর উপকারের বোঝা যেনো ভারাক্রান্ত করে তুলেছে আযরার মন। তার অন্তহীন আনন্দের ভেতর ব্যথা হয়ে বাজে আবদুল্লাহর উপকারের গোপন লজ্জা। সে ভাবে, আবদুল্লাহর এ ত্যাগ তো শুধু নায়ীমের জন্যই নয়, তাদের দু'জনেরই জন্য। তাঁর মহব্বত কতো নিঃস্বার্থ! কতোটা ব্যথা তাঁর মনে লেগেছে! আহা! সে যদি এমনি করে ব্যথা না দিয়ে পারতো! আহা! নায়ীমকে যদি সে এতটা মহব্বত না করতো আর আবদুল্লাহর মনে এমনি করে আঘাত না দিতো! কল্পনার এ বেদনাদায়ক অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়ে যায় তার অন্তর থেকে ওঠে আসা আনন্দের সুরঝংকারে।

আযরা ভেবেছে নায়ীম ফিরে আসবেন সন্ধ্যার আগেই। বড় কষ্টে কেটেছে তার অপেক্ষার দিন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কিন্তু নায়ীম ফিরে এলেন না। গোধূলির ম্লানিমা যখন রাতের অন্ধকারে রূপান্তরিত হতে লাগলো, আসমানের কালো পর্দায় ঝিকমিক করতে লাগলো অসংখ্য সেতারার মোতি, তখন আযরার অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চললো। মধ্যরাত অতীত হয়ে গেলো, দুঃখের রাতকে আশার সান্ত্বনা দিয়ে আযরা পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিনটি কাটলো আরও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে এবং পরের রাতটি হলো যেনো আরও দীর্ঘ।

আবার ভোর কেটে গেলো, সন্ধ্যা হলো; কিন্তু নায়ীম ফিরে এলেন না। সন্ধ্যাবেলা আযরা ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে এক টিলার উপর গিয়ে নায়ীমের পথ চেয়ে বসে রইলো। বসরার পথে বার বার ধূলি উড়ছে কম বেশি করে। বার বার সে ভাবে, ওই বুঝি নায়ীম এলেন। প্রতিবার হতাশ হয়ে সে চেপে ধরে তার কম্পিত বুক। উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে যায় কত পথিক। দূর থেকে সে দেখে, বুঝি নায়ীম এলেন। কিন্তু কাছে এলেই সে দেখে, সব ভুল। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাখাল দল ফিরে যাচ্ছে আপন ঘরে। গাছের ওপর কল-গুঞ্জন করে পাখিরা তাদের সমজাতীয় পাখিদের সন্ধ্যার আগমনী পয়গাম জানাচ্ছে। আযরা ঘরে ফিরে যাবার ইরাদা করেছে, অমনি পেছন থেকে শুনতে পেলো কার পায়ের আওয়াজ। ফিরে দেখলো আবদুল্লাহ আসছেন। হায়া-লজ্জায় আযরার চোখ নত হয়ে এলো। আবদুল্লাহ কয়েক কদম এগিয়ে এসে বললেন– আযরা! এবার ঘরে চলো। চিন্তা করো না। নায়ীম শিগ্‌গিরই এসে পড়বে। বসরার কোনো বড়লোক দোস্ত ওকে আসতে বাধা দিয়েছেন।

আযরা কোনো কথা না বলে চললো ঘরের দিকে। পরদিন বসরা থেকে এক লোক এলে জানা গেলো, নায়ীম সিন্ধুর পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। খবর পেয়ে সাবেরা, আবদুল্লাহ ও আযরার মনে নানারকম ধারণা জাগলো। সাবেরা ও আবদুল্লাহর সন্দেহ হলো, হয় তো নায়ীমের আত্মম্ভরিতা তার মনকে ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমুখ করেছে। আযরার সন্দেহ তাদের থেকে ভিন্ন ধরনের। বসরার বড় বড় লোক তার দোস্ত, আর তাদের কেউ তাকে আসতে বাধা দিয়েছেন– আবদুল্লাহর এই কথা তার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। সে বার বার মনে মনে বলছে, নায়ীমের দেহ সৌন্দর্য ও বাহাদুরীর খ্যাতি বড় বড় লোককে তার কাছে টেনে এনেছে। তারা হয় তো তার সাথে সম্পর্ক রাখাটাকে গর্বের বিষয় মনে করে সম্ভবত বসরার হাজারো সুন্দরী ও বড় ঘরের মেয়ে তার কাছে আত্মনিবেদন করতে লালায়িত। আর আমার এমন গুণই বা কোথায়, যা তাকে ফিরিয়ে রাখবে অপরের প্রতি আকর্ষণ থেকে! যদি তার জেহাদে যেতেই হয়, তবু কেন আমায় বলে গেলেন না? তাকে বাধা দেবার মতো কে আছে এ বাড়িতে? হয় তো এ এলাকায় তার পেরেশানির কারণ আমিই ছিলাম না। হয় তো আর কারও সাথে তিনি মহব্বতের সম্পর্ক পেতেছিলেন। ... কিন্তু না। তা কখনও হতে পারে না। নায়ীম, আমার নায়ীম... এমন তো নয় কখনও। তিনি আমায় ধোকা দিতে পারেন না। আর যদি দেনই, তাহলেই বা তাকে নিন্দা করার কি অধিকার আছে আমার?

তখনকার সময় দেবল ছিলো সিন্ধুর এক মশহুর বন্দর। শহরের চার দেয়ালের ওপর সিন্ধুরাজের এতটা ভরসা ছিল, ময়দানে নেমে মোকাবেলা না করে তিনি তার বেশুমার ফৌজ নিয়ে আশ্রয় নিলেন শহরের ভেতরে। মুহাম্মদ বিন কাসেম শহর অবরোধ করে মিনজানিকের সাহায্যে প্রস্তর বর্ষণ শুরু করলেন। কিন্তু কয়েক দিনের কঠিন হামলা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী শহরের দেয়াল ভাঙতে পারলো না। অবশেষে একদিন একটা ভারী পাথর পড়লো এক মশহুর বৌদ্ধ মন্দিরের ওপর। মন্দিরের স্বর্ণ-গম্বুজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো নীচে। তার সাথেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো বুদ্ধের এক প্রাচীন মূর্তি। মূর্তিটি ভেঙে পড়ায় রাজা দাহির অশুভ লক্ষণ মনে করে ঘাবড়ে গেলেন এবং রাতের বেলায় ফৌজ সাথে নিয়ে পালিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণাবাদে।

দেবল বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসেম এগিয়ে এলেন নীরুনের দিকে। নীরুনের বাসিন্দারা লড়াই না করেই হাতিয়ার সমর্পণ করে দিলো।

নীরুন দখল করার পর মুহাম্মদ বিন কাসেম ভরোচ ও সিস্তানের মশহুর কেল্লা

জয় করলেন। রাজা দাহির ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছে চারদিকে দূত পাঠিয়ে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। তার আবেদনে দুশ' হাতী ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার ও কিছুসংখ্যক পদাতিক সিপাহী এসে জমা হলো তার পাশে। রাজা দাহির বিপুল সেনাসামন্ত সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদের বাইরে এসে সিন্ধু-নদের কিনারে এক বিস্তৃত ময়দানে তাঁবু ফেলে মুহাম্মদ বিন কাসেমের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসেম কিশতির সেতু রচনা করে সিন্ধু-নদ পার হলেন। ঈসায়ী ৭১৩ সালের ১৯ জুন মুহাম্মদ বিন কাসেমের ফৌজ এসে সন্ধ্যাবেলায় তাঁবু ফেললো রাজা দাহিরের তাঁবু থেকে দুই ক্রোশ দূরে। ভোর বেলা দাহির বাহিনীর শঙ্খঘণ্টা বেজে ওঠলো। অপরদিকে উচ্চারিত হলো 'আল্লাহু আকবর' তাকবির ধ্বনি এবং দুই লশ্‌কর নিজ নিজ দেশের সামরিক রীতি অনুযায়ী সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চললো পরস্পরের দিকে।

মুহাম্মদ বিন কাসেম তাঁর ফৌজকে পাঁচশ'র ছোট ছোট দলে ভাগ করে হুকুম দিলেন সামনে এগিয়ে যেতে। অপরদিকে সিন্ধুর ফৌজে সবার আগে দু'শ' হাতী এগিয়ে এলো। ভয় পেয়ে মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো পিছু হটে যেতে লাগলো। এসব দেখে মুহাম্মদ বিন কাসেম তাঁর ফৌজকে হুকুম দিলেন তীর বর্ষণ করতে। একটি হাতী মুসলিম সিপাহীদের সারি দলিত করে এগিয়ে এলো সামনের দিকে। মুহাম্মদ বিন কাসেম সেটির মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়া ভয়ে সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কাছেও যেতে চাইলো না। মুহাম্মদ বিন কাসেম বাধ্য হয়ে নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে এবং এগিয়ে গিয়ে হাতীর শুঁড় কেটে ফেললেন। নায়ীম ও সাঈদ তাঁর মতোই এগিয়ে গিয়ে কেটে দিলেন আরও দু'টি হাতীর শুঁড়। আহত হাতী উলটো দিকে ঘুরে সিন্ধুর ফৌজকেই দলিত করে বেরিয়ে গেলো। বাকী হাতীগুলো তীরবৃষ্টির ভেতর দিয়ে এগুতে পারলো না। সেগুলো আহত হয়ে সিন্ধুর সিপাহীদের সারি ছিন্নভিন্ন করে চললো। সুযোগ বুঝে মুহাম্মদ বিন কাসেম সামনের সারির সিপাহীদের এগিয়ে যেতে হুকুম দিলেন এবং পেছনের দলগুলোকে তিন দিক থেকে শত্রুবাহিনীর ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনীর প্রাণপাত সংগ্রামের ফলে শত্রুবাহিনীর পা টলটলায়মান হয়ে পড়ে। সাঈদ কয়েকজন দুঃসাহসী যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে শত্রুবাহিনীর সারি ভেদ করে গিয়ে তাদের মধ্যভাগে পৌঁছে যান। নায়ীমও তার বাহাদুর মামার পেছনে পড়ে থাকতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি নেযা হাতে পথ খোলাসা করে তার কাছে এগিয়ে গেলেন। রাজা দাহির তার রানীদের মাঝখানে এক

হাতীর উপর সোনার আসনে বসে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলেন। তার আগে কয়েকজন পূজারী একটি মূর্তি মাথায় নিয়ে ভজন গেয়ে চলেছে। সাঈদ বলে ওঠলো– এ মূর্তি হচ্ছে ওদের শেষ অবলম্বন, ওটা ভেঙে ফেল।

নায়ীম এক পূজারীর সিনার উপর তীর মারলেন। তখ্খুনি সে কলজের ওপর হাত চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় তীর গিয়ে লাগলো আর এক পূজারীর ওপর। অমনি সে মূর্তিটা ময়দানে ফেলে পিছু হটলো। এ মূর্তিটাই ছিল তাদের শেষ আশা ভরসাস্থল। এতে সমগ্র দাহির বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়লো বিশৃঙ্খলা। কঠিন আঘাত পেয়েও সাঈদ এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। তিনি রাজা দাহিরের হাতীর উপর হামলা করলেন। কিন্তু রাজার রক্ষী যোদ্ধারা তখন তার চারদিকে জমা হয়ে গেছে। সাঈদ এবার তাদের নাগালের মধ্যে। সাঈদকে দুশমনবেষ্টিত দেখে নায়ীম ক্ষুধার্ত সিংহের মতো হামলা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন দুশমন-বাহিনীকে। সাঈদের সন্ধানে তিনি চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেলেন না। আচানক তাঁর শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াটিকে তিনি এদিক-ওদিক ছুটতে দেখতে পেলেন। নায়ীম এবার নীচে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকালেন। সাঈদ দুশমনদের কতগুলো লাশের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। নায়ীম ঘোড়া থেকে নেমে হাত দিয়ে তার মামার মাথাটা উপরে তুলে 'মামা মামা' বলে ডাকলেন, কিন্তু তাঁর চোখ আর খুললো না। নায়ীম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে আবার ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। রাজা দাহিরের হাতী তখন তার কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু তখনও বিশৃঙ্খল সিপাহীদের এক দল তাকে ঘিরে রয়েছে।

নায়ীম আবার ধনুক হাতে নিয়ে তীর বর্ষণ শুরু করলেন রাজার দিকে লক্ষ্য করে। একটি তীর গিয়ে লাগলো রাজার সিনার ওপর। তিনি রক্তাক্ত দেহে ঢলে পড়লেন এক রানীর কোলের ওপর। রাজার হত্যার খবর মশহুর হয়ে গেলে সিন্ধুর লশকর ময়দানের ভেতরে অগুণতি লাশ ফেলে পালালো। পরাজিত সিপাহীরা কতক ব্রাহ্মণাবাদে, আর কতক গেলো আরারের দিকে।

এ আজীমুশ্শান বিজয়ের পর মুসলমানরা আহতদের শুশ্রূষা ও শহীদদের দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত হলেন। সাঈদের দেহে বিশটিরও বেশি জখমের নিশানা দেখা যাচ্ছিলো। তাঁর পকেট থেকে ভাইয়ের চিঠিটা বের করে কবরের ভেতর ছুঁড়ে দিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসেম হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন– কি ওটা?

নায়ীম বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– একটা চিঠি।

: কিসের চিঠি?

: ভাই আবদুল্লাহ আমার কাছে দিয়েছিলেন ওটা। চিঠিটা আমি ওঁর কাছে পৌঁছে দেবার ওয়াদা করে এসেছিলাম, কিন্তু সে ওয়াদা পূরণ করাটা আল্লাহর মনযুর ছিলো না।

মুহাম্মদ বিন কাসেম বললেন– আমি ওটা দেখতে পারি?

: ওর ভেতর এমন কিছু নেই!

মুহাম্মদ বিন কাসেম নত হয়ে কবর থেকে তুলে নিলেন চিঠিখানা। পড়ে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন নায়ীমের হাতে। বললেন– এটা নিজের কাছে রেখে দাও। শহীদের দৃষ্টি থেকে দুনিয়া আখেরাতের কোনো কিছুই লুকানো থাকে না।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের কাছে নায়ীমের জিন্দেগীর কোনো রহস্যই গোপন ছিলো না। নায়ীমের জন্য আবদুল্লাহর ত্যাগ ও আল্লাহর রাহে নায়ীমের শানদার কুরবানী তাঁর অন্তরে তাদের দু'ভাইয়ের প্রতি আগের চাইতে আরও গভীর মহব্বত পয়দা করে দেয়।

রাতের বেলা ঘুমানোর আগে মুহাম্মদ বিন কাসেম নায়ীমকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে নিয়ে নানারকম কথাবার্তার পর বললেন– এবার আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যাবো মুলতানের দিকে। ওখানে হয় তো আমাদের আরও বেশি সৈন্যবলের প্রয়োজন হবে। তাই আমার ধারণা, তোমাকে আবার বসরায় পাঠাতে হবে। সিপাহী সংগ্রহ করার জন্য তুমি ওখানে গিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াবে। পথে তোমার বাড়ি হয়ে ওদের সবাইকে আশ্বাস দিয়ে যাবে।

: ওদের আশ্বাস দেবার কথা বলতে গেলে আমি ব্যাপারটিকে জেহাদের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না। নতুন সিপাহী ভর্তি সম্পর্কে আজকের লড়াইয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে, সিন্ধুর জন্য আর বেশি ফৌজের প্রয়োজন নেই।

: কিন্তু আমার ইরাদা শুধু সিন্ধু বিজয়েই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দুস্তান এক বিস্তীর্ণ রাজ্য। তোমায় সেখানে যেতেই হবে।

: একজন সিপাহী হিসেবে আপনার হুকুম মেনে চলা আমার ফরয, কিন্তু দোস্ত হিসাবে আমার প্রতি আপনার এ উপকারের প্রয়োজন নেই।

মুহাম্মদ বিন কাসেম প্রশ্ন করলেন– কোন উপকার?

: বসরায় পাঠাবার নাম করে আপনি আমাকে বাড়ি ফিরে যাবার মওকা দিচ্ছেন। আমি এটাকেই উপকার মনে করছি।

মুহাম্মদ বিন কাসেম বললেন– যদি এ উপকারের সাথে আমার অথবা তোমার কর্তব্যের সংঘাত হতো, তাহলে কখ্খনো আমি তোমাকে এজাযত দিতাম না। কিন্তু আপাতত এখানে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, ব্রাহ্মণাবাদ জয় করা আমাদের কাছে বাম হাতের খেলার মতো। এরপর এদিক ওদিক কয়েকটি রাজ্যের মামুলী বিদ্রোহ দমন করে আমরা এগিয়ে যাবো মুলতানের দিকে। ততদিনে তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে আসবে আর তোমার সাথে কমবেশি যেসব সিপাহী আসবে, তারা আমাদের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারবে।

: আচ্ছা, আমায় কবে যেতে হবে?

: যথাসম্ভব শিগ্গিরই। যখন তোমাকে সফরের এজাযত দেয়া হলো, তখন আগামী কালই রওয়ানা হয়ে যাও।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের সাথে আলাপের পর নায়ীম বসে থাকলেন সেখানেই। কিন্তু কল্পনা তখন তাকে নিয়ে গেছে সিন্ধুর সরজমিন থেকে হাজারও মাইল দূরে।

ভোর বেলা দেখা গেলো, নায়ীম বসরার পথে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

* * *

সিন্ধুতে মুসলমানদের বিজয় অভিযান সম্পর্কে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অবহিত করার জন্য মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু থেকে বসরা পর্যন্ত দশ ক্রোশ দূরে দূরে সিপাহীদের চৌকি বসিয়েছেন। ডাক পাঠাবার জন্য প্রত্যেক চৌকিতে রাখা হয়েছে কতগুলো দ্রুতগামী ঘোড়া।

ভোর বেলায় নায়ীম সিন্ধু থেকে বসরার পথে রওয়ানা হলেন। প্রতি চৌকিতে ঘোড়া বদল করে তিনি দিনের সফরের পথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন ঘণ্টায়। রাতের বেলা তিনি বিশ্রাম করলেন এক চৌকিতে। ক্লান্তির দরুন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অল্প সময়ের মধ্যে। মধ্যরাতের দিকে সিন্ধুর দিক থেকে আগত এক সওয়ারের লেবাস দেখে তাকে এক মুসলমান সিপাহী বলেই মনে হলো। চৌকিতে পৌঁছেই সে ঘোড়া থেকে নেমে বলতে লাগলো– আমি এক অতি জরুরি খবর নিয়ে বসরায় যাচ্ছি। আমার জন্য জলদি আরও একটি ঘোড়া তৈরি করে দাও।

সিন্ধুর যে কোন ব্যাপার সম্পর্কে নায়ীমের মনে আগ্রহ ছিলো। তিনি উঠে মশালের আলোয় দেখে নিলেন আগন্তুক লোকটিকে। লোকটি গন্দমী রঙের সুগঠিত দেহ জোয়ান।

: তুমি মুহাম্মদ বিন কাসেমের পয়গাম নিয়ে যাচ্ছো?

: জি হ্যাঁ!

: কি পয়গাম?

: কাউকে তা বলার এজাযত তো নেই।

: আমায় চেনো তুমি?

: জি হ্যাঁ, আপনি আমাদের ফৌজের এক সালার। কিন্তু মাফ করবেন, যদিও আপনাকে বলায় কোন ক্ষতি নেই, তবুও সিপাহসালারের হুকুম এ পয়গাম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাড়া আর কাউকে দেয়া যাবে না।

নায়ীম বললেন– আমি তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার তারিফ করছি।

ইতোমধ্যে আর একটি ঘোড়া তৈরি হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে আগন্তুক সেটির ওপর সওয়ার হয়ে এক নিমেষে মিলিয়ে গেলো রাতের অন্ধকারে।

কয়েকদিন পর নায়ীম তার সফরে তিন চতুর্থাংশ শেষ করে এক মনোমুগ্ধকর উপত্যকা-ভূমির ভেতর দিয়ে পথ চলছেন। পথিমধ্যে আবার সেই সওয়ার তার নজরে পড়লো। নায়ীম ভালো করে দেখে চিনতে পারলেন তাকে। লোকটি নায়ীমের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে বললো– আপনি এসেছেন খুব দ্রুত গতিতে। আমার ধারণা ছিলো, আপনি অনেকখানি পেছনেই পড়ে থাকবেন।

: হ্যাঁ, আমি পথিমধ্যে তেমন আরাম করিনি।

: আপনিও কি তবে বসরায় যাচ্ছেন?

: হ্যাঁ, সেদিন যদি তুমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে, তাহলে সারাটা পথ আমরা একত্রে সফর করতে পারতাম।

: আমার ধারণা ছিলো, আপনি কিছুটা আরামে সফর করবেন। ... চলুন, ঘোড়া আগে বাড়ান।

: আমার মনে হয়, এসব রাস্তা তুমি বেশ ভালো করে চেনো!

: জি হ্যাঁ, এ দেশে আমি বহুদিন কাটিয়েছি।

: চলো, তাহলে তুমিই আগে চলো।

আগন্তুক ঘোড়া আগে বাড়িয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো। নায়ীম চললো তার পিছু পিছু। খানিকক্ষণ পর নায়ীম প্রশ্ন করলেন– পরের চৌকি দেখা যাচ্ছে না কেন? আমরা পথ ভুলে আসিনি তো?

নায়ীমের সাথী ঘোড়া থামিয়ে পেরেশানীর ভাব করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। অবশেষে সে বললো– আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আপনার কোন চিন্তা নেই। এ উপত্যকা পার হয়ে গেলেই আমরা ঠিক পথ খুঁজে পাবো। বলেই সে আবার ঘোড়া ছুটালো। আরও কয়েক ক্রোশ চলার পর আগন্তুক ঘোড়া থামিয়ে বললো– সম্ভবত আমরা সঠিক পথ থেকে বহু দূরে একদিকে সরে এসেছি। আমার মনে হয়, এ পথ শিরাজের দিকে গেছে। আমাদের এবার বাম দিকে মোড় ঘুরতে হবে, কিন্তু ঘোড়া বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখানে খানিকক্ষণ আরাম করলেই ভাল হবে। সবুজ শ্যামল গাছ-পাছড়াভরা এলাকাটি এমন নয়নমুগ্ধকর যে, ক্লান্ত দেহ নিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য আগন্তুকের কথায় নায়ীম সায় দিলেন। ঘোড়া দুটোকে এক ঝর্নার পানি পান করিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রেখে তারা বসে পড়লেন সবুজ ঘাসের বিছানার ওপর।

আগন্তুক তার থলে খুলতে খুলতে বললো– আপনার তো ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? আমি পেছনের চৌকিতে পেটপুরে খেয়ে নিয়েছি। সামান্য কিছুটা খানা হয় তো আপনার জন্যই বেঁচে গিয়েছিলো।

আগন্তুকের অনুরোধে নায়ীম রুটি আর পনিরের কয়েক টুকরো খেয়ে নিলেন। তারপর ঝর্নার পানি পান করে ঘোড়ায় সওয়ার হতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মস্তিষ্কে তীব্র ঘূর্ণন অনুভব করে শুয়ে পড়লেন ঘাসের ওপর।

তিনি আগন্তুককে লক্ষ্য করে বললেন– আমার মাথা ঘুরছে।

আগন্তুক বললো– আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ আরাম করে নিন।

: না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখ্খুনি চলতে হবে। বলে নায়ীম ওঠলেন, কিন্তু কম্পিত পদে খানিকটা চলেই আবার বসে পড়লেন জমিনের ওপর।

আগন্তুক তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর অট্টহাসি করে ওঠলো। নায়ীমের মনে তখ্খুনি সন্দেহ হলো, লোকটা খাবারের মধ্যে কোন একটা মাদক দ্রব্য দিয়েছে তাঁকে। অমনি তার মনে অনুভূতি জাগলো, তিনি এক ভয়ানক মসিবতে গ্রেফতার হতে চলেছেন। তিনি আর একবার ওঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। তার মস্তিষ্কে ছেয়ে এসেছে গভীর

নিদ্রার মাদকতা। অর্ধ-অচেতন অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন, কয়েকটি লোক তার হাত-পা বাঁধছে। তাদের লৌহকঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি হাত-পা মারতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হলো। তখন তিনি প্রায় বেহুঁশ। তিনি সামান্যমাত্র অনুভব করেছিলেন, কয়েকটি লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও।

পরদিন যখন নায়ীমের হুঁশ হলো, তখন তিনি এক সংকীর্ণ কুঠরীতে বন্দী। যে অচেনা লোকটি তাকে প্রতারণা করে সেখানে এনেছে, সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নায়ীম তার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন– আমায় এখানে আনার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি কার কয়েদখানায় বন্দী?

: সময় এলেই এসব প্রশ্নের জবাব পাবে। অচেনা লোকটি বাইরে গিয়ে কুঠরীর দরজা বন্ধ করে দিলো।

কয়েদখানায় নায়ীমের তিন মাস কেটে গেলো। তার অন্তরের হতাশা যেন কয়েদখানার ভয়ানক অন্ধকার আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আল্লাহ্ তার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এটাই তার সান্ত্বনা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি এসে কয়েদখানার দেয়ালে একটি ছোট্ট ছিদ্রপথ দিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

নায়ীম কয়েকবার প্রশ্ন করেছেন– আমায় কয়েদ করেছে কে? কি কারণে আমাকে কয়েদ করা হলো?

কিন্তু কোন প্রশ্নেরই জবাব মেলে না। তিন মাস এমনি করে কেটে যাবার পর একদিন ভোরে নায়ীম যখন আল্লাহর দরবারে সিজদা করে দোয়া করছেন, তখনই কুঠরির দরজা খুলে সেই অচেনা লোকটি কয়েকজন সাথী নিয়ে এসে হাজির হলো। সে নায়ীমকে বললো– আমাদের সাথে এসো।

নায়ীম প্রশ্ন করলো– কোথায়?

জবাবে সে বললো– একজন তোমায় দেখতে চাচ্ছে।

নায়ীম খোলা তরবারির পাহারায় চললেন তাদের সাথে সাথে।

কেল্লার এক সুদৃশ্য কামরায় ইরানী গালিচার উপর কয়েকটি নওজোয়ানের মাঝখানে এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট। নায়ীম তাকে দেখেই চিনলেন। লোকটি ইবনে সাদেক।

৭

ইবনে সাদেকের অতীত জিন্দেগী ক্রমাগত ব্যর্থতার এক দীর্ঘ কাহিনী। সে জন্ম নিয়েছিলো জেরুজালেমের এক সচ্ছল ইহুদী পরিবারে। বুদ্ধিবৃত্তির বলে ষোল বছর বয়সে তার অসাধারণ দখল জন্মে আরবি, ফারসি, ইউনানী ও ল্যাতিন ভাষায়। তার বয়স যখন আঠারো তখন সে প্রেমে পড়ে মারইয়াম নামে এক ঈসায়ী মেয়ের। মেয়েকে তার সাথে শাদী দিতে মারইয়ামের বাবা-মাকে রাজি করতে গিয়ে সে হয়ে গেলো ঈসায়ী। কিন্তু মারইয়াম কিছুদিন তার মন ভুলিয়ে প্রেমে পড়লো তারই চাচাতো ভাই ইলিয়াসের। তারপর থেকেই সে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো ইবনে সাদেককে। বহু চেষ্টা করে ইবনে সাদেক মারইয়ামের বাবা-মাকে শাদীর জন্য রাজি করালো। কিন্তু মারইয়াম একদিন মওকা পেয়ে তার প্রেমিককে নিয়ে ফেরার হয়ে চলে গেলো দামেশকের পথে। দামেশকে গিয়ে তাদের শাদী হয়ে গেলো। মারইয়ামের প্রেমে ও স্বভাবে মুগ্ধ ইলিয়াসও ঈসায়ী ধর্মমত এখতিয়ার করলো।

ইলিয়াস ছিলো এক দক্ষ রাজমিস্ত্রী। দামেশকে তার প্রচুর আয়-রোজগারের পথ খুলে গেলো। সেখানে বাড়ি তৈরি করে তারা তাদের জিন্দেগী কাটাতে লাগলো। এক বছর পর তাদের ঘরে এক শিশু-কন্যা জন্ম নেয়। তার নাম রাখা হলো জুলাইখা।

কঠিন সন্ধানের পর ইবনে সাদেক তাদের খোঁজ পেলো। সেও এসে হাজির হলো দামেশকে। সেখানে তার প্রেমাস্পদ ও চাচাতো ভাইকে আয়েশ-আরামে জিন্দেগী কাটাতে দেখে তার মনে প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। কয়েকদিন সে ঘুরে বেড়ালো দামেশকের অলিগলিতে। তারপর ইসলাম কবুল করে সে গিয়ে হাজির হলো দরবারে খেলাফতে। খলিফার কাছে মারইয়ামকে দাবি করে সে আবেদন জানালো, যেন তাকে ইলিয়াসের ঘর থেকে ছিনিয়ে

এনে তার হাতে সঁপে দেয়া হয়। দরবারে খেলাফত থেকে হুকুম হলো, ইহুদী ও ঈসায়ীরা মুসলমানদের আমানত। তাছাড়া মারইয়াম তার নিজের মর্জিমতো শাদী করেছে। তাই তাকে বাধ্য করা যাবে না। হতাশ ইবনে সাদেক এরপর না রইলো ইহুদী, না ঈসায়ী আর না মুসলমান। চারদিকের হতাশা তার অন্তরে ধূমায়িত করে তুললো প্রতিহিংসার অগ্নিজ্বালা।

দামেশকে কিছুদিন ঘুরে ফিরে কাটিয়ে সে চলে গেলো কুফায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সে তার অতীত কাহিনী শুনিয়ে তার কছে সাহায্যের আবেদন পেশ করলো। হাজ্জাজ চুপ করে শুনলেন তার কাহিনী। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ইবনে সাদেক সেই সুযোগে তার তারিফ আর দরবারে খেলাফতের নিন্দা করে কয়েকটি কথা বলে ফেললো।

সে বললো– আপনি আমার অন্তরের কথা শুনতে চাইলে আমি বলবো, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়ে আপনি হচ্ছেন খেলাফতের মসনদের সবচাইতে বড় হকদার। ইবনে সাদেক তার কথা শেষ করার আগেই হাজ্জাজ এক সিপাহীকে আওয়াজ দিয়ে ইবনে সাদেককে ধাক্কা মেরে শহরের বাইরে বের করে দেবার হুকুম জারি করলেন। তারপর ইবনে সাদেককে লক্ষ্য করে বললেন– তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু মেহমান হয়ে তুমি এখানে এসেছো বলেই তোমাকে আমি মাফ করে দিচ্ছি।

ইবনে সাদেক সন্ধ্যাবেলায় শহর থেকে বের হলো। রাতটা এক পাদরীর ঝুপড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলা এক ভয়ানক চক্রান্ত মাথায় নিয়ে সে জেরুজালেমের পথ ধরলো। জেরুজালেমেও বেশি দিন থাকতে পারলো না। তার চাচাতো ভাই ও তার প্রেমিকাই নয়, গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দেশ-দেশান্তরে। শেষ পর্যন্ত সে গড়ে তুললো দুর্বত্তদের এক ভয়ানক জামাত এবং এক কঠিন ষড়যন্ত্রের সংকল্প নিয়ে তাদের ছড়িয়ে দিলো তামাম দেশে। সে হলো সেই ছোটখাটো জামাতের আত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা। একদিন সে তার চাচাতো ভাইয়ের ওপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার মওকা পেয়ে গেলো। তার একমাত্র কন্যা জুলাইখাকে সে চুরি করে নিয়ে গেলো। জুলাইখার বয়স তখন আট বছর। ইবনে সাদেক তাকে নিয়ে পালালো ইরানের দিকে। মাদায়েনে তার জামাতের ইসহাক নামে এক লোকের হাতে তাকে সোপর্দ করে সে আবার লেগে গেলো তার ধ্বংসাত্মক সংকল্প বাস্তবায়নের কাজে। দু'মাস পরে তার দলের গোপন কর্মীরা হত্যা করলো ইলিয়াস ও মারইয়ামকে। এ নৃশংস হত্যার পরও সে নিরস্ত হলো না। ইবনে সাদেকের বাকি জিন্দেগী তামাম দুনিয়ার জন্য ভয়াবহ

হয়ে ওঠে। আলমে ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্য হাসিলের কারণে সে হুকুমতের বিরুদ্ধে কঠোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। খারেজি ও ইসলামের দুশমনদের ভেতর থেকে কতক লোক তাকে পূর্ণ সমর্থন করলো। কিন্তু তখনও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্থিক অসুবিধা। হঠাৎ তার মাথায় এলো এক নতুন ধারণা। সে কয়েক মাসের সফর কয়েক সপ্তাহে শেষ করে গিয়ে হাজির হলো রোমের সিজারের দরবারে।

সিজার যদিও পূর্বদিকে তার হারানো আধিপত্য নতুন করে হাসিল করার ইচ্ছা করতেন, কিন্তু তার অন্তর থেকে পূর্বপুরুষদের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি তখনও মুছে যায়নি। তিনি খোলাখুলি ইবনে সাদেকের সাথে যোগ দিতে সাহস করলেন না, কিন্তু মুসলমানদের এ নিশ্চিত দুশমনকে উৎসাহিত করাও তিনি জরুরি মনে করলেন। ইবনে সাদেককে তিনি বললেন– আমি তোমাদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করবো, কিন্তু যতদিন মুসলমানরা এক হয়ে থাকবে, ততদিন তাদের ওপর হামলা করা আমরা অবিবেচনার কাজ বলে মনে করি। তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের কাজের দিকে আমার নজর থাকবে।

ইবনে সাদেক সেখান থেকে ফিরে এলো বহু দামী সোনা, চাঁদি ও জাওয়াহেরাত তোহফা নিয়ে। বসরার এক অজ্ঞাত এলাকায় ঘাঁটি করে সে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করলো। হাজ্জাজের ভয়ে সে কয়েক বছর তার ধারণা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সাহসও করলো না। সে তার কার্যকলাপ তার নজর থেকে লুকিয়ে রেখে পুরোপুরি হুশিয়ার হয়ে চলতে লাগলো। কয়েক বছরের প্রাণপণ চেষ্টা ও মেহনতের ফলে এক হাজার লোক এসে তার দলে ভিড়লো। তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই সে খরিদ করে সোনা চাঁদির বিনিময়ে। সিজারকে সে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রেখে প্রয়োজনমতো তার কাছ থেকে সাহায্য পেতে লাগলো। যখন সে বুঝলো, তার জামাত বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে এবং কুফা ও বসরার বেশির ভাগ লোক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, তখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর শেষ আঘাত হানতে তৈরি হলো। একদিন তার গুপ্তচর এসে তাকে খবর দিলো, সেদিন হাজ্জাজ কুফায় চলে গেছেন এবং ইবনে আমের ফৌজ সংগ্রহের জন্য এক বক্তৃতা করবেন। সে আরও জানলো, বসরার বেশির ভাগ লোক ফৌজে ভর্তি হতে নারাজ। ইবনে সাদেক এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইলো এবং প্রথমবার সে তার আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে বসরার লোকদের আম জলসায় শরীক হবার সাহস করলো। তার মনে আস্থা ছিলো,

বসরার অসন্তোষ-প্রবণ লোকদের সে তার কথার যাদুতে প্রভাবিত করতে পারবে, কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। নায়ীম আচানক বেরিয়ে এসে তার সাজানো কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন।

ইবনে সাদেক বসরা থেকে পালিয়ে বাঁচলো এবং রামলায় খলিফার ভাই সুলাইমানের কাছে আশ্রয় নিলো। এক হাজারের জামাত থেকে মাত্র কয়েকটি লোক তার সাথে গেলো।

সুলাইমানকে যুবরাজের পদ থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন খলিফার সমর্থক। তাই হাজ্জাজ ও তার সাথীদের সুলাইমান নিকৃষ্টতম দুশমন মনে করতেন। হাজ্জাজের দুশমনদের তিনি গ্রহণ করতেন দোস্ত বলে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইবনে সাদেকের চক্রান্তের খবর পেয়েই তার পেছনে একদল সিপাহী লাগিয়ে রেখেছিলেন। রামলায় সুলাইমান তাকে আশ্রয় দিয়েছেন জেনেই তিনি সব অবস্থা খলিফাকে জানালেন। দরবারে খেলাফত থেকে সুলাইমানের কাছে হুকুম এলো, তখ্খুনি সাথীদেরসহ ইবনে সাদেককে শিকল পরিয়ে পাঠাতে হবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে। সুলাইমান ইবনে সাদেককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার জান বাঁচাতে চান, তাই তিনি ইবনে সাদেককে ইসফাহানের দিকে সরিয়ে দিয়ে খলিফার দরবারে লিখে পাঠালেন, ইবনে সাদেক রামলা থেকে পালিয়ে গেছে। কয়েকদিন ইসফাহানে ঘুরে ফিরে ইবনে সাদেক শিরাজের পথ ধরলো। শিরাজ থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে পাহাড়ের মাঝখানে পুরনো কালের এক বিরান কেল্লা। ইবনে সাদেক সে কেল্লায় গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তার সকল বিপদের দায়িত্ব নায়ীমের উপর চাপিয়ে সে তাকে এক অপমানকর শাস্তি দেবার কৌশল চিন্তা করতে লাগলো।

* * *

নায়ীম ইবনে সাদেকের সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এক সিপাহী তাকে আচানক ধাক্কা মেরে উপুড় করে ফেলে দিয়ে বললো– বেওকুফ! এটা বসরার মসজিদ নয়। এ মুহূর্তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমাদের আমীরের দরবারে। এখানে অপরাধীর মাথা কেটে ফেলা হয়।

ইবনে সাদেক ক্রোধ প্রকাশ করে বললো– ভারী বেওকুফ তুমি! বাহাদুর লোকের অন্য বাহাদুরের সাথে এমন ব্যবহার করা অনুচিত।

এ কথা বলে ইবনে সাদেক আসন ছেড়ে ওঠে নায়ীমকে নিজের বাহুর সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিলো। তখন মেঝের ওপর পড়ে নায়ীমের নাক বেয়ে রক্ত ঝরছে। ইবনে সাদেক নিজের রুমাল বের করে তাঁর মুখ মুছে দেয়।

তারপর তার দিকে বিদ্রূপভরা হাসিমুখে তাকিয়ে বললো– আমি শুনেছি, আপনি নাকি নেহায়েত বেকারার পেরেশান হয়ে আপনার মেজবানের নাম জানতে চেয়েছেন। আফসোস! আপনাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমারও ইচ্ছা ছিলো, খুব জলদি আপনার খেদমতে হাজির হয়ে জিয়ারত করি, কিন্তু ফুরসত পাইনি। আজ আপনাকে দেখে আমার মনে কি আনন্দ হয়েছে, তা আমিই জানি। আমি আশা করি, আপনিও পুরনো দোস্তের সাথে মিলিত হয়ে অনেক খুশি হয়ে থাকবেন। বলুন, আপনার মন-মেযাজ কেমন যাচ্ছে? আপনার মুখের রঙ কেমন ফেকাসে হয়ে গেছে। আমার ধারণা, এ কুঠুরীর সংকীর্ণতা ও অন্ধকারে আপনার মতো মুজাহিদের মন-মেযাজ খুবই পেরেশান হয়ে ওঠেছে, কিন্তু আপনি হয় তো জানেন না, এ ছোটখাটো কেল্লায় কোনো বড় কুঠরী নেই। তাই আমার লোকেরা বাধ্য হয়েই আপনাকে ওখানে রেখেছে। আজ আমি আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য এ কারণেই বাইরে আনিয়েছি, যাতে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য করার ক্ষমতা আপনি হারিয়ে না ফেলেন। কিন্তু আপনি আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছেন যেনো আমি আপনার অজানা লোক। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো বসরায়। যদিও আমাদের পয়লা মোলাকাত নেহায়েত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যে হয়েছে, তবু সেদিন থেকে আমাদের সম্পর্ক এমন নয়, আমরা এত শিগগিরই তা ভুলে যেতে পারি। বড় মুশকিলের ভেতর দিয়ে আমি আপনার সে বক্তৃতার তারিফ জানাবার এ মওকা পেয়েছি এবং আপনার মতো আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী মুজাহিদকে আবদুল্লাহ বিন উবাইর উত্তরাধিকারীর সামনে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে বহুত রহম জাগছে। বলুন, আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা যাবে?

ইবনে সাদেকের প্রতিটি কথা নায়ীমের অন্তরের ওপর তীর ও ছুরির ফলার মতো বিঁধছে। তিনি ঠোঁট কামড়ে বললেন– কয়েদ হবার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার মতো কাপুরুষ কমিনের হাতে কয়েদ হয়েছি বলেই আমার যা দুঃখ। এখন তোমার মন যা চায় তাই করো। কিন্তু মনে রেখো, আমার জীবন ও মরণ দুটোই তোমার জন্য বিপজ্জনক। এ মুহূর্তে আমার হাত শিকলে বাঁধা, কিন্তু মনে রেখো, বন্দিদশা মুজাহিদকে কখ্খনো সাহসশূন্য

কাপুরুষ বানাতে পারে না।

ইবনে সাদেক নায়ীমের শক্ত কথাগুলো শুনে বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করে বললো– তুমি যেমন বাহাদুর, তেমনি বেওকুফও। তুমি জানো না, এ মুহূর্তে তোমার মাথা রয়েছে এক আজদাহার মুখের মধ্যে। তোমায় গ্রাস করা অথবা ছেড়ে দেয়া তারই মর্জির ওপর নির্ভর করছে। আমার কয়েদখানা থেকে আযাদ হবার ধারণা দূর করে দাও মন থেকে। এ কেল্লায় দু'শ সিপাহী প্রতি মুহূর্তে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে মওজুদ রয়েছে তোমার খোঁজ-খবর রাখার জন্য।

এ কথা বলে ইবনে সাদেক হাততালি দিলো– অমনি কেল্লার বিভিন্ন কোণ থেকে কতক সিপাহী মুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়ে এলো। নায়ীমের দৃষ্টিতে তাদের প্রত্যেকেরই মুখ ইবনে সাদেকের মতো নির্মম-নিষ্ঠুর।

ইবনে সাদেক বললো– তুমি মনে কর, দুনিয়ার সবচাইতে বড় শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রমাণ করে দিতে চাই, দুনিয়ায় আরো বহু শাস্তি রয়েছে যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। এমন শাস্তি আমি তোমাকে দিতে পারি, যা বরদাশত করার মতো হিম্মত তোমার হবে না। তোমার জিন্দেগী আমি এমন তিক্ত করে তুলতে পারি, যাতে তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর চেয়েও অন্ধকার হয়ে দেখো দেবে; কিন্তু আমি তোমার দুশমন নই। তুমি জীবিত থাক, এই আমি চাই। আমি তোমাকে এমন এক জিন্দেগীর পথ বলে দিতে পারি, যা তোমার পরলোকের কল্পনার চাইতেও সুন্দর। তুমি যুদ্ধের বিপদ মসিবত বরদাশত করে যাও। কেননা জিন্দেগীর আয়েশ-আরাম তোমার জানা নেই। জীবন উপভোগের স্বাদ পাওনি বলেই তুমি এমন আপন-ভোলা। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় তোমাকে কয়েক বছরের জিন্দেগী দিয়েছেন এখানকার অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করার জন্য। তার কদর কীমত তোমার জানা নেই। তুমি বাহাদুর সত্যি, কিন্তু তোমার বাহাদুরী তোমায় কি শিখিয়েছে? তোমাকে এমন সব লক্ষ্য-পথে জান দিতে শিখিয়েছে, যার সাথে তোমার ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার ধারণা, তুমি আল্লাহ তায়ালার রাহে কুরবান হয়ে যাচ্ছো, কিন্তু তোমার এ কুরবানীতে আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কুরবানী থেকে যদি কারোর কোনো ফায়দা হাসিল হয় তবে তা হয়ে থাকে খলিফা ও হাজ্জাজের; যারা ঘরে বসে বসে বিজয়ের খ্যাতি হাসিল করে। তোমরা আত্মপ্রতারণা করে চলেছো। তোমার যৌবনদীপ্ত চেহারা ও রূপ দেখে মনে হয় খাক ও খুনের মধ্যে লুটিয়ে পড়ার জন্য ও দেহ তৈরি হয়নি। তোমায় দেখলে মনে হয় এক শাহজাদা। তুমি রক্তপিপাসু নেকড়ের জীবন যাপন করবে, এ তো হতে পারে না।

শাহজাদার মতো জিন্দেগীই তোমায় মানায়। তুমি হবে এক সুন্দরী শাহজাদীর চোখের আলো, মনের শান্তি। তোমার জিন্দেগীকে তুমি করে তুলতে পার এক রঙিন স্বপ্নের মতো সুন্দর মোহময়। তুমি ইচ্ছা করলে কঠিন মাটি, রুক্ষ পাথর আর পাহাড়ের শয্যার পরিবর্তে পেতে পার ফুল শেজ। দুনিয়ার অসংখ্য আয়েশ-আরাম দৌলতের বিনিময়ে খরিদ করা যায়। ইচ্ছা করলে দুনিয়ার ধনভাণ্ডার তুমি আপনার করে নিতে পার, দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দরী নারীকে করে নিতে পার তোমার শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু সে পথ তোমার কাছে অজানা। সুন্দরী নারীর কেশের খুশবুতে মাতাল হয়ে বেঁচে থাকতে তুমি শেখোনি। দুনিয়ার আড়ম্বর দেখনি বলেই তুমি আত্মভোলা হয়ে খুশি হচ্ছো।

নওজোয়ান! তোমার জন্য আমি বহু কিছু করতে পারি। আহা! তুমি যদি আমার সহকর্মী হতে! আমরা বনু উমাইয়ার হুকুমত খতম করে এক নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করবো। আমার এ একীন– দৃঢ়প্রত্যয় রয়েছে, খলিফা ও হাজ্জাজের ক্ষমতা গর্বিত মস্তক ভূতলশায়ী করার চেষ্টায় আমি কামিয়াব হবো। তোমার হয় তো মনে পড়ে, আমি সেই ইবনে সাদেক, বসরার আম জলসায় তুমি যার মোকাবেলা করেছিলে, কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চিত বলে দিচ্ছি, যতো দুর্বল তুমি আমাকে ভেবেছো, আমি তা নই। এটুকু জেনে রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে– আমার পেছনে রোমের সিজারের মতো লোকও রয়েছেন। আরব আজমে এক বিরাট ইনকিলাব-বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য আমি শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করছি। আমি বহুদিন ধরে তোমার মতো কথার যাদুকরের সন্ধান করে ফিরেছি। তোমাকে আমি সেই কর্মের ময়দানে দেখতে চাই। সেখানে তুমি আল্লাহ তায়ালার দেয়া শৌর্য-বীর্য পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে পারবে। তোমার মতো নওজোয়ান মামুলি সিপাহী হিসাবে খুশি হয়ে না থেকে হবে খেলাফতের দাবিদার।

নায়ীমকে নির্বাক হয়ে থাকতে দেখে ইবনে সাদেক ভাবলো, তিনি তার প্রতারণা-জালের মধ্যে এসে গেছেন। তাই গলার আওয়াজটা খানিকটা নরম করে সে বললো– আমার সাথে যদি তুমি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি তোমার শিকল এখনই খুলিয়ে দিচ্ছি। বলো, তোমার ইরাদা সংকল্প কি? তোমার সামনে জিন্দেগীর পথ দুটো। বলো, তুমি জিন্দেগীর নেয়ামত পূর্ণরূপে ভোগ করতে চাও, না এ অন্ধকার কুঠরীতে তোমার জিন্দেগীর বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাও?

নায়ীম গর্দান ওপরে তুললো। তাঁর মুখে তখন অন্তরের অপরিসীম যাতনার অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। তিনি জোশের সাথে জবাব দিলেন–

তোমার কথা আমার কাছে আহত কুত্তার চিৎকারের চাইতে বেশি কোনো অর্থ রাখে না। তুমি জানো না, আমি যার গোলাম, তিনি জমিনের অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে আসমানের সেতারার মালিক হয়েও তিন দিন পেটে পাথর বেঁধে রয়েছেন। তুমি আমাকে দৌলতের মোহে প্রলুব্ধ করতে চাও? দুনিয়ার তামাম আরামেরই নাম জিন্দেগী। কিন্তু তলোয়ারের ছায়ায় আযাদীর শ্বাস গ্রহণ করে যে আয়েশ-আরাম পাওয়া যায় তা তোমার মতো নীচ মানুষের কল্পনারও বহু উর্ধ্বে। আমাকে তুমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তা থেকে সরিয়ে নিজস্ব জঘন্য উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে সহকর্মী বানাতে চাও! তুমি জেহাদের বিরোধিতা কর, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রক্তের নদী বইয়ে দিতে তোমার দ্বিধা নেই। যে সিজারের শক্তির ওপর তোমার ভরসা, তার পূর্বপুরুষ কতবার আমাদের তলোয়ারের শক্তি পরীক্ষা করে দেখেছে! এ মুহূর্তে আমি নিঃসন্দেহে তোমার হাতে রয়েছি; কিন্তু কয়েদ অথবা মৃত্যুর ভয় কখনও অচেতন বিবেকহীন করতে পারবে না আমাকে। মুজাহিদদের যোগ্য নয়, এমন কোনো কাজের প্রত্যাশা তুমি আমার কাছে করো না।

ইবনে সাদেক কিছুটা দমে গিয়ে বললো– কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি এমন সব কাজ করতে রাজি হবে, যা দেখে শয়তানও শরম পাবে।

এ কথা বলে সে তার চারপাশে বসা লোকদের দিকে তাকালো এবং ইসহাক নাম ধরে এক ব্যক্তিকে ডাকলো। যে সুগঠিত দেহ জোয়ান তাকে প্রতারণা করে গ্রেফতার করেছে– আওয়াজ শুনে সে লোকটিই এগিয়ে এলো সামনে। নায়ীম প্রথমবার জানলেন, লোকটির নাম ইসহাক।

ইবনে সাদেক বললেন– ইসহাক! এর মাথাটা ঠিক করে দাও!

ইবনে সাদেকের হুকুমে নায়ীমকে আঙিনায় এক খুঁটির সাথে বাঁধা হলো। লোকটি এগিয়ে গিয়ে নায়ীমের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেললো। তারপর নায়ীমের উদোম শরীরে সে এক রক্তপিপাসু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কোড়া বর্ষণ করতে লাগলো। নায়ীম কোনো আওয়াজ না করে মজবুত পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে কোড়ার আঘাত সয়ে যেতে লাগলেন। সামনের কামরা থেকে চুপি চুপি কদম ফেলে এক বালিকা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো ইবনে সাদেকের কাছে। সে কখনও পেরেশান বেকারার হয়ে তাকাচ্ছে নায়ীমের দিকে, আবার কখনও অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ইবনে সাদেকের দিকে। তার নাজুক নরম অন্তর আর বরদাশত করতে পারছে না এ নিষ্ঠুর

খেলা। অশ্রুভরা চোখে সে ইবনে সাদেকের দিকে তাকিয়ে বললো– চাচা, লোকটি বেহুশ হয়ে যাচ্ছে!

: হতে দাও! ও যে সাইফুল্লাহ! আমি ওর তেজ খতম করে তবে ছাড়বো।

: চাচা!

ইবনে সাদেক বিরক্ত হয়ে বললো– চুপ করো জুলাইখা! এখানে কি চাও? যাও!

জুলাইখা মাথা নীচু করে ফিরে গেলো। দু'একবার সে ফিরে তাকালো নায়ীমের দিকে। মুখভঙ্গিতে নিজের অক্ষমতা অসহায়তা প্রকাশ করে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো এক কামরার মধ্যে। আঘাতের তীব্রতায় বেহুশ হয়ে নায়ীমের গর্দান যখন ঢিলা হয়ে পড়লো, তখন তাকে আবার ফেলে রাখা হলো কয়েদখানায়।

নায়ীমকে কয়েকবার বাইরে নিয়ে কোড়া মারা হলো। তাতেও যখন তার মনোভাবের পরিবর্তন দেখা গেলো না, তখন ইবনে সাদেক হুকুম দিলো, কয়েকদিন তাকে ভূখা রাখতে হবে। নানারকম শারীরিক কষ্ট সহ্য করার পর নায়ীমের ভেতরে সৃষ্টি হলো এক অসাধারণ সহসশক্তি। তিনি ক্ষুধ-পিপাসায় যখন রাতের বেলায় ঘুমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, তখন কে যেন কুঠুরীর ছিদ্র পথ দিয়ে আওয়াজ দিয়ে ভেতরে ফেলে দিলো কয়েকটি সেব ও আঙুর ফল।

নায়ীম হয়রান হয়ে ওঠে ছিদ্র পথ দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন। রাতের অন্ধকারে দেখা গেল কে যেন কয়েক কদম দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার লেবাস ও চলার ধরন দেখে তিনি আন্দাজ করলেন, কোনো নারী রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে। দরদী মেয়েটিকে চিনে নিতে তার কষ্ট হলো না মোটেই। কোড়ার ঘা খেতে গিয়ে কতবার তিনি দেখেছেন এক যুবতীকে তার জন্য অস্থির বেকারার হতে। তার নিস্পাপ সুন্দর মুখের ওপর জুলুম ও অসহায়তার চিহ্ন অংকিত হয়ে গেছে নায়ীমের হৃদয় ফলকে। কিন্তু কি তার পরিচয়? এ ভয়ানক জায়গায় কি করে সে এলো? নায়ীম এ সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটি সেব তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন।

নায়ীমের জন্য এতটা বেদনাবোধ যে মেয়েটির, তার নাম জুলাইখা। জীবনের ষোলোটি বছর অন্তহীন মসিবতের ভেতর দিয়ে কাটিয়েও সে ছিলো দৈহিক সৌন্দর্যের এক পরিপূর্ণ প্রতীক। প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্তহীন বিদ্বেষ পোষণ করতো জুলাইখা। ইবনে সাদেকের সাহচর্যে সে কাটিয়েছে তার জিন্দেগীর তিক্ত মুহূর্তগুলো এবং হামেশা মানবতার নিকৃষ্ট রূপই রয়েছে তার চোখের

সামনে। তাই প্রত্যেক মানুষই তার দৃষ্টিতে ছিলো ইবনে সাদেকের মতো ধূর্ত, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, কমিনা, কমজাত। শিকল-বাঁধা নায়ীমকে কেল্লায় আনতে দেখে প্রথমে তার মনে হয়েছে, একটি স্বার্থপর মানুষ একদল স্বার্থপর মানুষের কব্জায় এসে গেছে। কিন্তু নায়ীমকে ইবনে সাদেকের সাথী হতে অস্বীকার করতে দেখে তার পুরোনো খেয়াল বদলে গেছে। তার মনে হচ্ছে, যে দুনিয়ায় সে কাটিয়ে দিয়েছে তার জিন্দেগীর বৈচিত্র্যহীন দিন আর ভয়ানক রাতগুলো, সে দুনিয়ার বাসিন্দা নয় এ নওজোয়ান। তার ঈমান আর তেজ দেখে সে হয়রান হয়ে গেছে। গোড়ার দিকে সে তাকে মনে করতো মজলুম– কৃপার পাত্র। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তার কাছে হয়ে ওঠেছেন অন্তহীন শ্রদ্ধার দাবীদার।

বাবা-মায়ের মর্মান্তিক পরিণতির খবর জুলাইখা জানতো না। তাদের সাথে মিলিত হবার কামনা জানিয়ে সে হতাশ হয়ে গেছে। তার কাছে দুনিয়া এক অবাস্তব স্বপ্ন আর পরকাল এক নিছক কল্পনা।

ইবনে সাদেকের নির্মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তুফান বারংবার তার আহত অন্তর তোলপাড় করে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দরিয়ার বুকে ভাসমান মনজিলহারা মাল্লার মতো ঢেউয়ের আঘাতে মুহ্যমান সে সাঁতরে পার হবার বা ডুবে যাবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বেপরোয়া এবং চোখ বন্ধ মসিবতের তুফানের মাঝে কোনো পরোয়া না করে সে ভাসিয়ে দিয়েছে তার জীবন-তরী। কখনও কখনও চোখ খুলে হাল সামলাবার খেয়াল তার আসে, কিন্তু আবার হতাশা তাকে অভিভূত করে তোলে। এ মাল্লাকে উপকূল বা মনজিলের নির্দেশ দেবার মতো দিশারীর প্রয়োজন ছিলো। আর প্রকৃতি সে ভার চাপিয়ে দিয়েছিলো নায়ীমের ওপর। নায়ীমের সাথে মামুলি সম্পর্ক জুলাইখার অন্তরের ঘুমন্ত তুফানকে উত্তাল এবং ইবনে সাদেকের পাঞ্জা থেকে রেহাই পেয়ে নায়ীমের দুনিয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরকে চঞ্চল করে তুললো।

জুলাইখা প্রতি রাতে কোনো না কোনো সময়ে আসে এবং খানাপিনার ব্যবস্থা ছাড়াও নায়ীমের অন্ধকার কুঠরীতে রেখে যায় খানিকটা আশার কিরণ।

চার দিন পর আবার নায়ীমকে হাজির করা হলো ইবনে সাদেকের সামনে। ইবনে সাদেক তার শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন না দেখে হয়রান হয়ে বললো– তোমার জান বড্ড শক্ত। হয় তো আল্লাহ তায়ালার মনজুর, তুমি জিন্দা থাকবে। কিন্তু তুমি নিজ হাতে নিজের মৃত্যু ক্রয় করছো। আমি এখনও তোমাকে চিন্তা করার মওকা দিচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার

ভাগ্যের সেতারা খুবই বুলন্দ। কোনো বড় কর্তব্য সাধনের জন্যই তুমি জন্মেছো। আমি তোমাকে সেই উচ্চস্তরে পৌছাবার ওয়াদা করছি, তামাম ইসলামী দুনিয়ায় যেখানে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। আমি তোমার দিকে দোস্তির হাত প্রসারিত করছি আর এটাই হচ্ছে শেষ মওকা। এখনও তুমি আমার আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করলে শেষ পর্যন্ত পস্তাবে।

নায়ীম বললো– ইতর কুত্তা কোথাকার! আমাকে বার বার কেন বিরক্ত করছো?

: এ ইতর কুত্তার কামড় কখনও সুখের হবে না। তোমাকে কামড়াবার জন্য এ ইতর কুত্তার মুখ খোলার সময় হয়েছে এখন। অপরিণামদর্শী যুবক! একবার চোখ খুলে দেখে নাও, দুনিয়া কতো সুন্দর! চেয়ে দেখো, পাহাড়ের দৃশ্য কত মুগ্ধকর। যেসব জিনিস দেখার ইচ্ছা জাগে, আজই ভালো করে দেখে নাও। মনের উপর সব কিছুর ছবি ভালো করে এঁকে নাও। কাল সূর্যোদয়ের আগেই উপড়ে ফেলা হবে তোমার চোখ। আর ও কান দুটো দিয়েও আর কিছু শুনতে পাবে না কখনও। যা কিছু দেখতে চাও, আজই দেখে নাও; যা কিছু শুনতে চাও, শুনে নাও। এসব কথা বলে সে সিপাহীদের হুকুম দিলো নায়ীমকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে।

: হ্যাঁ, এবার বলো– চোখের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবার আগে কোন জিনিস তুমি দেখতে চাও?

নায়ীম নীরব রইলেন।

ইবনে সাদেক বললো– তুমি জান, আমার ফয়সালা অটল। আজ সারাদিন তোমার এখানেই কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে। এ সময়টার ফায়দা নিয়ে নাও। যা কিছু আসবে তোমার সামনে, ভালো করে দেখে নাও। আর যে সুর ঝংকার বাজবে তোমার সামনে, প্রাণ ভরে শুনে নাও।

ইবনে সাদেক হাততালি দিলো। অমনি কয়েকটি লোক সেখানে এসে হাজির হলো বাদ্য-বাজনার নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে। ইবনে সাদেকের ইশারায় তারা বসে গেলো একদিকে।

আস্তে আস্তে সুর-ঝংকার বুলন্দ হতে লাগলো। এর পর বহু বিচিত্র বর্ণের লেবাসে সজ্জিত কয়েকটি নারী এক কোণ থেকে বেরিয়ে এসে নাচতে শুরু করলো নায়ীমের সামনে। নায়ীমের নজর তখন নীচে তার পায়ের দিকে। তার কল্পনা তখন তাকে নিয়ে গেছে বহুক্রোশ দূরে এক বস্তির পথে।

মজলিস বসার পর কয়েক মুহূর্ত চলে গেছে। হঠাৎ কয়েকটি দ্রুতগামী ঘোড়ার

পায়ের আওয়াজে মজলিসে হাজির লোকেরা চমকে ওঠলো। ইবনে সাদেক ওঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো; ইসহাক পৌঁছে গেছে বলে খবর দিলো এক হাবশী গোলাম।

ইবনে সাদেক নায়ীমকে লক্ষ্য করে বললো– নওজোয়ান! হয়তো তুমি এখন খুব আনন্দের একটি খবর শুনবে।

খানিকক্ষণ পর ইসহাক এক তশতরি হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে সসম্ভ্রমে ইবনে সাদেকের সামনে রাখলো। ইবনে সাদেক ওপরের রুমালখানা তুললে নায়ীম দেখলেন, তাতে একটি মানুষের মস্তক।

হয় তো এটি দেখে তুমি খুশি হবে। বলে ইবনে সাদেক এক হাবশীকে ইশারা করলো। হাবশী তশতরি তুলে নায়ীমের কাছে নিয়ে রাখলো জমিনের ওপর। তশতরিতে রাখা মস্তকটি চিনতে পেরে নায়ীমের অন্তরে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। ইবনে আমেরের মস্তক! শুকিয়ে যাওয়া মুখের উপর তখনও খেলছে এক অপূর্ব হাসির রেখা। নায়ীম অশ্রুসজল চোখ দুটি বন্ধ করলেন। জুলাইখা ইবনে সাদেকের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে মর্মবিদারক দৃশ্য! ধৈর্য ও মহিমার প্রতিমূর্তি নায়ীমের চোখে অশ্রুধারা দেখে তার কলজে ফেটে যাচ্ছে।

ইবনে সাদেক আসন ছেড়ে ওঠলো। ইসহাকের কাছে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বললো– ইসহাক! এখন আর একটিমাত্র শর্ত বাকী। আমি চাই মুহাম্মদ বিন কাসেমের মস্তক এ নওজোয়ানের সাথে দাফন করতে। যদি তুমি সে অভিযানে কামিয়াব হয়ে ফিরে আসতে পার, তাহলে জুলাইখা হবে তোমারই। তাকে তোমার মতো বাহাদুর নওজোয়ানের জীবনসঙ্গিনী করে দিতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

বলতে বলতে ইবনে সাদেক ফিরে জুলাইখার দিকে তাকালো। জুলাইখা অশ্রুভরা চোখে চলে গেলো নিজের কামরার দিকে। ইবনে সাদেক নায়ীমের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো– আমি জানি, ইবনে কাসেমের প্রতি তোমার অশেষ মহব্বত। যদি কোনো কারণে তার মস্তক এখানে পৌঁছা পর্যন্ত তুমি জীবিত না থাকতে পারো, তা হলে আমি ওয়াদা করছি, তার মস্তক তোমারই সাথে দাফন করা হবে।

ইবনে সাদেকের হুকুমে সিপাহীরা নায়ীমকে রেখে গেলো কয়েদখানায়।

* * *

রাতের বেলা নায়ীম কিছুক্ষণ কয়েদখানার চার দেয়ালের মধ্যে অস্থির চঞ্চল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তার মন দীর্ঘকালের আত্মিক ও দৈহিক ক্লেশ সহ্য করে নির্বিকার হয়ে ওঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখ কান থেকে বঞ্চিত হবার শাস্তির কল্পনা করাটা খুব মামুলি ব্যাপার নয়। প্রতি মুহূর্তে তার মনের চাঞ্চল্য বেড়ে চলেছে। কখনও তার মনে কামনা জাগে, এ রাত কেয়ামতের রাতের মতো দীর্ঘ হোক, আবার কখনও তার মুখ থেকে দোয়া বেরিয়ে আসে, এখনই ভোর হয়ে প্রতীক্ষার রাতের অবসান হোক। টহল দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পাশ ফেরার পর মুজাহিদের চোখে নামলো ঘুমের মায়া। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, ভোর হয়ে এসেছে এবং তাকে কুঠরী থেকে বের করে বেঁধে দেয়া হয়েছে এক গাছের সাথে। ইবনে সাদেক হাতে খঞ্জর নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে তার চোখ দুটি উপড়ে ফেলছে। চারদিক ছেয়ে নেমে আসছে ঘন অন্ধকার। তারপর তা হচ্ছে একটি তরল পদার্থ। শাঁ শাঁ করছে তার কানের ভেতর। তিনি কিছুই শুনতে পারছেন না। ইবনে সাদেকের সিপাহী তাকে সেখান থেকে এনে ফেলে যাচ্ছে কুঠরীর ভেতরে। সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ তার নজরে আসছে না। সিপাহী আর একবার এসে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুঠরীর বাইরে; তারপর তাকে ফেলে আসছে খানিকটা দূরে। তারপর তিনি অনুভব করছেন, যেনো সহসা খুলে গেলো তার কানের পর্দা। পাখিদের কলকাকলি আর হাওয়ার শাঁ শাঁ আওয়াজ আসছে তার কানে। আযরা 'নায়ীম নায়ীম' বলে ডাকছে তাকে। যেদিক থেকে আযরার আওয়াজ আসছে, তিনি ওঠে কদম ফেললেন সেদিকে। কিন্তু কয়েক পা চলার পর পা কাঁপতে কাঁপতে তিনি পড়ে যাচ্ছেন জমিনের ওপর। আবার ফিরে আসছে তার চোখের দৃষ্টি। তিনি দেখছেন, আযরা তার সামনে দাঁড়িয়ে। আবার ওঠে তিনি 'আযরা আযরা' বলে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছেন তার দিকে। কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার স্বপ্নের শেষাংশ বাস্তব সত্য হয়ে ওঠেছে। কিন্তু আযরার পরিবর্তে কুঠরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তারই মতো রূপ-সৌন্দর্যের আর এক মূর্ত-প্রতীক। দেয়ালের ছিদ্রপথ দিয়ে তার মুখে এসে পড়ছে চাঁদের রোশনী। খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখে তিনি চিনলেন, সে ছায়ামূর্তিটি জুলাইখা। কিন্তু বহুক্ষণ পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি অনুভব করতে লাগলেন যেনো তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ধীরে ধীরে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে লাগলো। কয়েকবার চোখ মেলে নিজের শরীরে হাতের স্পর্শ অনুভব করতে তার মনে হলো এ স্বপ্ন নয়– বাস্তব সত্য।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– কে তুমি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

জুলাইখা চাপা আওয়াজে জবাব দিলো– না, এ স্বপ্ন নয়। কিন্তু আপনি পড়ে গেলেন কেন?

: কখন?

: এই তো এখনই, আমি আপনাকে যখন আওয়াজ দিচ্ছিলাম। আপনি ঘাবড়ে ওঠলেন, তারপরই আবার পড়ে গেলেন।

: উহ্! আমি এক স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম, যেনো আমি অন্ধ হয়ে গেছি। আযরা আমায় ডাকছে আর আমি এগিয়ে যাচ্ছি তার দিকে। অমনি একটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেছি, কিন্তু আপনি এখানে?

জুলাইখা বললো– আস্তে কথা বলুন। যদিও ওরা সবাই ঘুমিয়ে আছে এখন, তবু কারো কানে আপনার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছলে সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিজের সব জেওর দিয়ে দিয়ে আমি বহু কষ্টে পাহারাদারদের বাধ্য করে এ কুঠরীর দরজা খুলিয়েছি। আমাদের জন্য তারা দুটো ঘোড়া তৈরি করে রেখেছে। তারা কেল্লার দরজা খুলে দেবার ওয়াদা করেছে। আপনি ওঠে হুশিয়ার হয়ে আমার সাথে চলুন।

: দুটো ঘোড়া, কি জন্যে?

: আমি আপনার সাথে যাবো।

নায়ীম হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন– আমার সাথে?

: হ্যাঁ, আপনার সাথে। আমার আশা, আপনি আমার হেফাজত করবেন। আমার বাবা-মার ঘর দামেশকে। আপনি সেখানে পৌঁছে দেবেন আমায়।

: এ কেল্লায় কি করে এলেন আপনি?

জুলাইখা বললো– কথার সময় নেই এখন। আমিও আপনারই মতো এক বদনসীব।

নায়ীম খানিকটা ইতস্তত করে বললেন– এখন আপনার আমার সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি আশ্বস্ত হোন, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে মুক্ত করবো এ লোকটির হাত থেকে।

: না, না। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আমায় হতাশ করবেন না। জুলাইখা কেঁদে বললো– আপনার সাথেই যাবো আমি। আপনি চলে যাবার পর যদি ওরা জানতে পারে, আপনাকে আযাদ করার পেছনে আমার কোনো হাত ছিলো, তা

হলে ওরা আমাকে কতল না করে ছেড়ে দেবে না। আর তা না জানলেও আপনার চলে যাবার পর আপনার দিক থেকে বিপদের আশংকা করে ওরা কেল্লা ছেড়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন আমায় ওরা এমন এক পিঞ্জরে কয়েদ করবে, যেখানে পৌঁছা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি জানেন না, এ লোকটি জোর করে আমাকে ইসহাকের সাথে শাদী দিতে যাচ্ছে। সে ওয়াদা করেছে, মুহাম্মদ বিন কাসেমকে কতল করে আসতে পারলে আমাকে তার হাতে সঁপে দেবে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় এ জালেম নেকড়ের হাত থেকে বাঁচান। কথাক'টি বলে সে নায়ীমের জামা ধরে হাঁপাতে লাগলো।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলতে পারবেন?

জুলাইখা আশান্বিত হয়ে জবাব দিলো– আমি এ জালেমের সাথে ঘোড়ায় চড়ে প্রায় আধা দুনিয়া ঘুরেছি। এখন সময় নষ্ট করবেন না। আপনার তামাম হাতিয়ারসহ এক পাহারাদার ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেল্লার বাইরে।

নায়ীম জুলাইখার হাত ধরে কুঠরির দরজার দিকে গেলে বাইরের কারো পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। তিনি থেমে গিয়ে চুপি চুপি বললেন– কে যেনো আসছে এদিকে।

এ কুঠরির দু'জন পাহারাদারকেই আমি কেল্লার দরজায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এ অন্য কেউ হবে। এখন কি হবে?

নায়ীম তার মুখে হাত রেখে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিলেন। তারপর নিজে দরজার বাইরে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। পায়ের আওয়াজ যত নিকটতম হতে লাগলো, তার হৃদ-স্পন্দন তত প্রবল হতে লাগলো। এক পাহারাদার দেয়ালের গা ঘেঁষে দরজার কাছে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো। সাথে সাথেই নায়ীম তাকে ঘুষি লাগালেন এবং তার গর্দান নায়ীমের লৌহ কঠিন মুঠোর মধ্যে পিষ্ট হতে লাগলো। নায়ীম কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেহুশ অবস্থায় তাকে কুঠরির ভেতরে ঠেলে ফেললেন এবং জুলাইখার হাত ধরে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কেল্লার দরজায় এক সিপাহী তার নজরে পড়লো। জুলাইখাকে দেখেই সে দরজা খুলে দিলো। আর এক সিপাহী কেল্লার বাইরে নায়ীমের হাতিয়ার আর ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। নায়ীম হাতিয়ার বেঁধে জুলাইখাকে এক ঘোড়ায় সওয়ার করে দিয়ে নিজে অপর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কিন্তু কয়েক কদম চলেই তিনি ফিরে পাহারাদারদের বললেন– তোমরা কি নিশ্চিত জানো, আমাদের জন্য তোমাদের জান বিপন্ন হবে না?

পাহারাদার জবাব দিলো– আপনি আমাদের চিন্তা করবেন না। ওই যে দেখুন!

সে একটি গাছের দিকে ইশারা করে বললো– ভোর হবার আগে আমরাও কয়েক ক্রোশ দূরে চলে যাবো। এ নেকড়ের দলে আর আমাদের মন বসছে না।

নায়ীম দেখলেন, গাছের সাথে আরো দুটি ঘোড়া বাঁধা।

দুর্গম পাহাড়ী পথের সাথে নায়ীমের পরিচয় নেই। সেতারার ঝলকে পথ দেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন জুলাইখাকে নিয়ে। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েক ক্রোশ চলার পর তার নজরে পড়লো এক বিস্তীর্ণ ময়দান। কয়েক মাস পর তিনি খোলা হাওয়ায় এসে দেখছেন আসমানের দীপ্তিমান সেতারারাজির দৃশ্য। নির্জন পথে মাঝে মাঝে শোনা যায় শিয়ালের ডাক। চাঁদের মুগ্ধকর আলোর বন্যা গাছের পাতায় পাতায়, দীপ্তিমান জোনাকির দল, হালকা হালকা ঠাণ্ডা সুরভি হাওয়া। এক কথায় সে রাতের সবকিছুই যেনো নায়ীমের কাছে অসাধারণ আনন্দদায়ক মনে হতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরই ভোরের রোশনী রাতের কালো পর্দা ভেদ করে উঁকি মারতে শুরু করলো। আলো-আঁধারে নায়ীমের চোখে দেখা দিলো একদিকে সারি সারি পাহাড় শ্রেণী, আর একদিকে ময়দানের আবছা দৃশ্য। তিনি জুলাইখার দিকে তাকালেন। তার রূপ ও আকৃতি সেই অস্পষ্ট দৃশ্যরাজিকে যেনো আরো মোহময় করে তুলেছে। নায়ীমের কাছে সে যেনো প্রকৃতির দৃশ্য পরিক্রমারই একটা অংশ। জুলাইখাও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় গর্দান নীচু করে ফেললো। সে কি করে ইবনে সাদেকের হাতে পড়েছিলো জানতে চাইলেন নায়ীম। জবাবে জুলাইখা তার মর্মন্তুদ কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলো। বলতে বলতে কয়েকবার সে আপনার অলক্ষ্যে কেঁদে ফেলেছে। নায়ীম বার বার তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

আরও বেশি আলো দেখা দেবার পর তারা ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন। জুলাইখা ঘোড়ায় চড়ে খুব ভালো চলতে পারে দেখে নায়ীম ছুটে চললেন আরও দ্রুত গতিতে। প্রায় দু'ক্রোশ চলার পর হঠাৎ নায়ীমের মাথায় এক খেয়াল এলো। তিনি ঘোড়া থামালেন। জুলাইখা তার দেখাদেখি থেমে পড়লো। নায়ীম জুলাইখাকে প্রশ্ন করলেন– আপনি কি বিশ্বাস করেন, ইসহাক মুহাম্মদ বিন কাসেমকে কতল করার ইরাদা নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে?

জুলাইখা জবাব দিলো– হ্যাঁ, সে সন্ধ্যা বেলায় রওয়ানা হয়ে গেছে।

: তা হলে বেশি দূর যায়নি সে! বলে নায়ীম ঘোড়ার গতি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। জুলাইখা কোনো প্রশ্ন না করে তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটালো।

সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ পর নায়ীম এসে পৌঁছলেন এক চৌকিতে। পাহাড়ী লোকদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্য সেখানে ছিলো ত্রিশ জন সিপাহী। নায়ীম ঘোড়া থেকে নামলেন। এক বুড়ো সিপাহী নায়ীমকে চিনতে পেরে 'নায়ীম নায়ীম' বলে এগিয়ে এসে তার সাথে বুক মেলান। এ বুড়ো সিপাহীটি পাশের বস্তির বাসিন্দা। খুশির জোশে সে নায়ীমের পেশানীতে হাত বুলিয়ে বললো– আলহামদুলিল্লাহ! আপনি নিরাপদে আছেন! এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি? আমরা দুনিয়ার প্রতি কোণে খুঁজে বেড়িয়েছি আপনাকে। আপনার ভাইও আপনার খোঁজে গিয়েছিলেন সিন্ধুতে। আপনার দোস্ত মুহাম্মদ বিন কাসেম আপনার সন্ধানের জন্য পাঁচ হাজার আশরাফী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই হতাশ হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন আপনি?

নায়ীম জবাব দিলেন– এসব প্রশ্নের জবাব দিতে বহু সময়ের প্রয়োজন। এখন আমি খুব তাড়াহুড়ায় রয়েছি। আপনি আমায় বলুন, আজ রাতে অথবা ভোর বেলায় একটি বলিষ্ঠ দেহ লোক এ পথ দিয়ে গেছে কি না?

সিপাহী জবাব দিলো– হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ আগে এক লোক এখান থেকে গেছে। সে বলছিলো, দামেশ্‌ক থেকে খলিফাতুল মুসলেমিন এক খাস পয়গাম দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন সিন্ধুর পথে মুহাম্মদ বিন কাসেমের কাছে। লোকটি এখান থেকে ঘোড়া বদল করে নিয়েছে।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– লোকটি গন্দমী রঙের?

বুড়ো সিপাহী জবাব দিলেন– জি হ্যাঁ, সম্ভবত তার রঙ গন্দমী।

: বহুত আচ্ছা। নায়ীম বললেন– আপনাদের মধ্যে একজন সোজা উত্তর-পূর্বে গিয়ে কয়েক ক্রোশ দূরে পাহাড়ের ওপর দেখতে পাবেন গাছ-পালায় ঢাকা এক কেল্লা। যে লোকটি যাবে সে কাছে গিয়ে দেখবে, কেল্লার বাসিন্দারা কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে কি না। আমার বিশ্বাস, তার যাবার আগেই ওরা কেল্লা খালি করে চলে যাবে, কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা কোন দিকে যাচ্ছে। এর জন্য দরকার একটি হুশিয়ার লোক।

: আমি যাচ্ছি, বলে এক নওজোয়ান এগিয়ে এলো।

নায়ীম বললেন– হ্যাঁ যাও। যদি ওরা আগেই কেল্লা খালি করে গিয়ে থাকে, তাহলে ফিরে এসো। নইলে তাদের গতিবিধির প্রতি খেলায় রাখবে।

নওজোয়ান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চললো। নায়ীম বাকি সিপাহীদের

ভেতর থেকে বিশ জনকে বাছাই করে নিয়ে হুকুম দিলেন– তোমরা সম্মানিত মহিলার সাথে বসরা পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে পৌঁছে আমার তরফ থেকে গভর্নরকে বলবে– একে ইজ্জত ও শ্রদ্ধার সাথে দামেশ্‌কে পৌঁছে দিতে হবে। পথের চৌকিগুলো থেকে যত সিপাহী সংগ্রহ করা সম্ভব, তোমাদের সাথে শামিল করে নেবে। সম্ভবত এক ভয়ানক দুশমন এর অনুসরণ করবে। বসরার গভর্নরকে বলবে, তিনি যেনো এর সাথে কমসে কম একশ' সিপাহী রওয়ানা করে দেন। তোমরাও হুঁশিয়ার থাকবে। এর দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করা হলে, তোমাদের সবচাইতে ফরয হবে এর জান বাঁচানো। পথে এর তকলীফ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

হুকুম পেয়ে সিপাহী ঘোড়ার যিন লাগাতে ব্যস্ত হলো। নায়ীম ঘোড়া থেকে নেমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামে একখানা চিঠি লিখে তাতে তার জন্য জুলাইখার কুরবানীর কথা জানিয়ে তাকে ইজ্জত ও শ্রদ্ধার সাথে দামেশ্‌কে পৌঁছে দেবার আবেদন জানালেন।

চিঠিখানা এক সিপাহীর হাতে দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জুলাইখার কাছে। জুলাইখা তখনও মাথা নীচু করে বসে রয়েছে ঘোড়ার ওপর। নায়ীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন– আপনাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে! কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আপনার হেফাজতের পুরো বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। পথে কোনো তকলিফ হবে না আপনার। মনে করেছিলাম, আমিও আপনার সাথে বসরা পর্যন্ত যাবো, কিন্তু আমি নিরূপায়।

জুলাইখা বললেন– কোথায় যাবেন আপনি?

: আমায় এক দোস্তের জান বাঁচাতে হবে।

: আপনি ইসহাকের পিছু ধাওয়া করতে যাচ্ছেন?

: হ্যাঁ, আশা করছি খুব শিগগিরই আমি তাকে ধরে ফেলবো।

জুলাইখা তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটি রুমালে ঢেকে বললো– আপনি সতর্ক হয়ে চলবেন। ও যেমন বাহাদুর তেমনি প্রতারক।

: আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সাথীরা তৈরি হয়ে গেছে, আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আল্লাহ্ হাফেয।

নায়ীম চলার উপক্রম করতেই জুলাইখা অশ্রুভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন আওয়াজে বললেন– আমি একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

: হ্যাঁ বলুন!

জুলাইখা চেষ্টা করেও বলতে পারে না। তার কালো চোখ থেকে উছলে ওঠা অশ্রুর ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো।

: বলুন! নায়ীম বললেন– আপনি আমায় কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন। আমি আপনার চোখের আঁসুর কদর কীমত জানি, কিন্তু আপনি আমার নিরূপায় অবস্থার খবর জানেন না।

জুলাইখা চাপা আওয়াজে জবাব দিলো– আমি জানি।

: হ্যাঁ, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কি জিজ্ঞেস করতে চান, বলুন।

জুলাইখা বললো– আমি প্রশ্ন করতে চাই, যখন আমি আপনাকে কয়েদখানায় আওয়াজ দিয়েছিলাম তখন আযরা বলে আপনি ওঠে আবার পড়ে গিয়েছিলেন।

নায়ীম জবাব দিলেন– হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

: আমি জানতে পারি, সে খোশনসীব কে? জুলাইখার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

: আপনি ভুল করছেন। সে হয় তো অতোটা খোশনসীব নয়।

: তিনি জীবিত আছেন?

: সম্ভবত।

: আল্লাহ করুন, তিনি যেন জীবিত থাকেন। কোথায় তিনি? আমার পথ থেকে বহু দূর না হলে আমি তাকে দেখে যেতে চাই একবার। আপনি আমার আবেদন কবুল করবেন?

: আপনি সত্যি সত্যি সেখানে যেতে চান?

: আপনি অপছন্দ না করলে আমি খুবই খুশি হবো।

: বহুত আচ্ছা। এ সিপাহী আপনাকে আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি ওখানে থাকবেন। কোনো কারণে দেরী হলে সম্ভবত পথেই এসে আমি মিলবো আপনাদের সাথে।

: তিনি আপনার মার কাছেই আছেন কি? আপনাদের কি শাদী হয়েছে?

: না, কিন্তু সে প্রতিপালিত হয়েছে আমাদের ঘরেই।

এ কথা বলে নায়ীম সিপাহীদের লক্ষ্য করে হুকুম দিলেন, জুলাইখাকে যেনো বসরায় পৌঁছে না দিয়ে তার বাড়িতেই পৌঁছে দেয়া হয়।

নায়ীম আল্লাহ হাফেয বলে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জুলাইখার অনুনয়ভরা দৃষ্টি

আর একবার তার পথ রোধ করলো। জুলাইখা চোখ নীচু করে ডান হাত দিয়ে একখানা খঞ্জর নায়ীমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো– আপনার হাতিয়ারের ভেতর থেকে এ খঞ্জর আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম কল্যাণের নিদর্শন হিসেবে। হয় তো এর প্রয়োজন হবে আপনার।

: যদি ওটা আপনি কল্যাণের নিদর্শন বলেই মনে করে থাকেন, তা হলে আমি খুশি হয়েই আপনাকে ওটা পেশ করছি। আপনি ওটা হামেশা কাছে রাখবেন।

: শুকরিয়া। আমি এটা হামেশা নিজের কাছে রাখবো। হয় তো কখনও আমার কাজে লাগবে।

নায়ীম তখন তার কথায় ততটা মনোযোগ না দিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কিন্তু পরে বহুক্ষণ কথাগুলো তার কানে বাজতে লাগলো।

* * *

জুলাইখাকে ছোটখাটো কাফেলার সাথে পাঠিয়ে দিয়ে নায়ীম রওয়ানা হলেন ইসহাকের পিছু ধাওয়া করতে। প্রত্যেক চৌকিতে ঘোড়া বদল করে ইসহাকের সন্ধান করতে করতে তিনি ছুটে চললেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। দুপুর বেলা তার সামনে এক সওয়ার নজরে পড়লো। নায়ীম তার ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। আগের সওয়ার নায়ীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে তার ঘোড়ার বাগ ঢিলে করে দিলো। কিন্তু পেছনের সওয়ারের ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছে দেখে সে কি যেনো ভেবে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলো। নায়ীম দূর থেকেই ইসহাককে চিনে ফেলেছেন। তিনি লৌহ শিরস্ত্রাণ নীচু করে দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। নায়ীমকে কাছে আসতে দেখে ইসহাক রাস্তা থেকে কয়েক কদম সরে একদিকে দাঁড়ালো। নায়ীমও তার কাছে গিয়েই ঘোড়া থামালেন। উভয় সওয়ার মুহূর্তের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন নির্বাক হয়ে। শেষ পর্যন্ত ইসহাক প্রশ্ন করলো– আপনি কে? কোথায় যাবার ইরাদা করেছেন?

নায়ীম বললেন– সেই একই প্রশ্ন আমিও তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।

নায়ীমের কণ্ঠস্বরের কঠোরতা এবং আপনি না বলে 'তুমি' বলতে দেখে ইসহাক পেরেশান হয়ে ওঠে। কিন্তু শিগগিরই পেরেশানী সংযত করে বললো– আপনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আর একটি প্রশ্ন করে বসেছেন।

নায়ীম বললেন– ভালো করে তাকাও আমার দিকে। তোমার দুটি প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে। নায়ীম এক হাত দিয়ে তার মুখের আবরণ খুলে ফেললেন।

ইসহাকের মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো– তুমি... নায়ীম?

নায়ীম তার লৌহ শিরস্ত্রাণ আবার নীচু করে দিয়ে বললেন– হ্যাঁ, তাই...।

ইসহাক তার ভীতি সংযত করে আচানক ঘোড়ার বাগ টেনে পিছু হটলো। নায়ীমও এক হাতে ঘোড়ার বাগ ও অপর হাতে নেযা সামলে নিয়ে তৈরি হয়ে গেছেন ইতোমধ্যে। দু'জনই প্রতীক্ষা করছেন পরস্পরের হামলার। আচানক ইসহাক নেযা বাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া হাঁকালো সামনের দিকে। ইসহাকের ঘোড়ার এক লাফে নায়ীম এসে গেছেন তার নাগালের ভেতর। কিন্তু বিজলী চমকের মতো দ্রুতগতিতে তিনি একদিকে ঝুঁকলেন। ইসহাকের নেযা সরে গেলো তার রানে খানিকটা হালকা জখম করে। ইসহাকের ঘোড়া কয়েক কদম আগে চলে গেলো। নায়ীম তখ্খুনি তার ঘোড়া ঘুরিয়ে এনে আর একবার দাঁড়িয়ে গেলো নায়ীমের সামনে। উভয় সওয়ার একই সঙ্গে নিজ নিজ ঘোড়া হাঁকিয়ে নেযা সামলাতে সামলাতে এগিয়ে গেলেন পরস্পরের দিকে। নায়ীম আর একবার আত্মরক্ষা করলেন ইসহাকের আক্রমণ থেকে। কিন্তু এবার নায়ীমের নেযা ইসহাকের সিনা পার হয়ে চলে গেছে। ইসহাককে খাক ও খুনের মধ্যে তড়পাতে দেখে নায়ীম ফিরে চললেন। পরের চৌকিতে গিয়ে তিনি জোহরের নামায আদায় করলেন। তারপর ঘোড়া বদল করে তিনি এক লহমা সময় নষ্ট না করে চললেন গন্তব্য পথে। যে চৌকি থেকে জুলাইখাকে বিদায় দিয়ে তিনি ইসহাকের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছে জানলেন, ইবনে সাদেক তার দলবল নিয়ে চলে গেছে কেল্লা ছেড়ে। তাদের পেছনে ছুটে বেড়ানো নায়ীমের কাছে মনে হলো নিষ্ফল।

তখনও সন্ধ্যার কিছুটা দেরী। এক সিপাহীর কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে নায়ীম এক চিঠি লিখলেন মুহাম্মদ বিন কাসেমের নামে। সিন্ধু থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর ইবনে সাদেকের হাতে গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী তিনি সবিস্তার লিখলেন তার চিঠিতে। তিনি তাকে ইবনে সাদেকের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য তাকিদ করলেন। তিনি দ্বিতীয় চিঠি লিখলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামে। ইবনে সাদেককে অবিলম্বে গ্রেফতারে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার তাকিদ দিলেন তাকে। চিঠি দুটো চৌকিওয়ালাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নায়ীম তাদের দ্রুত পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে আবার ঘোড়ায় সওয়ার

হলেন।

নায়ীমের মনে আশঙ্কা ছিলো, ইবনে সাদেক হয় তো জুলাইখার অনুসরণ করবে। প্রতি চৌকিতে তিনি ছোটখাটো কাফেলাটির খবর নিতে নিতে চললেন। তিনি জানতে পারলেন, অপর চৌকিগুলোয় সিপাহীর অভাব ছিলো বলেই জুলাইখার সাথে দশ জনের বেশি সিপাহী যেতে পারেনি। জুলাইখার হেফাজতের চিন্তা করে তিনি তখ্খুনি সেই কাফেলায় শামিল হতে চাইলেন এবং দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। রাত হয়ে গেছে। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ সারা দৃষ্টির ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে তার রূপালী আভা। নায়ীম পাহাড়-প্রান্তর অতিক্রম করে পার হয়ে চলেছেন এক মরু অঞ্চল। পথের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখে তার দেহের রক্ত জমাট হয়ে এলো। বালুর ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটি ঘোড়া ও মানুষের লাশ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও তড়পাচ্ছে। নায়ীম ঘোড়া থেকে দেখলেন, জুলাইখার সাথে যারা এসেছিলো, তাদের কেউ কেউ রয়েছে তাদের মধ্যে। নায়ীমের অন্তরে সবার আগে জাগলো জুলাইখার চিন্তা। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। এক আহত নওজোয়ান পানি চাইলো নায়ীমের কাছে। নায়ীম ঘোড়ার পিঠে বাঁধা মোশক থেকে পানি ধরলেন তার মুখের কাছে। এক হাত দিয়ে তার কম্পিত বুক চেপে ধরে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন। এর মধ্যে আহত নওজোয়ান একদিকে হাতের ইশারা করে বললো– আমাদের আফসোস! আমরা আমাদের ফরয আদায় করতে পারিনি। আপনার হুকুম মোতাবেক আমরা নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা না করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওর জানের হেফাজত করার জন্য লড়াই করেছি। কিন্তু ওরা ছিলো সংখ্যায় অনেক বেশি। আপনি ওর খবর নিন।

এ কথা বলে সে আবার হাত দিয়ে ইশারা করলো একদিকে। নায়ীম দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কয়েকটি লাশের মাঝখানে জুলাইখাকে দেখে তার অন্তর কেঁপে ওঠলো। কানের ভেতর শাঁ শাঁ আওয়াজ হতে লাগলো। যে মুজাহিদ আজ পর্যন্ত অসংখ্যবার নাজুক থেকে নাজুকতর পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে অকুতোভয়ে, এ মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁকে কাঁপিয়ে তুললো।

: জুলাইখা! জুলাইখা! তুমি...

জুলাইখার শ্বাস তখনও কিছুটা বাকি রয়েছে। ক্ষীণ আওয়াজে বললো– আপনি এসে গেছেন?

নায়ীম এগিয়ে গিয়ে জুলাইখার মাথা তুলে ধরে পানি দিলেন তার মুখে।

জুলাইখার সিনায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে এক খঞ্জর। নায়ীম কম্পিত হাতে তার হাতল ধরে টেনে বের করতে চাইলেন। কিন্তু জুলাইখা হাতের ইশারায় তাকে মানা করে বললো– ওটা বের করে কোন ফায়দা হবে না। ওর কাজ ও করেছে আর এ শেষ মুহূর্তে আমি আপনার নিশানী থেকে জুদা হতে চাই না।

নায়ীম হয়রান হয়ে বললেন– আমার নিশানী?

: জি হ্যাঁ, এ খঞ্জর আপনার। আপনার দেয়া খঞ্জর আমার কাজে এসেছে। তাই আমি আপনার শুকরগুজারী করছি।

: জুলাইখা! জুলাইখা!! তুমি আত্মহত্যা করলে!!

: প্রতিদিনের রূহানী মৃত্যুর চেয়ে একদিনের দৈহিক মরণকে আমি ভালো মনে করেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমার ওপর নারাজ হবেন না। শেষ পর্যন্ত আমি কি-ই বা করতে পারতাম? ভাঙ্গা তাকদিরকে জোড়া দেয়ার সাধ্য ছিলো না আমার। আর এই শেষ হতাশা আমি জীবিত থেকে বরদাশত করতে পারতাম না।

নায়ীম বললেন– জুলাইখা! আমি অত্যন্ত লজ্জিত, কিন্তু উপায় ছিলো না।

জুলাইখা নায়ীমের মুখের উপর প্রীতিভরা দৃষ্টি হেনে বললো– আপনি আফসোস করবেন না। এই-ই কুদরতের মঞ্জুর, আর কুদরতের কাছে এর চাইতে বেশি প্রত্যাশাও আমি করিনি। শেষ মুহূর্তে আপনি আমার পাশে রয়েছেন, এর চাইতে খোশনসীব আমার কি-ই বা হতে পারতো!

জুলাইখা এ কথা বলে দুর্বলতা ও বেদনার আতিশয্যে চোখ মুদলো। কম্পিত দীপশিখা বুঝি নিভে গেল– এ মনে করে নায়ীম 'জুলাইখা জুলাইখা' বলে তার মাথায় ঝাঁকুনি দিলেন। জুলাইখা চোখ খুলে নায়ীমের দিকে তাকালো এবং শুকনো গলায় হাত রেখে পানি চাইলো। নায়ীম পানি দিলেন তার মুখে। খানিকক্ষণ দু'জনই নির্বাক। এই স্তব্ধতার মধ্যে নায়ীমের অন্তরের কম্পন দ্রুততর ও জুলাইখার অন্তর স্পন্দন ক্ষীণতর হতে লাগলো। মৃত্যু পথযাত্রীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে শেষ সঙ্গীর মুখের ওপর। আর সঙ্গীর ব্যথাতুর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তার বুকে নিমজ্জিত খঞ্জরের ওপর। শেষ পর্যন্ত জুলাইখা একবার কাতরে উঠে নায়ীমের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো– আপনার ঘরে গিয়ে আমি ওকে দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পুরণ হলো না। আপনি গিয়ে ওকে আমার সালাম বলবেন। জুলাইখা আবার চুপ করলো। খানিকক্ষণ চিন্তা করে জুলাইখা আবার বললো– আমি এখন এক দীর্ঘ সফরের পথে চলেছি। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করবো আমি। যে

দুনিয়ায় আমি চলেছি, সেখানে আমার পরিচিত কেউ থাকবে না। আমার বাবা-মা হয় তো চিনবেন না আমায়। কেননা, যখন এ জালেম চাচা আমাকে চুরি করে এনেছে, তখন আমি ছিলাম খুবই ছোট। এ আশা কি আমি করতে পারি, সে দুনিয়ায় আপনি একবার অবশ্যই মিলিত হবেন আমার সাথে। সেখানে এমন একজন লোক তো চাই, যাকে আমি আপনার বলতে পারবো। আপনাকেই আমি মনে করছি আমার আপনার জন। কিন্তু আপনি যতটা আমার নিকট, ততটা দূর।

জুলাইখার কথা নায়ীমের অন্তরকে অভিভূত করলো। তার দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠলো। তিনি বললেন– জুলাইখা! যদি তুমি আমাকে আপনার করে নিতে চাও তাহলে তার একটাই পথ রয়েছে।

জুলাইখার বিষণ্ন মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে ওঠলো। হতাশার অন্ধকারে বিশীর্ণ ফুলের বুকে এনে দিলো আশার আলো, নতুন সজীবতা। অস্থির বেকারার হয়ে সে বললো– বলুন, কোন সে পথ?

: জুলাইখা! আমার প্রভুর গোলামী কবুল কর। তাহলে তোমার আমার মাঝখানে কোনো দূরত্ব থাকবে না।

: আমি তৈরি। কিন্তু আপনার প্রভু আমায় গ্রহণ করবেন কি?

: হ্যাঁ, তিনি বড়ই কৃপাময়।

: কিন্তু আমি তো কয়েক লহমার জন্যই মাত্র জীবিত থাকব।

: তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন নেই। জুলাইখা, বল...

অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে জুলাইখা বললো– কি বলবো?

নায়ীম কালেমা শাহাদাত পড়লেন আর জুলাইখা তার সাথে সাথে তা আবৃত্তি করলো। জুলাইখা আর একবার পানি চাইলো এবং তা পান করে বললো– আমি অনুভব করছি, যেনো আমার অন্তর থেকে এক বোঝা নেমে গেছে।

নায়ীম বললেন– এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূর রয়েছে ফৌজি চৌকি। তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারলে তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারতাম। এ অবস্থায় তোমার ঘোড়ার ওপর বসাও সম্ভব নয়। তাই আমাকে কিছুক্ষণের জন্য এজাযত দাও। খুব শিগগিরই আমি ওখান থেকে সিপাহী ডেকে আনবো। হয় তো ওরা আশপাশের বস্তি থেকে কোন হাকিম খুঁজে আনাতে পারবে।

নায়ীম জুলাইখার মাথা জমিনের ওপর রেখে ওঠছিলেন। কিন্তু দুর্বল হাত দিয়ে সে নায়ীমের জামা ধরে কেঁদে বললো– আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি কোথাও

যাবেন না। ফিরে এসে আপনি আমায় জীবিত পাবেন না। মৃত্যুর সময় আমি আপনার কাছ-ছাড়া হতে চাই না।

নায়ীম জুলাইখার বেদনাতুর কণ্ঠের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি আবার বসে পড়লেন তার পাশে। জুলাইখা আশ্বস্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলো। বহুক্ষণ সে পড়ে রইলো নিশ্চল। কখনও কখনও সে চোখ খুলে তাকাচ্ছে নায়ীমের মুখের দিকে। রাতের তৃতীয় প্রহর কেটে গেছে। ভোরের আভা দেখা যাচ্ছে। জুলাইখার দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিসাড় হয়ে এসেছে, আর বহু কষ্টে সে শ্বাস টানছে।

নায়ীম বেকারার হয়ে ডাকলেন– জুলাইখা!

জুলাইখা শেষ বারের মতো চোখ খুলে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়লো চিরকালের মতো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন– বলে নায়ীম মাথা নত করলেন। অলক্ষ্যে তার চোখ থেকে নেমে এলো অশ্রুর বন্যা। সে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো জুলাইখার মুখের ওপর। জুলাইখার নির্বাক মুখ যেন বলে যাচ্ছে– হে পবিত্র আত্মা! তোমার অশ্রুর মূল্য আমি আদায় করে গেলাম।

নায়ীম ওঠে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং নিকটের চৌকিতে পৌঁছে কয়েকজন সিপাহীকে ডেকে আনলেন। আশপাশের বস্তি থেকেও কতক লোক এসে জমা হলো সেখানে। নায়ীম জানাযার নামায পড়িয়ে জুলাইখা ও তার সঙ্গীদের দাফন করে চললেন তার বাড়ির পথে।

৮

রাতের বেলা নায়ীম বিস্তীর্ণ এক মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন। জুলাইখার মৃত্যুশোক, সফরের ক্লান্তি, আরও নানা রকমের পেরেশানির ফলে কেমন যেন উদাস মন নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন মঞ্জিলে মাকসুদের দিকে। জনহীন প্রান্তরে মাঝে মধ্যে শোনা যায় নেকড়ে ও শিয়ালের আওয়াজ। তারপরই আবার নিস্তব্ধ-নিঝুম। কিছুক্ষণ পর পূর্বদিগন্তে দেখা দিলো শুক্লপক্ষের চাঁদ। অন্ধকার পর্দা গেলো ছিন্ন হয়ে, নিষ্প্রভ হয়ে এলো সেতারার দীপ্তি। বাড়তি আলোয় নায়ীমের নজরে পড়তে লাগলো দূরের টিলা পাহাড়, বন-ঝাড় আর গাছপালা। লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে গেছেন তিনি। তার বস্তির আশপাশের বাগবাগিচার অস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠছে তার চোখে। তার রঙিন স্বপ্নের কেন্দ্রভূমি যে বস্তি, যে বস্তির প্রতি ধূলিকণার সাথে রয়েছে তার হৃদয়ের সম্পর্ক, সে বস্তি এখন তার কত কাছে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তিনি সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন, তবুও তার কল্পনা বার বার সেখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বহু ক্রোশ দূরে জুলাইখার শেষ বিরামভূমির দিকে। জুলাইখার মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য বার বার ভেসে ওঠছে তার চোখের সামনে। তার শেষ কথাগুলো গুঞ্জন করে যাচ্ছে তার কানে। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলে যেতে চান সে মর্মান্তিক কাহিনী। অথচ তাঁর হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছে যেন সমগ্র সৃষ্টি সেই নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ ও অশ্রুধারায় বেদনাকাতর।

নিজের ঘরের হাজারও আশঙ্কা তাকে উতলা করে তুলেছে। তিনি তার জিন্দেগীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার হৃদয়ের নওজোয়ানসুলভ উৎসাহ-উদ্যম আর উদ্দীপনার চিহ্ন নেই। অতীত জিন্দেগীতে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কখনও তিনি এমনি ঢিলেঢালা হয়ে বসেননি। চিন্তার ভারে তিনি যেনো পিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ বস্তির দিক থেকে তার কানে একটা আওয়াজ এলো। তিনি চমকে ওঠে শুনতে লাগলেন সে আওয়াজ। বস্তির মেয়েরা দফ বাজিয়ে গান গাইছে। শাদী উপলক্ষে আরব নারীরা যে সাদাসিধা গান গাইতো, এ সেই গান। নায়ীমের হৃদ-স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগলো। তার মন চায়, উড়ে ঘরে চলে যেতে, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তার ক্রমবর্ধমান উদ্যম যেনো উবে যায়। তিনি সেই ঘরের চার দেয়ালের কাছে এসে গেলেন, যেখান থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ। এ যে তারই আপন ঘর। খোলা দরজার সামনে গিয়ে তিনি ঘোড়া থামালেন। কিন্তু কি যেনো মনে করে আর এগুতে পারলেন না তিনি।

আঙিনার ভেতরে মশাল জ্বলছে। বস্তির লোক খানাপিনায় মশগুল। মেয়েরা জমা হয়েছে ছাদের ওপর। মেহমানদের সমবেত হবার কারণ তিনি চিন্তা করতে লাগলেন আপন মনে। তার মনে হলো, বুঝি আল্লাহ তায়ালা আযরার কিসমতের ফয়সালা করে ফেলেছেন। মনের উদাস চিন্তা-ভাবনা তাকে এমন অভিভূত করলো, ঘরের জান্নাত আজ তার কাছে মনে হচ্ছে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি। নীচে নেমে ঘর থেকে কয়েক কদম দূরে তিনি ঘোড়া বাঁধলেন এক গাছের সঙ্গে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন গাছের ছায়ায়।

বস্তির একটি ছেলে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। নায়ীম এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে জিজ্ঞেস করলেন– এখানে কিসের দাওয়াত?

বালক চমকে ওঠে নায়ীমের দিকে তাকালো। কিন্তু গাছের ছায়া আর নায়ীমের মুখের অর্ধেকটা লৌহ শিরস্ত্রাণে ঢাকা বলে সে চিনতে পারলো না তাকে। সে জবাবে বললো– শাদী হচ্ছে এখানে।

: কার শাদী?

: আবদুল্লাহর শাদী হচ্ছে। আপনি বোধহয় বিদেশী। চলুন, আপনি এ দাওয়াতে শরীক হবেন। কথাটা বলেই বালক চলে যাচ্ছিল, কিন্তু নায়ীম বাজু ধরে তাকে থামালেন। বালক পেরেশান হয়ে বললো– আমায় ছেড়ে দিন। আমি কাজীকে ডাকতে যাচ্ছি। যদিও নায়ীমের এ প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছে, তবুও তার অন্তরের প্রেম ব্যর্থতা ও হতাশার শেষ দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও আশা ছাড়লো না। তিনি কম্পিত আওয়াজে প্রশ্ন করলেন– আবদুল্লাহর শাদী হবে কার সঙ্গে?

বালক জবাব দিলো– আযরার সঙ্গে।

: আবদুল্লাহর মা কেমন আছেন? শুকনো গলার ওপর হাত রেখে প্রশ্ন করলেন

নায়ীম।

: আবদুল্লাহর মা? তিনি তো ইন্তেকাল করেছেন তিন চার মাস আগেই।

বলেই বালক ছুটে চললো।

নায়ীম গাছটি ধরে দাঁড়ালেন। মায়ের শোক তার অন্তর তোলপাড় করে তুললো। তার চোখে নামলো অশ্রুর দরিয়া। কিছুক্ষণ পর সেই বালক কাজীকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। এ সময় নায়ীমের অন্তরে দুটি পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠলো। এখনও তাকদির তার হাতের নাগালের ভেতরে। আযরা তার কাছ থেকে দূরে নয়। তার জীবিত ফিরে আসার খবর জানলে আবদুল্লাহ তার জিন্দেগীর সর্বস্ব কুরবান করেও তার অন্তরের ভেঙ্গে পড়া বস্তি আবাদ করে দিবেন মনের খুশিতে। এখনও সময় আছে।

তার বিবেক আবার দ্বিতীয় আওয়াজ তুললো– এ-ই তো তোমার ত্যাগ ও সবরের পরীক্ষা। আযরার প্রতি তোমার ভাইয়ের মহব্বত তো কম নয়, আর কুদরতের মনযুরও এই, আযরা আর আবদুল্লাহ এক হয়ে থাকবেন। আত্মত্যাগী ভাই তোমার জন্য নিজের খুশি কুরবান করতে তৈরি হবেন, কিন্তু তা হবে জুলুম। যদি তুমি আবদুল্লাহর কাছে সেই কুরবানী দাবি কর, তাহলে তোমার আত্মা কখনও সন্তোষ লাভ করবে না। সিন্ধুর উপকূল পর্যন্ত তোমার সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি শাদী করছেন আযরাকে। তুমি বাহাদুর, তুমি মুজাহিদ, সংযত হয়ে থাক। আযরার জন্য চিন্তা করো না। সময় ধীরে ধীরে তার অন্তর থেকে মুছে ফেলবে তোমার স্মৃতির বেদনা। আর এমন কোন্ গুণ রয়েছে তোমার যা আবদুল্লাহর ভেতর নেই?

বিবেকের দ্বিতীয় আওয়াজই নায়ীমের কাছে ভালো লাগলো। তিনি অনুভব করলেন, যেন তার মন থেকে এক অসহনীয় বোঝা নেমে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নায়ীমের চোখে তার পৃথিবী বদলে গেলো।

ঘরে যখন আবদুল্লাহ ও আযরার শাদী পড়ানো হচ্ছে, নায়ীম তখন বাইরে গাছের নীচে সিজদায় মাথা নত করে দোয়া করছেন– দীন-দুনিয়ার মালিক! এ শাদীতে বরকত দাও। আযরা ও আবদুল্লাহর সারা জীবন খুশি-আনন্দে অতিবাহিত হোক। একে অপরের জন্য তাদের জীবন অন্তর উৎসর্গিত হোক। সত্যিকার জীবন মরণের মালিক! আমার হিসসার তামাম খুশি তুমি ওদের দাও।

অনেকক্ষণ পর নায়ীম যখন সিজদা থেকে মাথা তুললেন, মেহমানরা তখন চলে গেছে। মন চাইলো তিনি ছুটে গিয়ে ভাইকে মোবারকবাদ দিয়ে আসেন।

কিন্তু আর একটি চিন্তা তাকে বাধা দিলো। তিনি ভাববেন, ভাই তাকে দেখে খুশি হবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু লজ্জাও হয় তো পাবেন। তিনি যে জীবিত রয়েছেন তা তো আযরার কাছে প্রকাশ করা চলে না। তার ফিরে আসা সম্পর্কে হতাশ হয়ে আযরা এতদিনে যে সবর ও স্থিরতা লাভ করেছেন তা যে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তিনি মরে গেছেন মনে করে যদি তারা শাদী করে থাকেন, তাহলে আযরার তামাম জিন্দেগী হবে অশান্তিপূর্ণ। তাকে দেখে তিনি লজ্জায় মরে যাবেন। আযরার পুরনো ক্ষত আবার তাজা হয়ে ওঠবে। তার চাইতে ভালো তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। তার দুর্ভাগ্যে শরীক করবেন না তাদের। তার বিবেক এ চিন্তায় সায় দিলো। মুহূর্ত মধ্যে মুজাহিদদের অন্তরে জাগলো সুদৃঢ় প্রত্যয়। নায়ীম ফিরে চলার আগে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন ঘরের দিকে; তারপর বেদনাতুর দৃষ্টি মেলে তাকালেন তার আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ সমাধির দিকে। ফিরে চলার উপক্রম করতেই আঙিনায় কার পায়ের আওয়াজ এলো তার কানে। তার মনোযোগ নিজের দিকে নিবদ্ধ হলো। আবদুল্লাহ ও আযরা কামরা থেকে বেরিয়ে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহকে লেবাসের বদলে বর্ম পরিহিত ও আযরাকে তাঁর কোমরে তলোয়ার বেঁধে দিতে দেখে তিনি হয়রান হয়ে দাঁড়ালেন দরজার আড়ালে। তখ্খুনি তিনি বুঝলেন, আবদুল্লাহ জেহাদে যাচ্ছেন। এতে নায়ীমের হয়রান হবার কিছু নেই। এ প্রত্যাশাই তিনি করেছেন ভাইয়ের কাছে।

আবদুল্লাহ হাতিয়ার পরিধান করে আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আবার দাঁড়ালেন আযরার সামনে।

: আযরা! তুমি দুঃখ পাওনি তো? আবদুল্লাহ হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

আযরা মাথা নেড়ে জবাব দিলেন– না, আমারও তো মন চায় এমনি করে বর্ম পরে ময়দানে যেতে।

: আযরা! আমি জানি, বাহাদুর তুমি, কিন্তু আজ সারাদিন আমি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমি বুঝি, তোমার মনের ওপর আজও এক বোঝা চেপে রয়েছে, যা তুমি আমার কাছে গোপন করতে যাচ্ছো। নায়ীম যে ভুলে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব নয়, তা আমার জানা আছে। আযরা! আমরা সবাই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছি আর তাঁরই কাছে ফিরে যাবো আমরা। সে জীবিত থাকলে অবশ্যই ফিরে আসতো। সে আমার কম প্রিয় ছিলো, এমন কথা মনে

করো না তুমি। আজও যদি আমার জান কুরবান করে দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে হাসিমুখে আমি জানবাজি রাখতাম। হায়! তুমি ভাবতে পারো, এ দুনিয়ায় আমিও কত একা? আমার মা ও নায়ীম চলে যাবার পর এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। আমরা চেষ্টা করলে একে অপরকে খুশি রাখতে পারি।

আযরা জবাব দিলেন– আমি চেষ্টা করবো।

: আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। কেননা স্পেনে আমার তেমন কোনো বিপজ্জনক অভিযানে যেতে হবে না। সে দেশ প্রায় বিজিত হয়েই গেছে। কয়েকটি এলাকা বাকি রয়েছে মাত্র। তাদেরও মোকাবেলা করার শক্তি অবশিষ্ট নেই। শিগগিরই ফিরে এসে আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যাবো। খুব বেশি হলে আমার ছ'মাস লাগবে।

আবদুল্লাহ 'আল্লাহ হাফেজ' বলে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। নায়ীম তাকে বাইরে আসতে দেখে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন এক খেজুর কুঞ্জের আড়ালে।

দরজার বাইরে এসে আবদুল্লাহ আযরার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে ঘোড়া হাঁকালেন দূর বিদেশের পথে।

* * *

ভোরের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন গন্তব্য পথে। পেছন থেকে আর একটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ তার কানে এলো। তিনি ফিরে দেখলেন, এক সওয়ার আরও জোরে ছুটে আসছেন সেই পথে। আবদুল্লাহ ঘোড়া থামিয়ে পেছনের সওয়ারকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। পেছনের সওয়ারের মুখ লৌহ শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা। আবদুল্লাহর মনে উদ্বেগ জাগলো। তিনি হাতের ইশারায় থামাতে চাইলেন তাকে, কিন্তু আবদুল্লাহর ইশারার পরোয়া না করে তিনি যথারীতি ছুটে চললেন তাকে ছাড়িয়ে। আবদুল্লাহর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেলো। তিনি পিছু পিছু ঘোড়া ছুটালেন। আবদুল্লাহর তাজাদম ঘোড়া। অপর ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার মনে হলেও তিনি বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলেন না। তার ঘোড়ার মুখে তখন ফুটে ওঠেছে ক্লান্তির চিহ্ন। আবদুল্লাহ কাছে এসে নেযা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন– তুমি দোস্ত হলে দাঁড়িয়ে যাও, আর দুশমন হলে মোকাবেলার জন্য তৈরি হও।

দ্বিতীয় সওয়ার ঘোড়া থামালেন।

: আমায় মাফ করুন। আবদুল্লাহ বললেন– আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি কে? আমার এক ভাই বিলকুল আপনারই মতো ঘোড়ার ওপর বসতো আর ঠিক আপনারই মতো ঘোড়ার বাগ ধরতো। তার দেহও ছিল ঠিক আপনারই মতো। আমি আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি?

সওয়ার নীরব।

: আপনি কথা বলতে চান না...? আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার নাম কি...? আপনি বলবেন না?

সওয়ার এবারও নীরব হয়ে রইলেন।

: মাফ করবেন, যদি মনোকষ্টের কারণে আপনি কথা না বলতে চান, তাহলে কমপক্ষে আপনার চেহারা দেখাতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত হবে না। কোনো দেশের গুপ্তচর হলেও আমি আপনাকে না দেখে আজ যেতে দেবো না।

এ কথা বলে আবদুল্লাহ তার ঘোড়া আগন্তুকের ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেলেন এবং আচানক নেযার মাথা দিয়ে তার শিরস্ত্রাণ তুলে ফেললেন। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে আবদুল্লাহর মুখ থেকে 'নায়ীম' বলে এক হালকা চিৎকার-ধ্বনি বেরিয়ে এলো। আর নায়ীমের চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা।

দু'ভাই ঘোড়া থেকে নেমে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

: ভারী বেওকুফ হয়েছো তুমি! আবদুল্লাহ নায়ীমের পেশানীর ওপর হাত বুলিয়ে বললেন– বদবখত! এতটা আত্মাভিমান? আর এ তো আত্মাভিমানও নয়। তোমার কিছুটা বুদ্ধি থাকা উচিত ছিলো। আর এও তো ভাবা উচিত ছিলো, তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমার ভাই তোমার সন্ধান করে বেরিয়েছে সারা দুনিয়ায়। আর আযরাও বস্তির উঁচু টিলায় চড়ে তোমার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর পরোয়া করলে না তুমি? আল্লাহ জানেন, কোথায় লুকিয়ে ছিলে এতকাল। এ তুমি কি করলে?

নায়ীম কোনো জবাব না দিয়ে ভাইয়ের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্তরের কথাগুলো ফুটে বেরোচ্ছে তার চোখ দিয়ে। আবদুল্লাহ তার নীরবতায় অভিভূত হয়ে নায়ীমকে আর একবার বুকে চেপে ধরে বললেন– কথা বলছো না কেন তুমি? আমার ওপর তোমার এতটা বিদ্বেষ, মুখ ঢেকে চলে যাচ্ছিলে

আমার পাশ দিয়ে! কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যাচ্ছো তুমি? আমি সিন্ধুতে তোমার খোঁজ করে কোন সন্ধান পাইনি। কেন তুমি ঘরে এলে না?

নায়ীম একটা ঠাণ্ডা শ্বাস ফেলে বললেন– ভাইয়া! আমার ঘরে ফিরে আসা আল্লাহ তায়ালার মনযুর ছিলো না।

আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন– কোথায় ছিলে তুমি?

এ প্রশ্নের জবাবে নায়ীম তার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। কেবল বললেন না জুলাইখার কথা। আরও বললেন– আগের রাতে তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

নায়ীমের কথা শেষ হলে দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন– কয়েদ থেকে মুক্তি পেয়েও তুমি ঘরে এলে না কেন?

নায়ীমের মুখে জবাব নেই, নির্বাক হয়ে রইলেন।

আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন– এখন ঘরে না গিয়ে কোথায় চলেছো?

: ভাইয়া! আমি ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করার জন্য বসরা থেকে কিছু সিপাহী আনতে যাচ্ছি।

আবদুল্লাহ বললেন– আমি তোমায় একটি কথা জিজ্ঞেস করবো, আশা করি তুমি মিথ্যে বলবে না!

: জিজ্ঞেস করুন।

: তুমি বল, কয়েদ থেকে মুক্তি পাবার পর কেউ কী তোমায় বলেছিলো, আযরার শাদী হতে চলেছে?

নায়ীম মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালেন।

: এখন তুমি জানতে পেরেছ আযরার শাদী আমার সাথে হয়েছে?

: জি হ্যাঁ। আমি আপনাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।

আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন– তুমি বস্তি হয়ে এসেছো?

নায়ীম জবাব দিলেন– হ্যাঁ।

: ঘরে গিয়েছিলে?

: না।

: কেন?

নায়ীম নির্বাক হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ বললেন– আমি জানি, তোমার ওপর আমি জুলুম করেছি মনে করে তুমি ঘরে যাওনি।

: আপনার ধারণা ভুল। আপনার ও আযরার ওপর জুলুম করতে চাইনি বলেই আমি ঘরে ফিরে যাইনি। আমি জানি, আপনি আমার ফিরে আসা সম্পর্কে হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন, আযরা দুনিয়ায় একা, আর আপনাকে তার প্রয়োজন। আমি আর একবার ঘরে ফিরে পুরনো জখমগুলো তাজা করে দিয়ে আযরার জিন্দেগী তিক্ত বিস্বাদ করে দিতে চাইনি। প্রকৃতির ইশারা বার বার আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, আযরা আমার জন্য নয়। তাকদির আপনাকেই সে আমানতের মোহাফেয মনোনীত করে দিয়েছে। আমি তাকদিরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই না। আযরা আপনাকে আর আপনি আযরাকে খুশি রাখতে পারবেন, এ বিশ্বাস আছে বলেই আমি খুশি হয়েছি। আপনাদের উভয়ের খুশির চাইতে বড় আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। আপনি আমার ও আযরার একটা উপকার করবেন। আযরার অন্তরে এ খেয়াল কখনও আসতে দেবেন না, আমি জীবিত আছি। আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে, এ কথা ওকে বলবেন না কোনোদিন।

: নায়ীম! আমার কাছে কি গোপন করতে চাও? এ তো এমন কোন রহস্য নয়, যা আমি বুঝতে পারি না। তোমার চোখ, তোমার মুখভাব, তোমার চেহারা, তোমার কথা, তোমার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করছে, তুমি এক কঠোর বোঝার চাপে পিষ্ট হচ্ছো। আযরা শুধু আমার মন রাখার জন্য এ কুরবানী করেছে এবং তাও এ খেয়ালে, সম্ভবত...।

: সম্ভবত আমি মরে গেছি। নায়ীম আবদুল্লাহর অসমাপ্ত কথা পূরণ করে দিলেন।

: ওহ্! নায়ীম, তুমি আমায় আর শরম দিও না। আমি তোমায় বহু তালাশ করেছি, কিন্তু...!

নায়ীম আবদুল্লাহর কথায় বাধা দিয়ে বললেন– আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এ রকমই ছিলো।

: নায়ীম! নায়ীম! তুমি কি মনে করেছো, আমি...। আবদুল্লাহ আর কিছু বলতে পারলেন না। তার চোখ দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠলো। তিনি ভাইয়ের সামনে এক বে-গুনাহ আসামীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

নায়ীম বললেন– ভাইয়া! একটা মামুলি কথার ওপর কেন এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন আপনি?

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন– হায়! এ যদি সত্যি সত্যি মামুলি কথা হতো! এ ছিলো আম্মির নির্দেশ, আযরাকে যেন একা ছেড়ে না দিই? কিন্তু সে তোমায় আজও ভোলেনি। সে তোমারই। তোমার ও আযরার খুশির জন্য আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। তোমাদের দু'জনের ভেঙে যাওয়া ঘর আবার আবাদ করে দিয়ে আমি যে কি সন্তোষ লাভ করবো, তা আমিই জানি।

: ভাইয়া! আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কথা বলবেন না। এমন কিছু বললে আমাদের তিন জনের জিন্দেগীই তিক্ত-বিস্বাদ হয়ে যাবে। আমার নিজের চোখে আমি ছোট হয়ে যাবো। আমাদের উচিত তাকদিরের ওপর শুকরগুজারী করা।

: কিন্তু আমার বিবেক আমাকে কি বলবে?

নায়ীম তার মুখের ওপর এক আশ্বাসের হাসি টেনে এনে বললেন– আপনার শাদীতে আমার মর্জিও শামিল ছিলো।

: তোমার মর্জি? তা কি করে?

: কাল রাতে আমি সেখানেই ছিলাম।

: কোন সময়?

: আপনার নিকাহ হবার খানিকক্ষণ আগে থেকেই আমি বাড়ির বাইরে থেকে সব অবস্থা জেনেছিলাম।

: ঘরে কেন গেলে না?

নায়ীম নির্বাক হয়ে থাকলেন।

: এ জন্যে যে, তুমি তোমার স্বার্থপর ভাইয়ের মুখ দেখতে চাওনি!

: না, সে জন্যে নয়। আল্লাহর কসম, সে জন্যে নয়। বরং আমি আমার বেগরজ ভাইয়ের সামনে নিজের স্বার্থপরতা দেখাতে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করেছি। আপনারই শেখানো একটি সবক আমার অন্তরে আঁকা ছিলো।

: আমার সবক!

: আমাকে আপনি সবক দিয়েছিলেন, যে আকর্ষণ ত্যাগের মনোভাব বর্জিত, তা মহব্বত বলা যায় না।

: আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, তোমার ভেতর এ ইনকিলাব কি করে এলো! সত্যি করে বলো তো, আর কারও কল্পনা তোমার অন্তরে আযরার জায়গা তো দখল করেনি? আমার মনে এ সন্দেহ জাগেনি কখনও, তবুও গোড়ার দিকে

৮-

আযরা আম্মির কাছে এমনই সন্দেহ প্রকাশ করতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, জেহাদের এক অসাধারণ মনোভাব তোমায় টেনে নিয়ে গেছে সিন্ধুর পথে, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ জেগেছে, তুমি জেনে শুনে হয় তো শাদী এড়িয়ে চলেছো। তোমার ঘরে ফিরে না আসার কারণ যদি তাই হয়, তবে তুমি ভালো করনি।

নায়ীম নির্বাক। কি জবাব দেবেন, তা তিনি জানেন না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠলো ছেলেবেলার একটি ঘটনা। যেদিন তিনি আযরাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেদিন আবদুল্লাহ তারই জন্য না-করা অপরাধের বোঝা কাঁধে নিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিলেন সাজা থেকে। তিনিও আজ এক না-করা অপরাধ স্বীকার করে ভাইয়ের মনে এনে দিতে পারেন সন্তোষ।

নায়ীমের নীরবতায় আবদুল্লাহর মনের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হলো। তিনি নায়ীমের বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন– বল নায়ীম!

নায়ীম চমকে ওঠে আবদুল্লাহর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হেসে বললেন– হ্যাঁ, ভাইয়া! আমি অন্তরে আর একজনকে জায়গা দিয়ে ফেলেছি।

আবদুল্লাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– এখন বল, তাকে তুমি শাদী করেছ কি না?

: না।

: কেন, এর মধ্যে কোন মুশকিল রয়েছে কি?

: না।

: শাদী কবে করবে?

: শিগগিরই।

: ঘরে কবে ফিরে যাবে?

: ইবনে সাদেকের গ্রেফতারির পর।

: আচ্ছা, আমি তোমাকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবো না। খুব শিগগিরই আমার আন্দালুস পৌঁছে যাবার হুকুম না হলে আমি তোমার শাদী দেখে যেতে পারতাম। ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এ প্রত্যাশা করতে পারি, তুমি ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করার পর ঘরে ফিরে আসবে?

: ইনশাআল্লাহ!

দু'ভাই পাশাপাশি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। নায়ীম প্রকাশ্যে আবদুল্লাহকে

আশ্বাস দিলেও তার অন্তর কাঁপছে তখনও। আবদুল্লাহর উপর্যুপরি প্রশ্নের আঘাতে তিনি ঘাবড়ে ওঠেছেন। তামাম রাস্তায় তিনি ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলেন আন্দালুস সম্পর্কে। প্রায় দু'ক্রোশ পথ চলার পর এক চৌরাস্তায় এসে দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। তাঁর কাছে এসে নায়ীম মোসাফাহার জন্য আবদুল্লাহর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এজাযত চাইলেন।

আবদুল্লাহ নায়ীমের হাত নিজের হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলেন– নায়ীম! যা কিছু তুমি আমায় বললে, সব সত্য, না আমার মন রাখার জন্য এসব কথা বললে?

: আমার ওপর আপনার বিশ্বাস নেই?

: আমার বিশ্বাস আছে তোমার ওপর।

: আচ্ছা, আল্লাহ হাফেয।

আবদুল্লাহ নায়ীমের হাত ছেড়ে দিলেন। নায়ীম মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দ্রুত ঘোড়া ছুটালেন। যতক্ষণ না নায়ীমের ঘোড়া তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো, ততক্ষণ আবদুল্লাহ নায়ীমের কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। নায়ীম তার নজরের বাইরে চলে গেলে তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন– ওগো দীন দুনিয়ার মালিক! আযরা আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে, এ যদি হয় তোমার মনযুর, তা হলে তাকদিরের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। ওগো মাওলা! নায়ীম যা কিছু বললো, তা যেনো সত্য হয়। আর যদি তা সত্য নাও হয়ে থাকে তুমি তাকে সত্য করে দেখাও। তার প্রেমিকা যেন এমন কেউ হয়, যাকে নিয়ে সে ভুলে যেতে পারে আযরাকে। ওগো রহীম! ওর অন্তরের ভেঙ্গে পড়া বস্তি আবার আবাদ করে দাও। আমার কোনও নেকী যদি তোমার রহমতের হকদার হয়ে থাকে, তা হলে তার বদলায় তুমি নায়ীমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি দান করো।

নায়ীমের বসরায় পৌঁছার আগেই ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছিলো। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। নায়ীম বসরার গভর্নরের সাথে মোলাকাত করলেন। তাকে নিজের অতীত দিনের কাহিনী শুনিয়ে তিনি আবার সিন্ধুতে ফিরে যাবার ইরাদা জানালেন।

নায়ীম জীবিত ফিরে আসায় বসরার গভর্নর আনন্দ প্রকাশ করে বললেন– সিন্ধু বিজয়ের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ বিন কাসেমই যথেষ্ট। তিনি ঝড়ের মতো রাজা মহারাজাদের পঙ্গপালের মতো অগুণতি সেনাদলকে দলিত করে সিন্ধুর সর্বত্র ইসলামী পতাকা উড্ডীন করছেন। এখন তুর্কিস্তানের বিরাট মুলুক পূর্ণ বিজয়ের জন্য চাই নিপুণ যোদ্ধা। কুতায়বা বোখারার ওপর হামলা করেছেন,

কিন্তু সফল হতে পারেননি। কুফা ও বসরা থেকে প্রচুর ফৌজ চলে যাচ্ছে। পরন্তু এখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে পাঁচশ' সিপাহী। চেষ্টা করলে আপনি রাস্তায় তাদের সাথে মিলিত হতে পারবেন। মুহাম্মদ বিন কাসেম নিঃসন্দেহে আপনার দোস্ত, কিন্তু কুতায়বা বিন মুসলিমের মতো বাহাদুর সিপাহসালারের গুণগ্রহিতাও মশহুর হয়েছে সর্বত্র। তিনি কদর করবেন আপনাকে। আমি তার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

নায়ীম বেপরোয়া হয়ে জবাব দিলেন– কেউ আমার কদর করবে, সে জন্য তো আমি জেহাদে আসিনি। আমার মাকসুদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলা। আমি আজই এখান থেকে রওয়ানা দিচ্ছি। আপনি ইবনে সাদেকের বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। তার অস্তিত্বই দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনক।

: তা আমি জানি। আমি তাকে খতম করার সব রকম চেষ্টাই করছি। দরবারে খেলাফত থেকে তার গ্রেফতারির হুকুম জারি হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমরা তার সন্ধান পাইনি। তার সম্পর্কে আপনিও হুশিয়ার থাকবেন। হতে পারে, সে হয় তো তুর্কিস্তানের দিকেই পালিয়ে গেছে।

নায়ীম বসরা থেকে বিদায় নিলেন। জিন্দেগীর অগুণতি বিপদের ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে, কিন্তু মুজাহিদের ঘোড়ার গতি আর আকাঙ্ক্ষা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৯

মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধুর ওপর হামলা করার কিছু আগে কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলী জায়হুন নদী পার হয়ে তুর্কিস্তানের কয়েকটি প্রদেশের ওপর হামলা করেন এবং কয়েকটি বিজয়ের পর কতকটা ফৌজ ও রসদের অভাবে এবং কতকটা শীতের আতিশয্যে মারভে ফিরে আসেন। গরমের মওসুম এলে তিনি আবার ছোটখাটো ফৌজ নিয়ে জায়হুন নদী পার হয়ে আরও কয়েকটি এলাকা জয় করেন।

কুতায়বা বিন মুসলিম প্রতি বছর গরমের মওসুমে জয় করে নিতেন তুর্কিস্তানের কোনো কোনো অংশ এবং শীতের মওসুমে মারভে ফিরে আসতেন। হিজরী ৮৭ সালে তিনি বেকান্দ নামক তুর্কিস্তানের এক মশহুর শহরের উপর হামলা করেন। হাজার হাজার তুর্কিস্তানী এসে জমা হলো শহর হেফাজত করতে। ফৌজ ও রসদের অভাব সত্ত্বেও কুতায়বা আত্মবিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা সহকারে শহর অবরোধ করে রাখলেন। দু'মাস পর শহরবাসীদের উদ্যম আর রইলো না। শেষ পর্যন্ত তারা হাতিয়ার সমর্পণ করে।

বেকান্দ জয়ের পর কুতায়বা তুর্কিস্তান জয়ের জন্য রীতিমতো হামলা চালিয়ে যেতে লাগলেন। হিজরী ৮৮ সালে সুনদের এক শক্তিশালী ফৌজের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে কুতায়বা তুর্কিস্তানের আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করে বোখারার চার দেয়াল পর্যন্ত এসে পৌঁছান। শীতের মওসুমে সামরিক সরঞ্জামহীন ফৌজ বেশি সময় অবরোধ চালিয়ে যেতে পারলো না। কুতায়বা সেখান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরলেন। কিন্তু হিম্মত হারালেন না। কয়েক মাস পরই তিনি আবার বোখারা অবরোধ করেন। এ অবরোধ চলার সময় বসরার পাঁচশ' সওয়ার সাথে নিয়ে নায়ীম

কুতায়বার সাথে এসে যোগ দেন। কয়েক দিনেই তিনি বাহাদুর ও সমরকুশলী সিপাহসালারের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যান। বোখারা অবরোধের মাঝখানে কুতায়বার সামনে এক কঠিন বিপদ এলো।

কেন্দ্র থেকে দূরে এসে পড়াই ছিলো তাঁর অসুবিধার বড় কারণ। এখানে প্রয়োজনের সময় ফৌজ ও রসদ-সাহায্য ঠিক সময়মতো পৌছানো মোটেই সহজ ছিলো না। বোখারার বাদশাহর সাহায্যের জন্য সমবেত হলো তুর্কি ও অন্যান্য দলের বেশুমার ফৌজ। মুসলিম বাহিনী মিনজানিকের সাহায্যে শহরের পাঁচিলের উপর পাথর ছুঁড়ছিলো এবং শেষ হামলার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। ইতোমধ্যে পেছন থেকে তুর্কীদের এক শক্তিশালী ফৌজ আসতে দেখা গেলো। মুসলিম বাহিনী শহরের খেয়াল ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে আগত ফৌজের দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু তারা মজবুত হয়ে দাঁড়াবার আগেই শহরের বাসিন্দারা বেরিয়ে এসে তাদের উপর হামলা করে। মুসলিম বাহিনী উভয় ফৌজের ঘেরাওয়ের মধ্যে এসে পড়ে। একদিক দিয়ে বাইরের হামলা মাথার ওপর এসে গেছে, অপর দিকে শহরে অবস্থিত সেনারা তীর বর্ষণ করছে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভয়-ভীতি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম সিপাহীরা যখন পিছপা হচ্ছে, তখন আরব নারীরা বাধা দিয়ে তাদের ভেতরে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করলো। মুসলিম সেনারা আবার জীবনপণ লড়াই শুরু করলো। কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা নগণ্য। তুর্কীরা দু'দিক দিয়ে মুসলিম বাহিনীর মাঝখানে এসে প্রায় মহিলাদের খিমায় পৌছে যাবার উপক্রম করছিলো। তখন আরব যোদ্ধারা আরও একবার জিন্দা করে তোলে তাদের পূর্বপুরুষের শৌর্যবীর্য ঐতিহ্য। তারা ওঠতে ওঠতে পড়ছে, আবার পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছে। এমনি করে তারা নতুন করে জাগিয়ে তুলছে কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের স্মৃতি। দুশমনের দুরন্ত ঝড়ের ওপর জয়ী হবার জন্য কুতায়বা মনে মনে এক কৌশল স্থির করলেন। ফৌজের কতক অংশ সরিয়ে নিয়ে অপর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হবে, অথচ মাঝখানে রয়েছে এক গভীর নদী। শহর হেফাজতের জন্য তা খন্দকের কাজ করছে। কুতায়বা যখন এ কৌশল চিন্তা করছেন তখন নায়ীম ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন তার কাছে। তিনিও একই পরামর্শ দিলেন।

কুতায়বা বললেন– আমিও এ কৌশলই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু কে এ কুরবানীর জন্য তৈরি হবে?

নায়ীম বললেন– আমাকে কিছু সিপাহী দিন। আমি যাচ্ছি।

কুতায়বা হাত প্রসারিত করে বললেন– এমন যোদ্ধা কে আছে, যে এ নওজোয়ানের সাথে যেতে রাজি?

এ প্রশ্ন শুনে ওয়াকি ও হারিম নামে দু'জন তমিমী সরদার হাত প্রসারিত করে সম্মতি জানালো। তাদের সাথে শামিল হলো তাদের জামায়াতের আটশ' যোদ্ধা। নায়ীম সেই জীবনপণকারী যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে বিপক্ষ বাহিনীর সারি ভেদ করে বেরিয়ে গেলেন ময়দানের বাইরে। তারপর একটা লম্বা পথ ঘুরে গিয়ে তারা পৌঁছলেন শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে। তার ডানে-বাঁয়ে তমিমী সওয়ার দল। শহর-পাঁচিল ও তাদের মাঝখানে রয়েছে খন্দকের মতো এক নদী। নায়ীম আর তার সাথী তমিমী সরদার মুহূর্তকালের জন্য নদীর কিনারে দাঁড়ালেন। নদীর প্রস্থ ও গভীরতা আন্দাজ করে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর পানিতে। পাঁচিলের ভেতর দিকে ছিল এক বিরাট গাছ। তার একটা শাখা পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নদীর দিকে। নায়ীম সাঁতার কেটে অপর কিনারায় গিয়ে সে শাখায় ফাঁস ফেলে গাছ বেয়ে গেলেন পাঁচিলের ওপর এবং সেখান থেকে রজ্জুর সিঁড়ি ছুঁড়ে দিলেন সাথীদের দিকে। ওয়াকি ও হারিম সেই সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে ছুঁড়ে দিলো আরও কয়েকটি সিঁড়ি। এমনি করে নদীর অপর কিনার দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী পালা করে পাঁচিলের ওপর উঠতে লাগলো। একশ' যোদ্ধা এমনি করে পাঁচিলের ওপর ওঠে গেলো। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে নায়ীমের নজরে পড়লো, প্রায় পাঁচশ' সিপাহীর একটি দল এগিয়ে আসছে। নায়ীম পঞ্চাশ জন সিপাহী সেখানে রেখে বাকি পঞ্চাশ জনকে নিয়ে শহরের দিকে নেমে গেলেন এবং এক প্রশস্ত বাজারে পৌঁছে তাদের মোকাবেলা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য তারা তাদের বিব্রতকর অবস্থায় রাখেন। এরই মধ্যে তামাম মুসলিম ফৌজ পাঁচিল পার হয়ে শহরে ঢুকে গেছে। তখন তুর্কী সিপাহীদের হাতিয়ার সমর্পণ ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। নায়ীম তার কতক সাথীকে শহরে সর্বত্র ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে বলে বাকি সিপাহীদের সাথে নিয়ে শহরের সদর দরজার দিকে গেলেন। সেখানে কয়েক জন পাহারাদারকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে খন্দকের পুল ওপরে তুলে দেন।

শহর মুসলমানদের দখলে চলে গেছে, সে খবর তুর্কি সেনাবাহিনীর জানা ছিলো না। তাই তারা বিজয়ের আশা নিয়ে জীবনপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো। নায়ীম মুসলিম মুজাহিদদের পাঁচিলের ওপর ওঠে তুর্কিদের প্রতি তীর বর্ষণের হুকুম দিলেন। শহরের দিক থেকে তীরঝড় বর্ষণ তুর্কিদের মনে হতাশা সৃষ্টি

করলো। পেছনে ফিরে তাদের নজরে পড়লো শহরে মুসলমান তীরন্দাজ ও উড্ডীয়মান ইসলামী ঝাণ্ডা।

ওদিকে কুতায়বা এ দৃশ্য দেখে কঠিন হামলার হুকুম দিলেন। খানিকক্ষণ আগে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিলো, এখন তুর্কিদের অবস্থা ঠিক তেমনি। পরাজয়ের সময় শহরে মজবুত দেয়ালের ভেতর আশ্রয় লাভের ভরসা ছিলো তাদের, কিন্তু সেদিকেও তখন তাদের নজরে পড়ছে মৃত্যুর ভয়ানক দৃশ্য। যারা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, তারা মুসলমানদের প্রস্তর বিদীর্ণকারী তলোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যারা পেছন দিকে হটছে, তারা ভয় করছে ভয়াবহ তীরবর্ষণের। জান বাঁচাবার জন্য তারা ছুটতে লাগলো ডানে-বাঁয়ে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অগুণতি সৈনিক খন্দকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এ মসিবত শেষ করে মুসলিম বাহিনী পেছন থেকে হামলকারী ফৌজের দিকে মনোযোগ দিলো। প্রথমেই তারা শহর মুসলমানদের দখলে দেখে হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের হামলার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তাদের বেশির ভাগ সৈন্য ময়দান ছেড়ে পালায় এবং অনেকে হাতিয়ার সমর্পণ করে।

কুতায়বা বিন মুসলিম ময়দান খালি দেখে সামনে এগিয়ে গেলেন। শহরের দরজায় পৌছে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর দরবারে সিজদায় অবনত হলেন। নায়ীম ভেতর থেকে খন্দকের পুল পেতে দেবার হুকুম দিলেন এবং ওয়াকি ও হারিমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন বাহাদুর সিপাহসালারের অভ্যর্থনার জন্য। কুতায়বা বিন মুসলিমের সাথে সাথে নায়ীমের নামও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠলো। তার অন্তরের পুরনো জখম ধীরে ধীরে মিটে গেলো। তার উচ্চ চিন্তাধারা বিজয়ী হলো স্বাভাবিক কামনার ওপর। তখন তলোয়ারের ঝংকার তার কাছে প্রেমের কমনীয় সুর ঝংকারের চাইতেও মুগ্ধকর। ভাই ও আযরার খুশি তার কাছে নিজের খুশির চাইতেও প্রিয়তর হয়ে দেখা দিলো। তার অন্তরের দোয়া তখন বেশি করে তাদের জন্যই উচ্চারিত হতে লাগলো।

কোন অবসর মুহূর্তে তিনি যখন খানিকটা চিন্তা করার সুযোগ পান তখনই তার মনে খেয়াল জাগে, হয় তো ভাইয়া আযরাকে বলে দিয়েছেন, আমি জীবিত রয়েছি। হয় তো এখন তারা আমার সম্পর্কে আলাপ করছেন। আযরার মনে হয় তো সত্যি সত্যি প্রত্যয় জন্মেছে, আমি আর কোন নারীকে অন্তরে স্থান দিয়েছি। সে হয় তো মন দিয়ে আমায় ঘৃণা করছে। হয় তো সে আমায় ভুলেই গেছে। তার পক্ষে আমাকে ভুলে যাওয়াই ভালো।

আন্তরিক দোয়ার সাথে শেষ হয় এসব চিন্তা।

এমনি করে তিন বছর কেটে গেলো। কুতায়বার সেনাবাহিনী বিজয় ও সৌভাগ্যের ধ্বজা উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তুর্কিস্তানের চারদিকে। নায়ীম হয়েছেন অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী। দরবারে খেলাফতে চিঠি লিখে কুতায়বা নায়ীমের সম্পর্কে জানিয়েছেন, এ নওজোয়ানের বিজয়ে আমি নিজের বিজয়ের চাইতেও বেশি গৌরব বোধ করছি।

* * *

হিজরী ৯১ সালে তুর্কিস্তানের অনেকগুলো রাজ্যে বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা ধূমায়িত হয়ে ওঠে। এ আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দূর থেকে তামাশা দেখছিলো সেই ইবনে সাদেক। নায়ীম মুক্তি পেয়ে যাবার পর প্রাণের ভয় হয়ে ওঠেছে ইবনে সাদেকের নিত্যসহচর। সে পালিয়ে এসেছে কেল্লা ছেড়ে। পথে বদনসীব ভাতিজীর সাথে দেখা হলে সে দুর্বত্ত চাচার হাতে কয়েদ হবার চাইতে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

জানের ভয় ইবনে সাদেককে পেয়ে বসেছে কঠিনভাবে। সে তার অনুচরদের সাথে নিয়ে চললো তুর্কিস্তানের দিকে। সেখানে পৌঁছে সে তার বিচ্ছিন্ন দলকে সংহত করতে শুরু করলো এবং কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে তুর্কিস্তানের পরাজিত শাহজাদাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাতে লাগলো।

তুর্কিস্তানের গণ্যমান্য প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে একজন ছিলো নাযাক। ইবনে সাদেক তার সাথে দেখা করে নিজের ধারণা প্রকাশ করলো। আগে থেকেই নাযাককে বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। তার প্রয়োজন ছিলো ইবনে সাদেকের মতো মন্ত্রণাদাতার। স্বভাবের দিক দিয়ে দু'জন ছিলো অভিন্ন। নাযাক চাইতো তুর্কিস্তানের বাদশাহ হতে, আর ইবনে সাদেকের আকাঙ্ক্ষা ছিলো শুধু তুর্কিস্তানের নয়; বরং তামাম ইসলামী দুনিয়ায় তার নামের খ্যাতি ছড়িয়ে দেয়া। নাযাক ওয়াদা করলো, তুর্কিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে সে ইবনে সাদেককে তার উজিরে আযম বানাবে। সুতরাং ইবনে সাদেক তাকে সাফল্যের আশ্বাস দেয়।

তুর্কিস্তানের লোকদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠতো কুতায়বার নামে। বিদ্রোহের কথা শুনলে তারা ঘাবড়ে যেতো, কিন্তু ইবনে সাদেকের দুষ্ট পরামর্শ নিষ্ফল হলো না। যার কাছেই সে যায় তাকে বলে, তোমাদের রাজ্য তোমাদেরই

জন্য। অপর কারও কোনো অধিকার নেই তার ওপর। কোনো জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক অপরের হুকুমত মেনে নিতে পারে না। ইবনে সাদেক ও নাযাকের চেষ্টায় তুর্কিস্তানের বহু সংখ্যক বিশিষ্ট শাহজাদা ও সরদার এসে জমা হলো এক পুরনো কেল্লায়। এ সমাবেশে নাযাক এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা করলো। নাযাকের বক্তৃতার পর দীর্ঘ বিতর্ক চললো। কয়েকজন বৃদ্ধ সরদার মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলার বিরোধিতা করলেন। অবস্থা নাজুক দেখে ইবনে সাদেক কি যেন বললো নাযাকের কানে কানে।

নাযাক তার জায়গা ছেড়ে ওঠে বললো– দেশপ্রেমিক জনগণ! আমাকে আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, পূর্বপুরুষের খুন আর আপনাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এখন আপনাদের উদ্দেশে আমাদের এক সম্মানিত মেহমান কিছু বলতে চান। আপনারা গোলাম বলেই আপনাদের প্রতি তার হামদর্দী। নাযাক এ কথা বলেই বসে পড়ে। ইবনে সাদেক ওঠে বক্তৃতা শুরু করলো। মুসলমানদের খেলাপ যতটা বিদ্বেষ প্রচার তার সাধ্যায়ত্ত ছিলো, তার সবই সে এখানে কাজে লাগায়। তারপর সে বললো, শাসক কওম গোড়ার দিকে শাসিত কওমকে গাফলতের ঘুম পাড়াবার জন্য কঠোর রূপ নিয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু শাসিত কওম যখন আরামের জিন্দেগীতে অভ্যস্ত হয়, বাহাদুরির ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তখন শাসকরা তাদের কর্মনীতি পরিবর্তন করে ফেলে। ইবনে সাদেক তুর্কি সরদারদের প্রভাবিত হতে দেখে আরও জোর আওয়াজে বললো– মুসলমানদের বর্তমান নরম নীতি দেখে মনে করবেন না, তারা হামেশা এমনি থাকবে। শিগগিরই তারা আপনাদের ওপর এমন জালেমের রূপ নিয়ে দেখা দেবে, যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনারা শুনে হয়রান হবেন, কিছুকাল আগে আমিও মুসলমান ছিলাম, কিন্তু আধিপত্যলোভী এ কওম সারা দুনিয়ার আজাদ কওমকে গোলাম বানাবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাদের কওম থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আপনারা তাদেরকে আমার চাইতে ভালো করে জানেন না। এরা চায় দৌলত। আপনারাও শিগগিরই দেখবেন, তারা এ মুলুকে একটি কানাকড়িও অবশিষ্ট রাখবে না। আর যদি তা নাও হয়, তাহলে আপনাদের স্ত্রী-কন্যাকে দেখবেন শাম ও আরবের বাজারে বিক্রি হতে।

ইবনে সাদেকের কথায় প্রভাবিত হয়ে সরদাররা সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। এক বৃদ্ধ সরদার উঠে বললেন– তোমার কথায় অনিষ্টের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আমরা নিজেরাও মুসলমানদের গোলামীকে

খারাপ জানি, কিন্তু দুশমনের সম্পর্কেও মিথ্যা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। মুসলমান শাসিত কওমের ইজ্জত ও দৌলত হেফাজত করে না– এ এক কল্পিত কাহিনীমাত্র। ইরানে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সেখানকার লোক নিজেদের হুকুমতের চাইতেও বেশি খুশি রয়েছে মুসলমানদের হুকুমাতে। দেশপ্রেমিক জনগণ! নাযাক ও এ লোকটির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের পক্ষে লোহার পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষ লাগানোর চেষ্টা করা সঙ্গত হবে না। এ নতুন লড়াইয়ে জয়লাভের বিন্দুমাত্র আশা যদি আমি দেখতে পেতাম, তাহলে সবার আগে আমিই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে নিতাম। কিন্তু আমি জানি, আমাদের বাহাদুরি সত্ত্বেও এ কওমের মোকাবেলা করতে আমরা পারবো না। রোম ও ইরানের মতো প্রবল শক্তি যাদের সামনে মস্তক অবনত করেছে, যে কওমের সামনে দরিয়া ও সমুদ্র সংকুচিত হয়ে যায়, আকাশচুম্বী পর্বত যাদের কাছে শির অবনত করে, তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কল্পনাও মনে এনো না তোমরা। আমি মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করছি না। কিন্তু একথা আমাকে বলতেই হবে, আমাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু লোপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এর ফলে হাজারও বাচ্চা এতীম আর হাজারও নারী বিধবা হবে। কওমের গলায় ছুরি চালিয়ে নাযাক নিজের সুখ্যাতি চায়। আর এ লোকটি কে আর কি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, তা আমার জানা নেই।

ইবনে সাদেক এ আপত্তির জবাব আগেই চিন্তা করে রেখেছে। সে আর একবার শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বক্তৃতা শুরু করলো। বৃদ্ধ সরদারের তুলনায় তার দুষ্টবুদ্ধি অনেক বেশি। তাছাড়া সে জানে অভিনয়। মুখের ওপর এক কৃত্রিম হাসি টেনে এনে সে বৃদ্ধ সরদারের আপত্তির জবাব দিতে লাগলো। তার যুক্তির সামনে বুড়ো সরদারের কথাগুলো লোকের মনে হলো অবাস্তব। বড় বড় সরদার তার যাদুতে ভুললো এবং আজাদী ও বিদ্রোহের আওয়াজ তুলে জলসা শেষ হলো।

* * *

রাতের বেলা কুতায়বা বিন মুসলিমের খিমায় জ্বলছে কয়েকটি মোমবাতি এবং এক কোণে জ্বলছে আগুনের কুণ্ড। কুতায়বা শুকনো ঘাসের গালিচায় বসে একটি নকশা দেখছেন। তাঁর মুখের ওপর গভীর উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

নকশা ভাঁজ করে একপাশে রেখে তিনি উঠে পায়চারী করে গিয়ে দাঁড়ালেন খিমার দরজায় এবং দূরে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন বরফপাতের দৃশ্য। অনতিকাল মধ্যে গাছের পেছন থেকে এক সওয়ার এসে হাজির হলেন। কুতায়বা তাকে চিনতে পেরে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। কুতায়বাকে দেখে সওয়ার ঘোড়া থেকে নামলেন। এক পাহারাদার এসে ঘোড়ার বাগ ধরলো।

কুতায়বা প্রশ্ন করলেন– কি খবর নিয়ে এলে নায়ীম?

: নাযাক এক লাখের বেশি ফৌজ সংগ্রহ করেছে। আমাদের শিগগিরই তৈরি হওয়া দরকার।

কুতায়বা ও নায়ীম কথা বলতে বলতে খিমার ভেতরে প্রবেশ করলেন। নায়ীম নকশা তুলে কুতায়বাকে দেখিয়ে বললেন– এই যে দেখুন! বলখ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে নাযাক তার ফৌজ একত্র করেছে। এ জায়গাটির দক্ষিণে দরিয়া, আর বাকি তিন দিকে পাহাড় ও নিবিড় বন। বরফপাতের দরুন এ পথ অতি দুর্গম, কিন্তু আমাদের গরমের দিনের প্রতীক্ষা করা ঠিক হবে না। তুর্কিদের উৎসাহ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের তারা হত্যা করে চলেছে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে। সমরকন্দেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা রয়েছে।

কুতায়বা বললেন– ইরান থেকে যে ফৌজ আসবে, তাদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারা পৌঁছে গেলেই আমরা হামলা করবো।

কুতায়বা ও নায়ীমের আলাপের মাঝখানে এক সিপাহী খিমায় এসে বললো– এক তুর্কি সরদার আপনার মোলাকাত প্রার্থী।

কুতায়বা বললেন– তাকে নিয়ে এসো।

সিপাহী চলে যাবার খানিকক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধ সরদার খিমায় দাখিল হলেন। তিনি চামড়ার তোগা ও সামুরের টুপি পরিহিত ছিলেন। তিনি ঝুঁকে পড়ে কুতায়বাকে সালাম করে বললেন– সম্ভবত আপনি আমায় চিনতে পারছেন। আমার নাম নেযাক।

: আমি আপনাকে ভালো করেই চিনি। বসুন।

নেযাক কুতায়বার সামনে বসে পড়লে কুতায়বা তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

নেযাক বললেন– আমি আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি আমাদের কওমের ওপর কঠোর হবেন না।

: কঠোর! কুতায়বা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন– বিদ্রোহীদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তাই করা হবে তাদের সাথে। তারা মুসলিম শিশু ও নারীর রক্তপাত করতেও দ্বিধা করছে না।

: কিন্তু ওরা বিদ্রোহী নয়। নেযাক গাম্ভীর্যের সাথে জবাব দিলেন। ওরা বেওকুফ। এ বিদ্রোহের পূর্ণ জিম্মাদারী আপনাদেরই এক মুসলমান ভাইয়ের।

: আমাদের ভাই? কে সে?

নেযাক জবাব দিলেন– ইবনে সাদেক।

নায়ীম এতক্ষণ বসে মোমবাতির আলোয় নকশা দেখছিলেন। ইবনে সাদেকের নাম শুনে তিনি চমকে ওঠেন। 'ইবনে সাদেক!' তিনি নেযাকের দিকে তাকিয়ে বললেন।

: হ্যাঁ, ইবনে সাদেক।

কুতায়বা প্রশ্ন করলেন– সে লোকটি কে?

নেযাক জবাবে বললেন– সে তুর্কিস্তানে এসেছে দু'বছর আগে। সে তার কথার যাদুতে তুর্কিস্তানের সকল গণ্যমান্য লোককে আপনাদের হুকুমতের খেলাফ বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। এর বেশি তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

: আমি তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। নায়ীম নকশা ভাঁজ করতে করতে বললেন। আজকাল কি সে তবে নাযাকের সাথে রয়েছে?

: না, সে কোকন্দর নামক স্থানে আশপাশের পাহাড়ী লোকদের জমা করে নাযাকের জন্য ফৌজ তৈরি করছে। সম্ভবত সে চীনের সাহায্য হাসিল করারও চেষ্টা করবে।

নায়ীম কুতায়বার উদ্দেশে বললেন– আমি বহুদিন ধরে এ লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে যে আমার এত কাছে, তা আমি জানতাম না। আপনি আমাকে এজাযত দিন। ওকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আনা নেহায়েত জরুরি।

: কিন্তু লোকটি কে, তা তো আমার জানতে হবে।

: সে আবু জাহ্‌লের চাইতে ইসলামের বড় দুশমন। আবদুল্লাহ বিন উবাইর চাইতে বড় মুনাফেক, সাপের চাইতে বেশি ভয়ানক আর শিয়ালের চাইতেও বেশি ধূর্ত। সে তুর্কিস্তানে থাকলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ওর দিকে আমাদের অবিলম্বে নজর দিতে হবে।

: কিন্তু এ মওসুমে? কোকন্দের পথে রয়েছে বরফের পাহাড়।

: তা যাই থাক, আপনি আমাকে এজাযত দিন। নায়ীম বললেন– কোকন্দে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই মনে করে সে ওখানেই রয়েছে। সম্ভবত সে শীতের মওসুমে ওখানে কাটিয়ে গরমের দিনে আর কোনও নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেবে।

: কবে যেতে চাও তুমি?

: এ মুহূর্তে। নায়ীম জবাব দিলেন। আমার একটি মুহূর্তও অপচয় করা ঠিক হবে না।

: এ সময় বরফপাত হচ্ছে, ভোরে চলে যাবে। এইমাত্র তুমি এক দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে এলে। খানিকক্ষণ আরাম কর।

: যতক্ষণ এ আপদ জিন্দা রয়েছে, ততক্ষণ আরামের অবকাশ নেই আমার। এখন এই মুহূর্তের অপচয়ও আমি গুনাহ মনে করি। আমাকে এজাযত দিন।

এ কথাটি বলেই নায়ীম ওঠে দাঁড়ালেন।

: আচ্ছা, দুশ' সিপাহী তোমার সাথে নিয়ে যাও।

নেযাক হয়রান হয়ে বললেন– আপনি একে কোকন্দে পাঠাচ্ছেন মাত্র দুশ' সিপাহী সাথে নিয়ে! পাহাড়ী লোকদের লড়াইয়ের তরিকা আপনি জানেন? বাহাদুরীর দিক দিয়ে তারা দুনিয়ার কোন কওমের চাইতে কম নয়। ওর উচিত বেশ বড় রকমের ফৌজ নিয়ে যাওয়া। ইবনে সাদেকের কাছে সব সময় মওজুদ থাকে পাঁচশ' সশস্ত্র নওজোয়ান। এখন পর্যন্ত কত ফৌজ সে একত্র করেছে তাই বা কে জানে?

নায়ীম বললেন– এক ভীতু কাপুরুষ সালার তার সিপাহীদের মধ্যে বাহাদুরীর ঐশ্বর্য জন্মাতে পারে না। যদি সেই ফৌজের সালার ইবনে সাদেক হয়ে থাকে তাহলে এত সিপাহীও দরকার হবে না আমার।

কুতায়বা মুহূর্তকাল চিন্তা করে নায়ীমকে তিনশ' সিপাহী সাথে যেতে বললেন। তারপর তাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বিদায় করেন।

এক মুহূর্ত পর কুতায়বা ও নেযাক খিমার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, নায়ীম এক ক্ষুদ্রাকার ফৌজ নিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন সামনের এক পাহাড়ী পথ।

নেযাক কুতায়বাকে বললেন– বহুত বাহাদুর ছেলে!

কুতায়বা জবাব দিলেন– হ্যাঁ, ও এক মুজাহিদের বেটা।

: আপনারা কেন এত বাহাদুর, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি? নেযাক আবার প্রশ্ন করলেন।

কুতায়বা নেযাকের প্রশ্নের জবাবে বললেন– আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, তাই। মৃত্যু আমাদের কাছে নিয়ে আসে এক উষ্ণতর জিন্দেগীর খোশখবর। আল্লাহর জন্য জিন্দা থাকার আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহরই পথে মৃত্যুবরণ করার উদ্যম পয়দা করে নেবার পর কোন মানুষেরই মনে অন্য কোনো বড় শক্তির ভয় থাকতে পারে না।

: আপনাদের কওমের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এমনি বাহাদুর?

: হ্যাঁ, যারা সাচ্চা অন্তরে তাওহিদ রেসালাতের উপর ঈমান আনে, তাদের প্রত্যেকেই এমনই।

* * *

ইবনে সাদেক কোকন্দের উত্তরে একটি নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে দিন যাপন করছিলো। এক উপত্যকার চারদিকে উঁচু পাহাড় তার জন্য অপরাজেয় প্রাচীরের কাজ করছে। পাহাড়ী এলাকার দুর্দান্ত বাসিন্দারা ছোট ছোট দলে এসে জমা হচ্ছে সে উপত্যকায়। ইবনে সাদেক এ লোকগুলোকে সোজা পথে পাঠিয়ে দিচ্ছে নাযাকের কাছে। গুপ্তচর তাকে মুসলমানদের গতিবিধির খবর এনে দেয়। মুসলমানরা শীতের মওসুম শেষ না হলে লড়াই শুরু করবে না– এ ধারণা নিয়ে আশ্বস্ত ছিলো ইবনে সাদেক। তার আরও বিশ্বাস ছিলো, প্রথমত অতদূর থেকে মুসলমানরা তার চক্রান্তের খবর পাবে না। আর যদি খবর পেয়েও যায়, তবুও শীতের দিনে এদিকে আসতে পারবে না। যদি শীতের পর তারা এ পথে আসেও, তাহলে আল্লাহর দুনিয়া বহু দূর বিস্তৃত।

একদিন এক গুপ্তচরের কাছ থেকে নায়ীমের আগমনের খবর পেয়ে সে খুবই ঘাবড়ে গেল। ইবনে সাদেক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো– তার সাথে কত ফৌজ রয়েছে?

গুপ্তচর জবাব দিলো– মাত্র তিনশ' সিপাহী।

এক তাতারী নওজোয়ান অট্টহাসি করে বললো– কুল্লে তিনশ' লোক?

ইবনে সাদেক বললো– তুমি হাসছো কেন? এ তিনশ' ফৌজ আমার চোখে চীন ও তুর্কিস্তানের তামাম ফৌজের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক।

তাতারী বললো– আপনি নিশ্চিত থাকুন। ওরা এখানে পৌঁছাবার আগেই আমাদের পাথরের তলায় চাপা পড়ে থাকবে।

নায়ীমের কল্পনা ইবনে সাদেকের কাছে মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক। তার কাছে সাতশ'র বেশি তাতারী মওজুদ রয়েছে, তবুও তার মনে বিজয়ের বিশ্বাস নেই। সে জানে, খোলা ময়দানে মুসলমানের মোকাবেলা করা খুবই বিপজ্জনক। সে তামাম পাহাড়ী রাস্তায় পাহারা বসিয়ে নায়ীমের অপেক্ষা করতে লাগলো।

নায়ীম ইবনে সাদেকের সন্ধান করতে করতে কোকন্দের উত্তর-পূর্ব দিকে উপস্থিত হন। এখানকার অসমতল জমিনের ওপর দিয়ে ঘোড়া এগুতে লাগলো অতি কষ্টে। উঁচু পাহাড়-চূড়ায় ঝলমল করছে জমাট বরফস্তূপ। নীচের উপত্যকাভূমির কোথাও কোথাও ঘন বন, কিন্তু বরফপাতের মওসুমে বনের গাছপালা পত্রহীন। নায়ীম এক উঁচু পাহাড়ের পাশের সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। অমনি আচানক পাহাড়ের ওপর থেকে তাতারীরা তীর বর্ষণ শুরু করলো। কয়েকজন সওয়ার জখমী হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। ফৌজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পাঁচটি ঘোড়া সওয়ারসমেত এক গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। নায়ীম সিপাহীদের ঘোড়া থেকে নামার হুকুম দিয়ে পঞ্চাশ জনকে পাহাড় থেকে খানিকটা দূরে এক নিরাপদ জায়গায় ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে বললেন এবং বাকি আড়াইশ' সিপাহী সাথে নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন পাহাড়ের ওপর দিকে। তখনও যথারীতি পাথরবর্ষণ চলছে। মাথার ওপর ঢাল ধরে পাহাড়চূড়ায় ওঠতে ওঠতে নায়ীমের ষাট জন সিপাহী পড়ে গেছে পাথরের আঘাত খেয়ে। নায়ীম বাকি লোকদের নিয়ে পাহাড় চূড়ায় মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে হামলা শুরু করলেন। মুসলমানদের অসাধারণ ধৈর্য দেখে তাতারীদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। তারা চারদিক থেকে সরে এসে একত্র হতে লাগলো। ইবনে সাদেক মাঝখানে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে হামলা করতে। তার ওপর নায়ীমের নজর পড়তেই তিনি জোশের আতিশয্যে আল্লাহু আকবর আওয়াজ করে এক হাতে তলোয়ার আর অপর হাতে নেযা নিয়ে পথ সাফ করে এগিয়ে চললেন। তাতারীরা ক্রমাগত ময়দান ছেড়ে পালাতে লাগলো। ইবনে সাদেক তখন প্রাণের ভয়ে অস্থির। সে তার অবশিষ্ট ফৌজকে ফেলে একদিকে পালাতে লাগলো। নায়ীমের চোখ তারই দিকে নিবদ্ধ। তাকে পালাতে দেখে নায়ীম পিছু ধাওয়া করলেন। ইবনে সাদেক পাহাড় থেকে নেমে গেলো নীচে। প্রয়োজনের সময় নিজে বাঁচার বন্দোবস্ত সে আগেই করে রেখেছিলো। পাহাড়ের নীচে এক লোক দুটি ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ইবনে

সাদেক ঝট করে এক ঘোড়ায় চেপে ছুটে চললো। তার সাথী কেবলমাত্র রেকাবে পা রেখেছে, অমনি নায়ীম নেযা মেরে তাকে নীচে ফেলে দেন। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চললেন ইবনে সাদেকের পিছু পিছু।

নায়ীমের ধারণা মোতাবেক ইবনে সাদেক ছিলো শিয়ালের চাইতেও বেশি ধূর্ত। পরাজয় নিশ্চিত দেখলে কি করে নিজের জান বাঁচাতে হবে, তার পুরো ব্যবস্থা সে আগেই করে রেখেছে। নায়ীম আর ইবনে সাদেকের মাঝখানে দূরত্ব বড় বেশি নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ তার অনুসরণ করার পর নায়ীম বুঝলেন, তাদের মাঝখানের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, আর তার ঘোড়াও ইবনে সাদেকের ঘোড়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম চলতে পারে। তবুও নায়ীম তার পিছু ছাড়তে পারলেন না এবং তাকে চোখের আড়াল হতে দিলেন না।

ইবনে সাদেক পাহাড়ী পথ ছেড়ে উপত্যকার দিকে চললো। উপত্যকায় মাঝে মাঝে ঘন গাছপালা। এক জায়গায় ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার নীচে ইবনে সাদেক কয়েকজন সিপাহী দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সে ছুটে পালাতে পালাতে তাদের ইশারা করলো, অমনি তারা গা ঢাকা দিলো গাছের আড়ালে। নায়ীম যখন সে গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তখন এক তীর এসে লাগলো তার বাজুতে, কিন্তু তিনি ঘোড়ার গতিবেগ হ্রাস করলেন না।

খানিকক্ষণ পর আর একটি তীর লাগলো তার পেছন দিকে। তারপর আর একটি তীর এসে ঘোড়ার পিঠে পড়তেই ঘোড়া ছুটে চললো আরও দ্রুতগতিতে। নায়ীম তার বাহু ও পেছন দিক থেকে তীর টেনে বের করলেন, কিন্তু ইবনে সাদেকের পিছু ছাড়লেন না। আরও কিছুদূর চলার পর একটি তীর এসে লাগলো নায়ীমের কোমরে। আগেই প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার দেহ থেকে। তৃতীয় তীর লাগার পর তার দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু যতক্ষণ জ্ঞান থাকলো, ততক্ষণ মুজাহিদের হিম্মত অটুট থাকে। ততক্ষণ তিনি ঘোড়ার গতিবেগ কম হতে দিলেন না। গাছের সারি শেষ হয়ে গেলে এবার দেখা দিল প্রশস্ত ময়দান। ইবনে সাদেক অনেকখানি আগে চলে গেছে, দুর্বলতা নায়ীমের ওপর জয়ী হচ্ছে। তার চোখে নেমে আসছে নিবিড় অন্ধকার। তার মাথা ঘুরছে, কানের ভেতর শাঁ শাঁ করছে। নিরুপায় হয়ে ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি বেহুশ হয়ে জমিনের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন। বেহুশ অবস্থায় তার কয়েক মুহূর্ত কাটলো। যখন কিছুটা হুশ ফিরে এল, তখন তার কানে ভেসে এলো কারও দূরাগত সংগীতের আওয়াজ। বহুদিন এমন মধুর আওয়াজ নায়ীমের কানে ভেসে আসেনি। বহুক্ষণ নায়ীম অজ্ঞানের মতো পড়ে শুনলেন সে সুরঝংকার। অবশেষে তিনি হিম্মত করে

মাথা তুললেন। তার কাছেই চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ভেড়া। যে গান গাইছে তাকে দেখতে চান নায়ীম, কিন্তু দুর্বলতার দরুন আবার তার চোখের সামনে নামলো অন্ধকারের পর্দা এবং তিনি নিরূপায় হয়ে মাথা রাখলেন জমিনের ওপর। একটি ভেড়া নায়ীমের কাছে এলো এবং নায়ীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে তার দেহের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। তারপর তার নিজের ভাষায় আওয়াজ দিয়ে ডাকলো আর একটি ভেড়াকে। দ্বিতীয় ভেড়াটিও তেমনি আওয়াজ করে বাকী ভেড়াগুলোকে খবর দিয়ে এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো ভেড়া নায়ীমের আশপাশে জমা হয়ে কোলাহল শুরু করলো। এক তুর্কিস্তানী তরুণী ছড়ি হাতে ভেড়ার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে যথারীতি গান গেয়ে চলেছে। একই জায়গায় এতগুলো ভেড়ার সমাবেশ দেখে সে এগিয়ে এলো। ভেড়াগুলোর মাঝখানে নায়ীমকে রক্তাক্ত পড়ে থাকতে দেখে সে চিৎকার করে ওঠে। তারপর কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধির মতো আঙুল কামড়াতে লাগলো।

নায়ীম বেহুশ অবস্থার মধ্যে একবার মাথা তুলে দেখলেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি এক পাহাড়ী যুবতী। দীর্ঘ আকৃতির সাথে দৈহিক স্বাস্থ্য, নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিত হয়ে তার নিষ্পাপ সৌন্দর্য যেনো আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মোটা অমসৃণ কাপড়ের তৈরি লেবাস তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ম্লান করেনি। সামুরের একটা টুকরা তার গর্দানে জড়ানো, মাথায় টুপি। সুন্দরী তরুণীর মুখ খানিকটা লম্বা এবং তা তার মুখখানা যেন গম্ভীর করে দিয়েছে। বড় বড় কালো উজ্জ্বল চোখ, নওবাহারের ফুলের চাইতেও মুগ্ধকর পাতলা নাক ঠোঁট, প্রশস্ত ললাট ও মজবুত চিবুক– সবকিছু মিলে তাকে অপরূপ করে তুলেছে। নায়ীম এবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন আযরার রূপ, আর একবার দেখলেন জুলাইখার প্রতিচ্ছবি। যুবতী নায়ীমের দেহে রক্তের দাগ দেখে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকার পর সাহস করে কাছে এগিয়ে বললো– আপনি কি আহত?

নায়ীম তুর্কিস্তানে থেকে তাতারী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। সুন্দরী তরুণীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি ওঠে বসতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, মাথা ঘুরে বেহুশ হয়ে পড়ে রইলেন।

১০

নায়ীম আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। তখন তিনি রয়েছেন খোলা ময়দানের পরিবর্তে এক পাথরের ঘরে। তার আশপাশে কয়েক জন পুরুষ ও নারী। যে সুন্দরী যুবতীর অস্পষ্ট ছবি তখনও নায়ীমের মগজে রয়ে গেছে, সে এক হাতে দুধের পেয়ালা নিয়ে অপর হাত নায়ীমের মাথার নীচে দিয়ে তাকে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। নায়ীম খানিকটা ইতস্তত করে মুখ লাগালেন পেয়ালায়। কিছুটা দুধ পান করার পর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলে যুবতী তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয়। তারপর বিছানার এক পাশে সরে বসলো সে। দুর্বলতার কারণে নায়ীম কখনও চোখ মুদে থাকেন, আবার কখনও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন তরুণী ও অন্য সবার দিকে। এক নওজোয়ান এসে দাঁড়ালো ঘরের দরজায়। তার এক হাতে নেযা, অপর হাতে ধনুক।

তরুণী তার দিকে তাকিয়ে বললো– ভেড়াগুলো এনেছ?

: হ্যাঁ এনেছি, আর এখনই আমি যাচ্ছি।

তরুণী প্রশ্ন করলো– কোথায়?

: শিকার খেলতে যাচ্ছি। এক জায়গায় আমি একটা ভালুক দেখে এসেছি। খুব বড় ভালুক। উনি এখন আরামে আছেন?

: হ্যাঁ, কিছুটা হুশ ফিরেছে।

: জখমের উপর পট্টি বেঁধে দিয়েছো?

তরুণী নায়ীমের বর্মের দিকে ইশারা করে বললো– না, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, ওটা আমি খুলতে পারবো না।

নওজোয়ান এগিয়ে এসে নায়ীমকে কোলের কাছে তুলে নিয়ে তার বর্ম খুলে দেয়। কামিজ ওপরে তুলে সে তার জখম দেখলো। তার ওপর প্রলেপ

লাগিয়ে বেঁধে দিয়ে বললো– এবার শুয়ে থাকুন। জখম খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু এ প্রলেপে শিগগিরই সেরে যাবে। নায়ীম কিছু না বলে শুয়ে পড়লেন এবং নওজোয়ান চলে গেলো বাইরে। আর সব লোকও একে একে চলে গেলো। নায়ীম তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন এবং তিনি যে জীবনের সফর শেষ করে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেছেন, সে ধারণাও ধীরে ধীরে মিটে গেছে তার মন থেকে।

তরুণীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন– আমি কোথায়?

তরুণী জবাব দিলো– আপনি এখন আমাদের ঘরে। আপনি বাইরে পড়েছিলেন বেহুঁশ হয়ে। আমি এসে আমার ভাইকে খবর দিয়েছিলাম। সে আপনাকে তুলে এনেছে এখানে।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– তুমি কে?

: আমি ভেড়া চরিয়ে বেড়াই।

: তোমার নাম কি?

: আমার নাম নার্গিস।

: নার্গিস!

: জি হ্যাঁ।

নায়ীমের কল্পনায় তারই সাথে সাথে আরও দুটি তরুণীর ছবি ভেসে ওঠলো। তার নামের সাথে স্মরণে আসলো আরও দুটি নাম। অন্তরে আযরা, জুলাইখা ও নার্গিসের নাম আবৃত্ত করতে করতে তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘরের ছাদের দিকে।

নায়ীমের মনোযোগ আকর্ষণ করে তরুণী বললো– আপনার ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়ই? তারপর ওঠে সামনের কামরা থেকে কয়েকটি সেব ও শুকনো মেওয়া এনে রাখলো নায়ীমের সামনে। সে নায়ীমের মাথার নীচে হাত দিয়ে ওপরে তুললো এবং ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসার জন্য একটা পুস্তিন এনে দিলো তার পেছন দিকে। নায়ীম কয়েকটি সেব খেয়ে নার্গিসকে জিজ্ঞেস করলেন– যে নওজোয়ান এখন এসেছিল, সে কে?

: ও আমার ছোট ভাই।

: কি নাম ওর?

নার্গিস জবাব দিলো– হুমান।

নার্গিসকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নায়ীম জানলেন, তার বাবা-মা আগেই মারা গেছেন। সে তার ভাইয়ের সাথে এ ছোট্ট বস্তিতে থাকে। আর হুমান হচ্ছে বস্তির রাখালদের সরদার। বস্তির বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শ'।

সন্ধ্যা বেলায় হুমান ফিরে এসে জানালো, তার শিকার মেলেনি।

নার্গিস ও হুমান নায়ীমের শুশ্রূষায় কোন কসুর করে না। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে তারা নায়ীমের শয্যাপাশে। নায়ীমের চোখে যখন ঘুমের মায়া নেমে আসে, নার্গিস তখন ওঠে যায় অপর কামরায়, আর হুমান তার পাশেই শুয়ে পড়ে ঘাসের বিছানায়। রাতভর নায়ীম দেখতে থাকেন কত মুগ্ধকর স্বপ্ন। আবদুল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর এ প্রথম রাত স্বপ্নের ঘোরে নায়ীমের কল্পনা যুদ্ধ-ময়দান ছেড়ে উঠে গেছে আর এক নতুন দেশে। কখনও তিনি দেখছেন যেনো তার মরহুম ওয়ালেদা তার জখমের ওপর প্রলেপ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিচ্ছেন, আর আযরার মহব্বতভরা দৃষ্টি তাকে দিচ্ছে শান্তির পয়গাম। আবার তিনি দেখছেন, যেনো জুলাইখা তার আলোক-দীপ্ত মুখের আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছে কয়েদখানার অন্ধকার কুঠরী।

ভোরের আলোয় চোখ খুলে তিনি দেখলেন, নার্গিস আবার দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রে, আর হুমান তাকে জাগাচ্ছে ঘুম থেকে।

নার্গিসের পেছনে দাঁড়িয়ে বস্তির আর একটি তরুণী তার দিকে তাকাচ্ছে একাগ্র দৃষ্টিতে। নার্গিস বললো– বসো, জমররুদ! অমনি সে নীরবে একপাশে বসে পড়লো।

এক সপ্তাহ পর নায়ীমের চলাফেরার শক্তি ফিরে এলো। তিনি বস্তির নির্দোষ আবহাওয়া উপভোগ করতে শুরু করলেন। ভেড়া-বকরি চরিয়ে দিন গুজরান করে বস্তির লোকেরা। আশপাশে সুন্দর শ্যামল চারণভূমি। তাই তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। কোথাও কোথাও সেব ও আঙুরের বাগিচা। ভেড়া-বকরি পালন ছাড়া সেখানকার লোক আনন্দ পায় জংলী জানোয়ার শিকার করে। বস্তির লোকেরা শিকার করতে চলে যায় দূরের বরফঢাকা এলাকায়, আর ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় বিশেষ করে বস্তির যুবতী মেয়েরা। এরা দেশের রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা তাতারীদের বিদ্রোহের সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটারই ধার ধারে না। রাতের বেলা বস্তির যুবক-যুবতীরা এসে জমা হয় মস্ত বড় খিমায়। সেখানে তারা গান গায় আর নাচে। রাতের একভাগ কেটে গেলে মেয়েরা চলে যায় নিজ নিজ ঘরে, আর পুরুষরা অনেক

রাত জেগে ছোট্ট ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে গল্প-গুজবে কাটায়। কেউ শোনায় আগেকার দিনের বাদশাহদের কাহিনী, কেউ বলে তার নিজের ভালুক-শিকারের মুগ্ধকর ঘটনা, আর কেউ বসে যায় জিন ভূত-প্রেতের অসংখ্য মনগড়া কিস্সা নিয়ে। এরা অনেকটা কুসংস্কার-পূজারী। তাই মন দিয়ে শোনে ভূতের কিস্সা। কিছুদিন ধরে তাদের কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেছেন এক শাহজাদা। কেউ বলে তার চেহারা ও রূপের কথা, কেউ তারিফ করে তার লেবাসের, কেউ তার জখমি হয়ে বস্তিতে আসায় প্রকাশ করে হয়রানি। আবার কেউ কেউ বলে, রাখালদের বস্তিতে দেবতারা এক বাদশাহকে পাঠিয়েছে। আর হুমানকে তিনি তার উজির বানাবেন। সোজা কথায়, বস্তির লোকেরা নায়ীমের নাম না নিয়ে তাকে বলতো শাহজাদা।

ওদিকে বস্তির মেয়েদের মধ্যে জল্পনা চললো, নবাগত শাহজাদা নার্গিসকে তার বেগম বানাবেন। নার্গিসের সৌভাগ্যে গাঁয়ের মেয়েরা ঈর্ষান্বিতা। শাহজাদা নিরুপায় হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে কেউ তাকে জানায় মোবারকবাদ, আবার কেউ কথায় কথায় তাকে বিদ্রূপ করে। নার্গিস প্রকাশ্যে রাগ করে, কিন্তু সখীদের মুখে এ ধরনের কথা শুনলে তার অন্তরে কম্পন জাগে। তার সফেদ গায়ের উপর খেলে যায় রক্তিম আভা। পল্লীর লোকদের মুখ দিয়ে নায়ীমের নতুন নতুন তারিফের কথা শোনার জন্য তার কান অস্থির বেকারার হয়ে থাকে।

নায়ীম এর সব কিছু সম্পর্কে বে-খবর অবস্থায় হুমানদের বাড়ির এক কামরায় কাটিয়ে দিচ্ছে তার জিন্দেগীর নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ দিনগুলো। গাঁয়ের পুরুষ ও মেয়েরা হররোজ এসে দেখে যায় তাকে। তার শুশ্রূষার জন্য নায়ীম তাদের জানান অকুণ্ঠ শোকরিয়া। সবাই তাকে শাহজাদা মনে করে আদরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে এবং তার অবস্থা জানার জন্য বড় বেশি প্রশ্ন করে না। কিন্তু নায়ীমের শান্ত-স্বভাব তাদের সব কুণ্ঠা কাটিয়ে দেয় সহজেই। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই আদব ও শ্রদ্ধা ছাড়া নায়ীমকে তারা মহব্বতের পাত্র করে নেয়।

* * *

একদিন সন্ধ্যাবেলায় নায়ীম নামায পড়ছেন। নার্গিস তার সখীদের সাথে ঘরের দরজায় একাগ্রচিত্তে দেখছে তার কার্যকলাপ।

এক কিশোরী হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলো– উনি কি করছেন?

: উনি যে শাহজাদা! জমররুদ শিশুর মতো জবাব দিলো– দেখ, কি চমৎকার ওঠাবসা করছেন! ...

: ভাগ্য নার্গিসের! তুমিও এমনি করে থাক, নার্গিস?

নার্গিস ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বললো– চুপ!

নায়ীম নামায শেষ করে দোয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তরুণীরা দরজার খানিকটা দূরে সরে কথা বলতে লাগলো।

জমররুদ বললো– চল নার্গিস! ওখানে আমাদের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

: আমি তোমাদের আগেই বলেছি, ওকে এখানে একা ফেলে যেতে পারবো না আমি।

: চলো, ওকেও সাথে নিয়ে যাবো।

আর এক বালিকা বললো– তোমার মাথা বিগড়ে গেছে, কমবখ্‌ত? উনি শাহজাদা, না খেলনা?

মেয়েরা যখন এমনি করে কথা বলছে, তখন হুমানকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখা গেলো। সে নেমে এলে নার্গিস এগিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরলো। হুমান সোজা গিয়ে নায়ীমের কামরায় প্রবেশ করলো।

জমররুদ বললো– চলো নার্গিস! এবার তোমার ভাই-ই তো ওর কাছে বসবে।

আর একজন বললো– চলো নার্গিস।

: চলো চলো! বলতে বলতে মেয়েরা নার্গিসকে ঠেলে নিয়ে গেলো একদিকে। হুমান ভেতরে প্রবেশ করলে নায়ীম প্রশ্ন করলেন– বল ভাই, কি খবর নিয়ে এলে?

: আমি সবগুলো জায়গা ঘুরে দেখে এসেছি। আপনার ফৌজের কোন খবর মিললো না। ইবনে সাদেক যেনো গা-ঢাকা দিয়েছে। এক লোকের কাছ থেকে জানলাম, শিগগিরই আপনাদের ফৌজ হামলা করবে সমরকন্দের ওপর।

হুমান ও নায়ীমের মধ্যে কথাবার্তা চললো অনেকক্ষণ। নায়ীম এশার নামায পড়লেন। আরাম করবেন বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। হুমান ওঠে আর এক কামরায় চলে যাচ্ছিলো। ইতোমধ্যে গাঁয়ের লোকদের গানের আওয়াজ ভেসে এলো তাদের কানে।

হুমান বললো– আপনি আমাদের গাঁয়ের লোকদের গান শোনেননি, কেমন?

: আমি এখানে শুয়ে শুয়ে কয়েকবার শুনেছি।

: চলুন, ওখানে নিয়ে যাব আপনাকে। ওরা আপনাকে দেখলে খুবই খুশি হবে। আপনি জানেন, ওরা আপনাকে শাহ্‌জাদা মনে করে?

: শাহ্‌জাদা? নায়ীম হাসিমুখে বললেন– ভাই! আমাদের ভেতরে না আছে কোন বাদশাহ্ না আছে শাহ্‌জাদা।

: আমার কাছে আপনি গোপন করছেন কেন?

: গোপন করে আমার লাভ?

: তা হলে আপনি কে?

: এক মুসলমান।

: হয় তো আপনারা যাকে মুসলমান বলেন, আমরা তাকে বলি শাহ্‌জাদা।

গানের আওয়াজ ক্রমাগত জোরদার হতে লাগলো। হুমান শোনলো নিবিষ্ট মনে। 'চলুন।' হুমান আর একবার বললো– গাঁয়ের লোক আমায় কতবার অনুরোধ করেছে আপনাকে ওদের মজলিসে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমি আপনার ওপর জবরদস্তি করতে সাহস করিনি।

নায়ীম ওঠতে ওঠতে জবাব দিলেন– আচ্ছা চলো।

কয়েকটি লোক সানাই আর ঢোল বাজাচ্ছে। আর এক বুড়ো তাতারী গান গাইছে। নায়ীম ও হুমান খিমায় ঢুকতেই সব শান্ত নিশ্চুপ।

হুমান বললো– তোমরা চুপ করলে কেন? গাও।

আবার গান শুরু হলো।

এক ব্যক্তি একটা পুস্তিন বিছিয়ে দিয়ে নায়ীমকে অনুরোধ করলো বসতে। নায়ীম খানিকটা ইতস্তত করে বসলেন। যন্ত্রীরা যখন সঙ্গীতের সুরের সাথে সাথে তাল বদল করলো, অমনি তামাম পুরুষ ও নারী ওঠে একে অপরের হাত ধরে শুরু করলো নৃত্য। হুমানও ওঠে জমরুদের হাত ধরে শরীক হলো নৃত্যে।

তামাম নর্তক-নর্তকীর দৃষ্টি নায়ীমের দিকে নিবদ্ধ। নার্গিস তখনও একা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে নায়ীমের দিকে। এক বৃদ্ধ মেষপালক সাহস করে নায়ীমের কাছে এসে বললো– আপনিও উঠুন। আপনার সাথী অপেক্ষা করছে আপনার।

নায়ীম নার্গিসের দিকে তাকালে অমনি সে দৃষ্টি অবনত করলো। নায়ীম নীরবে আসন ছেড়ে ওঠে খিমার বাইরে গেলেন। নায়ীম বেরিয়ে যাওয়ামাত্র খিমায় ছেয়ে গেলো একটা গভীর নিস্তব্ধতা।

: উনি আমাদের নাচ পছন্দ করেন না। আচ্ছা, আমি ওকে ঘরে রেখে এখখুনি ফিরে আসছি। এই কথা বলে হুমান খিমা থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলো নায়ীমের কাছে।

সে বললো– আপনি খুব ঘাবড়ে গেছেন?

: ওহহো, তুমিও এসে গেলে?

: আমি আপনাকে ঘর পর্যন্ত রেখে আসবো?

: না, যাও। আমি খানিকক্ষণ এদিকে ফিরে ঘরে যাবো।

হুমান ফিরে চলে গেলে নায়ীম বস্তির এদিক ওদিক ঘুরে থাকার জায়গার কাছে পৌঁছে ঘরের বাইরে এক পাথরের ওপর বসে আসমানের সেতারার সাথে ভাব জমালেন। তার হৃদয়ে ভেসে আসতে লাগলো নানা ধরনের চিন্তা– কি করছি আমি এখানে? এখানে বেশি সময় থাকা ঠিক হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারবো। আমি শিগগিরই চলে যাবো এখান থেকে। এ বস্তি মুজাহিদদের দুনিয়া থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু এ লোকগুলো কত সাদাসিধে। এদের নেক রাস্তা দেখানো প্রয়োজন।

নায়ীম এমনি করে ভাবছেন আর ভাবছেন। হঠাৎ পেছন থেকে কারো পদধ্বনি শোনা গেলো। তিনি ফিরে দেখলেন, নার্গিস আসছে। সে কি যেনো চিন্তা করে ধীরে ধীরে পা ফেলে এলো নায়ীমের কাছে। তারপর ধরা গলায় বললো– আপনি এ ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বসে রয়েছেন?

নায়ীম চাঁদের মুগ্ধকর রৌশনীতে তার মুখের দিকে নজর করলেন। এ যেমন সুন্দর, তেমনি নিষ্পাপ। তিনি বললেন– নার্গিস! তোমার সাথীদের ছেড়ে কেন এলে তুমি?

: আপনি চলে এলেন। আমি ভাবলাম... আপনি... একাই রয়েছেন হয় তো!

এ ভাঙা ভাঙা কথাগুলো নায়ীমের কানে বাজিয়ে গেলো অনন্ত সুরঝংকার। এক লহমার জন্য তিনি নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে চেলে রইলেন নার্গিসের দিকে। তারপর আচানক উঠে একটি কথাও না বলে লম্বা লম্বা কদম ফেলে গিয়ে ঢুকলেন তার কামরায়। নার্গিসের কথাগুলো বহু সময় ধরে তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো এবং তিনি শয্যায় আশ্রয় নিয়ে বার বার পাশ

ফিরতে লাগলেন।

ভোরে নায়ীম ঘুম থেকে জেগে বাইরে গিয়ে ঝর্নার পানিতে অযু করে কামরায় ফিরে এসে ফজরের নামায পড়লেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। ফিরে এসে কামরায় ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, বেশির ভাগ সময় তিনি যেখানে নামায পড়েন, হুমান সেখানে চোখ বন্ধ করে কেবলার দিকে মুখ করে রুকু সেজদার অনুকরণ করছে। নায়ীম নীরবে দরজায় দাঁড়িয়ে তার নির্বিকার অনুকরণ দেখে হাসতে লাগলেন। হুমান যখন নায়ীমের মতো বসে খানিকক্ষণ ঠোঁট নাড়াচাড়া করে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলো, তখন তার নজর পড়লো নায়ীমের উপর। সে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে এলো এবং তার পেরেশানি সংযত করতে গিয়ে বললো– আমি আপনার অনুকরণ করছিলাম। গাঁয়ের অনেক যুবক-যুবতী এমনি করছে। তারা বলে– যারা এমন করে থাকে তাদের খুব ভালো লোক বলে মনে হয়। আমি যখন আপনার কামরায় গেলাম তখন নার্গিসও এমনি করছিলো। আমি...।

নায়ীম বললেন– হুমান সব কিছুতেই তুমি কেন আমার অনুকরণের চেষ্টা করছো?

হুমানের জবাব– কারণ আপনি আমাদের চাইতে ভালো। আর আপনার প্রত্যেক কথাই আমাদের চাইতে ভালো।

: আচ্ছা বেশ, আজ গাঁয়ের তামাম লোককে এক জায়গায় জমা করো। আমি তাদের কাছে কিছু কথা বলবো।

: ওরা আপনার কথা শুনে খুব খুশি হবে। আমি এখখুনি তাদের একত্র করছি। হুমান দেরি না করে ছুটে চললো।

দুপুরের আগেই তামাম লোক এক জায়গায় জমা হলো। নায়ীম প্রথম দিন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারিফ করলেন। তিনি তাদের বললেন– আগুন পাথর সব জিনিসই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। এসবের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে সৃষ্ট জিনিসের পূজা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের কওমের অবস্থাও একদিন ছিলো তোমাদের কওমের মতোই। তারাও পাথরের মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করতো তারপর আমাদের মাঝে পয়দা হলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত এক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাদের এক নতুন পথ দেখালেন।

নায়ীম রাসূলে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিন্দেগীর কাহিনী শোনালেন তাদের। এমনি করে চললো আরও কয়েকটি বক্তৃতা। বস্তির

তামাম লোককে তিনি টেনে আনলেন ইসলামের দিকে। সবার আগে কালেমা পড়লো নার্গিস আর হুমান।

কয়েক দিনের মধ্যে বস্তির পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মনোমুগ্ধকর শ্যামল চারণভূমি মুখর হয়ে ওঠলো নায়ীমের ধ্বনিতে। নাচ গানের বদলে চালু হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামায।

নায়ীম এবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। তিনি কয়েকবার ফিরে যাবার ইরাদা করেছেন, কিন্তু বরফপাতের দরুন পাহাড়ী পথ বন্ধ থাকায় আরও কিছুকাল দেরি না করে উপায় ছিলো না।

নায়ীম বেকার বসে দিন কাটাতে অভ্যস্ত নন। তাই তিনি কখনও বস্তির লোকদের সাথে শিকার করতে যান। একদিন নায়ীম ভালুক শিকারে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেন। এক ভালুক শিকারীর তীরে জখমী হয়ে এমন হিংস্র হামলা শুরু করে, যাতে শিকারীরা এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। তারা নিজ নিজ জান বাঁচাবার জন্য বড় বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো ভালুকের দিকে। নায়ীম নেহায়েত স্বস্তির সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। ক্রুদ্ধ ভালুক তার ওপর হামলা করতে এগিয়ে এলো। নায়ীম বাম হাতে ঢাল তুলে আত্মরক্ষা করলেন এবং ডান হাতের নেযা ঢুকিয়ে দিলেন তার পেটে। ভালুক উল্টে পড়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র চিৎকার করে উঠে হামলা করলো নায়ীমের ওপর। ইতোমধ্যে তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে হাতে নিয়েছেন। ভালুক থাবা মারার আগেই নায়ীমের তলোয়ার গিয়ে লাগলো তার মাথায়। ভালুক পড়ে গিয়ে তড়পাতে তড়পাতে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

শিকারীরা তাদের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে হয়রান হয়ে তাকাতে লাগলো নায়ীমের দিকে। এক শিকারী বললো– আজ পর্যন্ত এত বড় ভালুক আর কেউ মারতে পারেনি। আপনার জায়গায় আজ আমাদের মধ্যে কেউ থাকলে তার ভালো হতো না। আজ পর্যন্ত কত ভালুক আপনি মেরেছেন?

নায়ীম তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে করতে বললেন– আজই প্রথম।

: প্রথম? সে হয়রান হয়ে বললো– আপনাকে তো নিপুণ শিকারী বলেই মনে হচ্ছে!

জবাবে বৃদ্ধ শিকারী বললো– অন্তরে বাহাদুরী, বাহুর হিম্মত আর তলোয়ারের তেজ যেখানে রয়েছে, সেখানে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

* * *

গাঁয়ের লোকদের কাছে নায়ীম হয়ে ওঠলেন মানবতার সর্বোচ্চ আদর্শ এবং তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ তাদের কাছে অনুকরণীয়। এ বস্তিতে এসে তার দেড় মাস কেটে গেছে। তার বিশ্বাস, কুতায়বা বসন্তকালের আগে হামলা করতে এগিয়ে আসবেন না। তাই প্রকাশ্যে তার সেখানে আরও কিছুকাল থাকায় কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু এক অনুভূতি নায়ীমকে অনেকখানি অশান্ত চঞ্চল করে তুললো।

নার্গিসের চাল-চলন তার শান্ত-সমাহিত অন্তরে আবার এক ঝড় তুললো। ধারণার দিক দিয়ে তিনি প্রথম যৌবনের রঙিন স্বপ্ন সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় রূপের প্রভাব আর একবার তার মনে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে সেই ঘুমন্ত অনুভূতি।

বস্তির লোকদের মধ্যে নার্গিস রূপ, গুণ, আকৃতি, স্বভাব ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে তার চোখে। গোড়ার দিকে বস্তির লোকেরা যখন নায়ীমকে ভালো করে জানতো না, তখন নার্গিস অসংকোচে তার সামনে এসেছে। কিন্তু বস্তির লোকেরা যখন তার সাথে অসংকোচে মেলামেশা করতে লাগলো, তখন নার্গিসের অসংকোচ সংকোচে রূপান্তরিত হলো। আকাঙ্ক্ষার চরম আকর্ষণ তাকে নিয়ে যায় নায়ীমের কামরায়, কিন্তু চরম সংকোচ-শরম তাকে সেখানে দাঁড়াতে দেয় না। নায়ীমকে সারাদিন অচঞ্চল দৃষ্টিতে দেখবে মনে করে সে তার কামরায় যায়, কিন্তু নায়ীমের সামনে গেলেই তার সব ধারণা ভুল হয়ে যায়। অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র মানুষটির দিকে তাকালেই তার দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়ে এবং কম্পিত অন্তরে সকল আবেদন, অনুনয় এবং প্রেরণা সত্ত্বেও আর একবার নজর তোলার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না সে কিছুতেই। যদি বা কখনও সে সাহস যোগায়, তবুও নায়ীম ও তার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় হায়া-শরমের দুর্ভেদ্য পর্দা। এমনি অবস্থায় নায়ীম তাকে দেখছেন ভেবে সে হয় তো আশ্বাস পায়, কিন্তু যখন সে ভুল করে এক আধ বার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দেখে, তিনি গর্দান নীচু করে পুস্তিনের পশমের ওপর হাত বুলাচ্ছেন অথবা হাত দিয়ে একটির পর একটি শুকনো ঘাস ছিঁড়ছেন। এসব দেখে শুনে তার অন্তরের ধূমায়িত অগ্নিশিখা নিভে আসে, তার শিরা-উপশিরায় বয়ে যায়

হিমশীতল রক্তপ্রবাহ। তার কানে গুঞ্জরিত সংগীত-ঝংকার নির্বাক হয়ে আসে, তার চিন্তার সূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তার অন্তরে এক অসহনীয় বোঝা নিয়ে সে ওঠে নায়ীমের দিকে হতাশ দৃষ্টি হেনে, তারপর বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

গোড়ার দিকে যেখানে এক নিষ্পাপ যুবতীর মহব্বত ভালোবাসা একটি মানুষের অন্তরে আকাঙ্ক্ষার তুফান আর ধারণা-কল্পনার ঝড় সৃষ্টি করে দেয়, সেখানেই কতকগুলো অসাধারণ চিন্তা তাকে কর্ম ও সংগ্রামের সাহস থেকে বঞ্চিত করে।

নায়ীম হয়ে ওঠেছেন নার্গিসের ধারণা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের ছোট্ট দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তার অন্তর আনন্দে উচ্ছল। কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গেলেই সংখ্যাতীত আশঙ্কা তাকে পেরেশান করে তোলে। সে সামনে না গিয়ে চুপি চুপি তাকে দেখে। কখনও এক কাল্পনিক সুখের চিন্তা তার অন্তর আনন্দোজ্জ্বল করে দেয়। আবার এক কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কা তাকে প্রহরের পর প্রহর অশান্ত-চঞ্চল করে রাখে।

নায়ীমের মত আত্মসচেতন লোকের পক্ষে নার্গিসের অন্তরের অবস্থা আন্দাজ করা মোটেই মুশকিল ছিলো না। মানুষের মন জয় করার যে শক্তি তার ভেতরে রয়েছে, সেটা তার অজানা নেই। কিন্তু এ বিজয়ে তিনি খুশি হবেন কি না, তার মীমাংসা করে ওঠতে পারেন না আপন মনে।

একদিন এশার নামাযের পর নায়ীম হুমানকে তার কামরায় ডেকে ফিরে যাবার ইরাদা জানালেন। হুমান জবাবে বললো, আপনার মর্জির খেলাফ আপনাকে বাধা দেবার সাহস নেই আমার, কিন্তু আমায় বলতেই হবে, বরফ-ঢাকা পাহাড়ী পথ এখনও সাফ হয়নি। কমসে-কম আরও একমাস আপনি দেরী করুন। মওসুম বদল হলে আপনার সফর সহজ হবে।

নায়ীম জবাব দিলেন– বরফপাতের মওসুম তো এখন শেষ হয়ে গেছে, আর সফরের ইরাদা আমার কাছে সমতল ও বন্ধুর দুর্গম পথ একই রকম করে দেয়। আমি আগামীকাল ভোরেই চলে যাবার ইরাদা করে ফেলেছি।

: এত্ত জলদি! আগামীকাল তো আমরা আপনাকে যেতে দেবো না।

: আচ্ছা, ভোরে দেখা যাবে। বলে নায়ীম বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েন।

হুমান ওঠলো নিজের কামরায় যাবার জন্য। পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে নার্গিস। হুমানকে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেলো গাছের আড়ালে। হুমান অপর

কামরায় চলে গেলে নার্গিসও এসে তার পিছু পিছু ঢুকলো।

হুমান বললো– নার্গিস, বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এর মধ্যে তুমি কোথায় ঘুরছো?

নার্গিস জবাব দিলো– কোথাও না, এমনি ঘরের বাইরে ঘুরছিলাম আর কি!

কামরাটি নায়ীমের বিশ্রামের কামরা থেকে একটুখানি দূরে। মেঝের ওপর শুকনো ঘাস বিছানো কামরার এক কোণে শুয়ে পড়লো হুমান, অপর কোণে নার্গিস।

হুমান বললো– নার্গিস, উনি আগামীকাল চলে যাবার ইরাদা করছেন।

নার্গিস আগেই নিজের কানে নায়ীম ও হুমানের কথাবার্তা শুনেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে এমন নয় যে, সে চুপ করে থাকবে।

সে বললো– তা তুমি ওকে কি বললে?

: আমি ওকে দেরি করতে বললাম, কিন্তু ওকে অনুরোধ করতেও আমার ভয় লাগে। উনি চলে গেলে গাঁয়ের লোকেরও আফসোস হবে খুবই। ওদের আমি বলবো সবাই মিলে ওকে বাধ্য করবে থেকে যেতে।

হুমান নার্গিসের সাথে কয়েকটি কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়লো। নার্গিস বার বার পাশ ফিরে ঘুমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর ওঠে বসলো। 'উনি যদি চলেই যাবেন এমনি করে, তাহলে এলেন কেন?' এই কথা ভাবতে ভাবতে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কদম ফেলে কামরার বাইরে নায়ীমের কামরার চারদিকে ঘুরে দেখলো। তার পর ভয়ে ভয়ে দরজা খুললো। কিন্তু সামনে কদম ফেলার সাহস হলো না। ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে আর নায়ীম পুস্তিনে গা ঢেকে ঘুমাচ্ছে। তার মুখ চিবুক পর্যন্ত খোলা। নার্গিস আপন মনে বললো– 'শাহজাদা আমার! তুমি চলে যাচ্ছো! জানি না, কোথায় যাচ্ছো! তুমি, তুমি কি জানো, তুমি কি ফেলে যাচ্ছো এখানে, আর কি নিয়ে যাচ্ছো! এই পাহাড়, এই চারণভূমি, বাগ-বাগিচা আর ঝর্নার সবটুকু সৌন্দর্য, সবটুকু তুমি নিয়ে যাবে তোমার সাথে, আর এখানে পড়ে থাকবে তোমার স্মৃতি। ... শাহজাদা, শাহজাদা আমার! ... ... না, না, তুমি আমার নও, আমি তোমার যোগ্য নই।' ভাবতে ভাবতে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে আবার ঢুকলো কামরার ভেতরে এবং নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে তাকিয়ে রইলো নায়ীমের দিকে।

আচানক নায়ীম পাশ ফিরলেন। নার্গিস ভয় পেয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কয়েক বার উঠে উঠে সে আবার শুয়ে পড়ে আপন মনে বললো– ওহ্, রাত এত দীর্ঘ!

ভোরে এক রাখাল আযান দিলো। বিছানা ছেড়ে নায়ীম অযু করতে গেলেন ঝর্নার ধারে। নার্গিস আগে থেকেই রয়েছে সেখানে। তাকে দেখেও নায়ীমের কোন ভাবান্তর হলো না। তিনি বললেন– নার্গিস, আজ তুমি সকালে এসে গেছো এখানে?

রোজ নার্গিস এ গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নায়ীমকে। আজ সে নায়ীমের নির্বিকার ঔদাসীন্যের জন্য অভিযোগ জানাতে তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু নায়ীম বেপরোয়াভাবে আলাপ করায় তার উৎসাহের আগুন নিভে গেলো। তবুও সে সংযত হয়ে থাকতে পারলো না। অশ্রুসজল চোখে সে বললো, আপনি আজই চলে যাচ্ছেন?

: হ্যাঁ নার্গিস! এখানে এসে আমার বহুত দিন কেটে গেলো। আমার জন্য কত তকলিফই না করলে তোমরা। হয় তো আমি তার শোকরিয়া জানাতে পারবো না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এর প্রতিদান দিন।

এ কথা বলে নায়ীম একটা পাথরের ওপর বসে অযু করতে লাগলেন ঝর্নার পানিতে। নার্গিস আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু নায়ীমের কার্যকলাপ তার উৎসাহ নিভিয়ে দেয়। অন্তরে যে ঝড় বইছিলো তা থেমে আসে। গাঁয়ের বাকি লোকেরা ঝর্নার কাছে অযু করতে এলে নার্গিস সরে পড়ে সেখান থেকে।

ইসলাম কবুল করার আগে যে বড় খিমায় গাঁয়ের লোকেরা নাচ-গানে অবসর সময় কাটাতো, এখন সেখানেই হচ্ছে নামায। নায়ীম অযু করে খিমায় ঢুকলেন। গাঁয়ের লোকদের নামায পড়ালেন এবং দোয়া শেষ করে তাদের জানালেন চলে যাবার ইরাদা।

নায়ীম হুমানকে সাথে নিয়ে বাইরে এলেন। বাড়িতে পৌঁছে তার কামরায় গেলেন। হুমান নায়ীমের সাথে ঢুকতে গিয়ে পেছনে গাঁয়ের লোকদের আসতে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকালো।

এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো– সত্যি সত্যি উনি চলে যাচ্ছেন তা হলে?

হুমান বললো– হ্যাঁ, উনি থাকবেন না বলে আমার আফসোস হচ্ছে।

: আমরা অনুরোধ করলেও থাকবেন না?

: তা হলে হয় তো থাকতে পারেন, কিন্তু ঠিক বলতে পারি না। তবু আপনারা ওকে বলে দেখুন। উনি যেদিন এলেন, সেদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে যেনো দুনিয়ার বাদশাহী পেয়ে গেছি। আপনারা বয়সে আমার বড়। আপনারা চেষ্টা করুন। আপনাদের কথা উনি মানতেও পারেন।

নায়ীম বর্ম-পরিহিত অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে এলেন। তাকে আজ সত্যি মনে হচ্ছে যেনো এক শাহজাদা। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখেই সমস্বরে কোলাহল শুরু করে দেয়– যেতে দেবো না আমরা, কিছুতেই যেতে দেবো না।

নায়ীম তার বিশ্বস্ত মেজবানদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং খানিকক্ষণ নীরব থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে তারা সবাই চুপ করলো।

নায়ীম এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন–

বেরাদরান!

কর্তব্যের আহ্বানে বাধ্য না হলে আমার আরও কিছুদিন এখানে থাকতে আপত্তি হতো না, কিন্তু আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, জেহাদ এমন এক ফরয, যা কোনো অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যায় না। আপনাদের মহব্বতের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি, খুশি হয়ে আপনারা আমায় এজাযত দেবেন।

নায়ীম তার কথা শেষ না করতেই একটি ছোট ছেলে চিৎকার করে বলে ওঠলো– আমরা যেতে দেবো না।

নায়ীম এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন– আপনাদের উপকার হামেশা আমার মনে থাকবে। এ বস্তির কল্পনা হামেশা আমার মন আনন্দে ভরপুর করে রাখবে। এ বস্তিতে আমি এসেছি অপরিচিত হিসাবে। আজ এ কয়েক সপ্তাহ পর এখান থেকে বিদায় নিতে গিয়ে আমি অনুভব করছি, আমি আমার প্রিয়তম ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ চাহেন তো আর একবার আমি এখানে আসার চেষ্টা করবো।

এরপর নায়ীম তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে দোয়া করে সকলের সাথে মোসাফাহা করতে শুরু করেন। হুমানও আর সব লোকদের মতো রাজি হলো তার মর্জির বিরুদ্ধে। নায়ীমের জন্য সে নিয়ে এলো তার খুবসুরত সাদা ঘোড়াটি এবং নেহায়েত আন্তরিকতা সহকারে অনুরোধ করলো এ তোহফা কবুল করতে।

নায়ীম তাকে শোকরিয়া জানালেন। হুমান ও গাঁয়ের আরও পনের জন নওজোয়ান নায়ীমের সাথে যেতে চাইলো জেহাদে যোগ দিতে। কিন্তু সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পৌঁছে প্রয়োজনমতো নায়ীম তাদের ডেকে পাঠাবেন, এ ওয়াদা পেয়ে তারা আশ্বস্ত হলো। বিদায় নেবার আগে নায়ীম এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু নার্গিসকে দেখতে পেলেন না। তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তিনি যেতে চান না, কিন্তু সে মুহূর্তে তার কথা কারও কাছে জিজ্ঞেস

করাটাও ভালো দেখায় না।

হুমানের সাথে মোসাফাহা করতে গিয়ে একবার তাকালেন মেয়েদের ভিড়ের দিকে। নার্গিস হয় তো তার মতলব বুঝে ফেলেছে। তাই সে ভিড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো নায়ীমের কাছ থেকে কিছুটা দূরে। নায়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নার্গিসের দিকে বিদায়ী দৃষ্টি হানলেন। এ প্রথম বার নায়ীমের চোখের সামনে দৃষ্টি অবনত হলো না। এক পাথরের মূর্তির মতো নিঃসাড় নিশ্চল হয়ে এক অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি, কিন্তু চোখে তার অশ্রু নেই। বেদনার আতিশয্যে চোখের পানি শুকিয়ে যায়, তা জানা আছে নায়ীমের। তিনি যেন সইতে পারেন না এ মর্মন্তুদ দৃশ্য! তার মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবু থেকে যাওয়া তার পক্ষে মুশকিল। নায়ীম আর একদিকে মুখ ফেরালেন। হুমান ও গাঁয়ের আরও কত লোক তাঁর সাথে যেতে চাইলো কিছুদূর, কিন্তু তাদের মানা করে তিনি ঘোড়া ছুটালেন দ্রুত গতিতে।

উঁচু নীচু টিলায় চড়ে লোকেরা দেখতে লাগলো নায়ীমের চলে যাবার শেষ দৃশ্য। কিন্তু নার্গিস সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার পা যেন জমিনে ধসে গেছে, নড়াবার শক্তিও যেনো নেই তার। কয়েকজন সখী এসে জমা হলো তার পাশে। তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ জমররুদ বিষণ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গাঁয়ের মেয়েদের জমা হতে দেখে সে বললো– তোমরা কি দেখছো এখানে? নিজ নিজ ঘরে চলে যাও। জমররুদের কথায় কেউ কেউ সরে গেলো বটে, আবার কেউ কেউ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। জমররুদ নার্গিসের কাঁধে হাত রেখে বললো– চলো নার্গিস!

নার্গিস চমকে ওঠে জমররুদের দিকে তাকালো। তারপর কোন কথা না বলে তার সাথে সাথে খিমার ভেতর প্রবেশ করলো। নায়ীম যে পুস্তিনটি ব্যবহার করতেন, তা সেখানেই পড়েছিলো। নার্গিস বসতে বসতে সেটি হাতে তুলে নিলো। পুস্তিনটি দিয়ে মুখ ঢাকতেই তার দু'চোখ বেয়ে নামলো অশ্রুর বন্যা। জমররুদ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। অবশেষে নার্গিসের বাহু ধরে নিজের দিকে টেনে এনে সে বললো– নার্গিস! তুমি হতাশ হলে? উনি কতবার ওয়াজ করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত সম্পর্কে কখখনো হতাশ হতে নেই। প্রার্থীকে তিনি সব কিছুই দিতে পারেন। ওঠো নার্গিস, বাইরে যাই। তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

নার্গিস অশ্রু মুছে ফেলে জমররুদের সাথে বেরিয়ে গেলো। বস্তির সব কিছুই তার চোখে ম্লান হয়ে এসেছে।

* * *

দুপুরের সূর্য নীল আকাশে পূর্ণ গৌরবে তার কিরণ-জাল বিকিরণ করছে। বস্তির বাইরে এক খেজুর-কুঞ্জের ঘন ছায়ায় কয়েকটি লোক জমা হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক লোক বসে কথা বলছে, আর বাকি লোকেরা পড়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কুতায়বা, মুহাম্মদ বিন কাসেম ও তারেকের বিজয়-কাহিনী।

এক নওজোয়ান প্রশ্ন করলো– আচ্ছা, এ তিন জনের মধ্যে বাহাদুর কে?

একজন কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলো– মুহাম্মদ বিন কাসেম।

এক লোক ঘুমের নেশায় ঝিমুচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসেমের নাম শুনে সে হুশিয়ার হয়ে বসলো।

: মুহাম্মদ বিন কাসেম! আরে, তিনি আবার বাহাদুর? সিন্ধুর ভীতু রাজাদের তাড়িয়েছেন, এই তো! তাতেই হলেন বাহাদুর! লোক যে তাকে ভয় করে, তার কারণ তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা। তার চাইতে তারেক অনেক বড়। লোকটি এই কথা বলে চোখ মুদলো আবার।

তার কথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সমর্থক বিরক্ত হয়ে বললো– চাঁদের দিকে থুতু ফেললে তা নিজেরই মুখে পড়ে। আজকের ইসলামী দুনিয়ায় মুহাম্মদ বিন কাসেমের মোকাবেলা করার মতো কেউ নেই।

তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো– মুহাম্মদ বিন কাসেমকে আমরা দেখি ইজ্জতের দৃষ্টিতে, কিন্তু এ কথা কখখনো স্বীকার করবো না, ইসলামী দুনিয়ায় তার মোকাবেলার যোগ্য কেউ নেই। আমার ধারণা, তাদেরকের মোকাবেলা করার যোগ্য নেই আর কোনো সিপাহী।

চতুর্থ ব্যক্তি বললো– এও ভুল। কুতায়বা এদের চাইতে বাহাদুর।

তারেকের সমর্থক বললো– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...! কোথায় তারেক আর কোথায় কুতায়বা। কুতায়বা মুহাম্মদ বিন কাসেমের চাইতে বাহাদুর– এ কথা আমি মানি, কিন্তু তারেকের সাথে তার তুলনা চলে না।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের সমর্থক আবার বিরক্তির স্বরে বললো– তোমার ছোট মুখে মুহাম্মদ বিন কাসেমের নামও শোভা পায় না।

তারেকের সমর্থক জবাব দিলো– আর তোমার ছোট মুখে আমার সাথে কথা

বলাও শোভা পায় না।

এরপর দু'জনই তলোয়ার টেনে নিয়ে পরস্পরের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যখন লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে, তখনই দেখা গেলো, আবদুল্লাহ আসছেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। আবদুল্লাহ দূর থেকে এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ঘোড়া হাঁকালেন দ্রুতগতিতে। দেখতে দেখতে তিনি এসে দাঁড়ালেন তাদের মাঝখানে এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন লড়াইয়ের কারণ।

এক ব্যক্তি ওঠে বললো– তারেক বড় না মুহাম্মদ বিন কাসেম বড়– এ প্রশ্নের মীমাংসা করছে এরা।

: থামো! আবদুল্লাহ হেসে বললেন– তোমরা দু'জনই ভুল করছো। যুদ্ধরত লোক দুটিও এ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। আবদুল্লাহ বললেন– মুহাম্মদ বিন কাসেম ও তারেক তোমাদের নিন্দা-প্রশংসার ধার ধারেন না। তোমরা কেন মুফতে একে অপরের গর্দান কাটতে যাচ্ছো? শোন, তারেককে কেউ মুহাম্মদ বিন কাসেমের চাইতে বড় বললে তিনি তা পছন্দ করবেন না, আর মুহাম্মদ বিন কাসেমও শুনে খুশি হবেন না যে, তিনি তারেকের চাইতে বড়। যারা আল্লাহর হুকুমে সব কিছু কুরবান করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ ময়দানে যান, তারা এমনই বাজে কথার ধার ধারেন না। তোমরা তলোয়ার কোষবদ্ধ কর, তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামিও না।

আবদুল্লাহর কথায় সবাই চুপ করে গেলো এবং লড়াই করতে উদ্যত লোক দুটি লজ্জায় অধোবদন হয়ে তলোয়ার কোষবদ্ধ করলো। সবাই একে একে আবদুল্লাহর সাথে মোসাফাহা করতে লাগলো। আবদুল্লাহ এক ব্যক্তির কাছে নিজের বাড়ির খবর জানতে চাইলেন। সে জবাব দিলো, আপনার বাড়ির সবাই কুশলে আছেন। গতকাল আমি আপনার বাচ্চাকে দেখলাম, মাশাআল্লাহ! আপনারই মতো জোয়ান মরদ হবে।

: আমার বাচ্চা! আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন।

: ওহ্হো! এখনও আপনি খবর পাননি। তিন চার মাস হলো। মাশাআল্লাহ! আপনি এক সুদর্শন ছেলের বাপ হয়েছেন। গতকাল আমার বিবি আপনার বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এসেছিল। আমার বাচ্চা তাকে নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে।

আবদুল্লাহ লজ্জায় চোখ অবনত করলেন এবং সেখান থেকে ওঠে বাড়ির পথ ধরলেন। তার মন চায় এক লাফে বাড়িতে পৌঁছে যেতে, কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে লজ্জায় তিনি মামুলি গতিতে ঘোড়া ছুটালেন। গাছ-গাছড়ার

আড়ালে গিয়েই তিনি ঘোড়া ছুটালেন পূর্ণ গতিতে।

আবদুল্লাহ বাড়িতে ঢুকে দেখলেন– আযরা খেজুরের ছায়ায় চারপায়ীর উপর শুয়ে রয়েছেন। তার ডান পাশে শায়িত এক খুবসুরত বাচ্চা তার হাতের আঙুল চুষছে। আবদুল্লাহ নীরবে এক কুরসী টেনে আযরার বিছানার কাছে বসে পড়লেন। আযরা স্বামীর মুখের ওপর লজ্জাভারাক্রান্ত দৃষ্টি হেনে উঠে বসলেন। আবদুল্লাহ হেসে ফেললেন। আযরা দৃষ্টি অবনত করে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন তার মাথায়। আবদুল্লাহ হাত বাড়িয়ে আযরার হাতে চুমো খেলেন। তারপর ধীরে বাচ্চাকে তুলে নিলেন এবং তার পেশানীতে হাত বুলিয়ে তাকে কোলে শুইয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। বাচ্চা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আবদুল্লাহর কোমরে ঝুলানো খঞ্জরের চমকদার হাতলের দিকে। সে যখন এদিক-ওদিক হাত চালিয়ে হাতলটি ধরলো, তখন আবদুল্লাহ নিজে তার খঞ্জরের হাতল তুলে দিলেন তার হাতে। বাচ্চা হাতলটি মুখে নিয়ে চুষতে লাগলো।

আযরা তার হাত থেকে খঞ্জরের হাতল ছাড়াবার চেষ্টা করে বললেন– চমৎকার খেলনা নিয়ে এসেছেন আপনি!

আবদুল্লাহ হেসে বললেন– মুজাহিদের বাচ্চার জন্য এর চাইতে ভালো খেলনা আর কি হবে?

: যখন এ ধরনের খেলনা নিয়ে খেলার সময় আসবে, তখন দেখবেন, ইনশাআল্লাহ খারাপ খেলোয়াড় হবে না ও।

: আযরা, ওর নাম কি?

: আপনি বলুন!

: আযরা, একটি নামই তো আমার ভালো লাগে।

: বলুন!

আবদুল্লাহ বিষণ্ন আওয়াজে জবাব দিলেন– নায়ীম!

শুনে আযরার চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন– আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ নামই আপনি পছন্দ করবেন। তাই আগেই আমি ওর এ নাম রেখে দিয়েছি।

* * *

নার্গিসদের বস্তি থেকে বিদায় নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে নায়ীম তাতারী পশু-পালকদের এক বস্তিতে গিয়ে রাত কাটালেন। সেখানকার লোকদের চালচলন ও রীতিনীতির সাথে তিনি পরিচিত। তাই আশ্রয়স্থল খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি তার। বস্তির সরদার তাকে ইসলামী ফৌজের এক অফিসার মনে করে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করলো। সন্ধ্যায় খাবার খেয়ে নায়ীম ঘুরতে বেরুলেন। বস্তি থেকে কিছুদূর যেতেই শোনা গেলো ফৌজি নাকাড়ার আওয়াজ। পিছু ফিরে তিনি দেখলেন, গাঁয়ের লোকেরা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে এদিক ওদিক। নায়ীম ছুটে তাদের কাছে গিয়ে তাদের পেরেশানীর কারণ জানতে চাইলেন।

গাঁয়ের সরদার বললো– নাযযাকের সেনাবাহিনী মুসলমানদের লশকরের ওপর ব্যর্থ হামলা করে পিছু হটে এসে এগিয়ে যাচ্ছে ফারগানার দিকে। আমি খবর পেয়েছি, তাদের রাস্তায় যে বস্তিই আসছে, তার ওপর তারা লুটপাট চালাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, তারা এ পথ দিয়ে গেলে আমাদের ভীষণ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওই পাহাড়ে চড়ে তাদের খোঁজ নিচ্ছি।

নায়ীম বললেন– আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে।

নায়ীম ও তাতারী সরদার ছুটে চলে গেলেন পাহাড়চূড়ায়। সেখান থেকে দেড় ক্রোশ দূরে তাতারী লশকর আসতে দেখা গেলো। সরদার খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খুশিতে উছলে উঠে বললো– সত্যি বলছি, ওরা এদিকে আসবে না। ওরা ভিন্ন পথ ধরেছে। খানিকক্ষণ আগেও আমি মনে করেছি, আপনার আগমন আমাদের জন্যে এক অশুভ ইংগিত, কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে, আপনি মানুষ নন, এক আসমানী দেবতা। আপনার কারামতেই এ ক্ষুধিত নেকড়ের দল আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। এ কথা বলে সে নায়ীমের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেমে গেলো নিচের দিকে। বস্তির লোকদের সে খোশখবর শোনালো। অমনি তারা সবাই চাক্ষুষ দেখার জন্য উঠে গেলো পাহাড়ের ওপর।

গোধূলির ম্লান আভা মিশে গেলো রাতের অন্ধকারে। বস্তির খানিকটা দূরে ফারগানাগামী রাস্তায় ফৌজের অগ্রগতির অস্পষ্ট দৃশ্য দেখা যায়। ঘোড়ার আওয়াজ ও নাকাড়ার ধ্বনি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। বস্তির লোকেরা আশ্বস্ত হয়ে হল্লা করে, দাপাদাপি করে, নেচে গেয়ে ফিরে এলো বস্তির দিকে।

এশার নামায শেষ করে শুয়ে পড়তেই নায়ীমের চোখে নামলো গভীর ঘুম।

স্বপ্নের আবেশে মুজাহিদ আর একবার দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তীরবৃষ্টি ও তলোয়ারের হামলা উপেক্ষা করে দুশমনের সারি ভেদ করে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। ভোরে উঠে নামায পড়ার পর তিনি রওয়ানা হলেন মনযিলে মকসুদের দিকে।

আরও কয়েক মনযিল অতিক্রম করে যাবার পর একদিন ইসলামী লশকরের তাঁবু নায়ীমের নজরে পড়লো। মারভ থেকে তার লশকর অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি হয়রান হয়েছিলেন। তবুও তার ধারণা হলো, হয় তো তাতারীদের হামলা তাদের সময়ের আগেই এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলী তাঁর প্রিয় সালারকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য সালাররাও তাঁর আগমনে অসীম আনন্দ প্রকাশ করলেন।

নায়ীমকে অনেক প্রশ্ন করা হলো। জবাবে তিনি সংক্ষেপে শোনালেন তার কাহিনী। তারপর নায়ীম কয়েকটি প্রশ্ন করলেন কুতায়বা বিন মুসলিমের কাছে। জবাবে তিনি জানলেন, তাতারীদের পরাজিত করে নাযযাকের পিছু ধাওয়া করছেন।

রাতের বেলায় কুতায়বা বিন মুসলিম তাঁর সালার ও মন্ত্রণাদাতাদের মজলিসে অগ্রগতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেন। নায়ীম তাঁকে বুঝালেন, ইবনে সাদেক তার নতুন চক্রান্তের কেন্দ্র করে তুলবে এবার ফারগানাকে। তাই তার অনুসরণ করতে দেরি করা উচিত হবে না।

ভোরবেলা সেনাবাহিনী অগ্রসর হওয়ার জন্য নাকাড়া বেজে ওঠলো। কুতায়বা সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এগিয়ে যাবার জন্য দুটি ভিন্ন রাস্তা নির্দেশ করে দেন। অর্ধেক ফৌজের নেতৃত্ব থাকলো তাঁর নিজের ওপর, আর বাকী অর্ধেকের নেতৃত্ব সোপর্দ করলেন তাঁর ভাইয়ের ওপর। নায়ীম ছিলেন দ্বিতীয় দলের শামিল। পথ-ঘাটের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে নায়ীমের জানা আছে বলেই কুতায়বার ভাই তাকে অগ্রগামী সেনাদলে রাখেন।

* * *

নার্গিস এক পাথরের ওপর বসে ঝর্নার স্বচ্ছ পানি নিয়ে খেলছে। ছোট ছোট কাঁকর তুলে সে ছুঁড়ে ফেলছে পানিতে। তারপর কি করে তা ধীরে ধীরে পানির তলায় চলে যাচ্ছে, তাই সে দেখছে আপন মনে। একটি কাঁকর এমনি করে তলায় গিয়ে পৌঁছলে সে আর একটি ছুঁড়ে মারছে পানির ওপর। কখনও বা তার মন এ খেলা থেকে সরে গিয়ে নিবিষ্ট হচ্ছে সামনের ময়দানের দিকে।

বিস্তীর্ণ ময়দানের শেষে ঘন গাছপালার সবুজ লেবাসে ঢাকা পাহাড়রাজি দণ্ডায়মান। এসব পাহাড়ের পরেই উঁচু উঁচু পাহাড়ের সফেদ বরফ ঢাকা চূড়াগুলো নজরে পড়ে। বসন্ত মওসুমের সূচনা করে মুগ্ধকর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ডান দিকে সেব গাছ আর আঙুর লতায় ফল ধরতে শুরু করেছে।

নার্গিস তার আপন চিন্তায় বিভোর, অমনি পেছন থেকে জমররুদ নিঃশব্দ পদপেক্ষে এসে পাথর তুলে মারলো পানির ওপর। উছলে ওঠা পানির ছিঁটা এসে পড়লো নার্গিসের কাপড়ের ওপর। নার্গিস ঘাবড়ে গিয়ে তাকালো পেছন দিকে। জমররুদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু নার্গিসের দিক থেকে কোন সাড়া এলো না। জমররুদ হাসি সংযত করে মুখের ওপর নার্গিসেরই মতো গাম্ভীর্য টেনে এনে তার কাছে এসে বসলো।

: নার্গিস! আমি তোমাকে আজ অনেক খুঁজেছি। এখানে কি করছো তুমি?

এক হাতে পানি নিয়ে খেলতে খেলতে নার্গিস জবাব দিলো– কিছুই না।

: তুমি আর কতকাল এমনি করে তিলে তিলে জান দেবে। তোমার দেহ যে আধখানা হয়ে গেছে। কি রকম পাণ্ডুর হয়ে গেছো তুমি!

: জমররুদ! বার বার আমাকে বিরক্ত করো না, যাও!

: আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করতে আসিনি নার্গিস! তোমাকে দেখে আমি কতটা পেরেশান হয়েছি তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

জমররুদ নার্গিসের গলা বাহু বেষ্টন করে তার মাথাটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো। নার্গিসও এক রুগ্ন বাচ্চার মতো তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলো। জমররুদ নার্গিসের পেশানীর ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললো– হায়! আমি যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারতাম!

নার্গিসের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ব্যথাতুরকণ্ঠে সে বললো– আমার যা হবার হয়ে গেছে। পাহাড়-চূড়ার মুগ্ধকর দৃশ্য আমি দেখেছি, কিন্তু দুর্গম পথের চিন্তা করিনি। জমররুদ! উনি আমার জন্য নন। আমি তার যোগ্যই নই। তার সম্পর্কে কোনো নালিশও নেই আমার। হয় তো আমার মতো হাজারও মেয়ে তার পায়ের ধুলা চোখের সুরমা বানাবার জন্য উদগ্রীব, কিন্তু ... কেন তিনি এলেন এখানে? যদি এলেন তো কেন চলে গেলেন? কেন তাকে দেখেই আমি এমন বেকারার– এমন পেরেশান হলাম? আমি তাকে সব কিছুই খুলে বলতাম, কিন্তু কোন শক্তি আমার জবানকে এমন করে দাবিয়ে রাখলো? তিনি আমাদের থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র, জেনেশুনেও কেন আমি নিজেকে তার পায়ে সঁপে দিতে চেষ্টা করলাম? এ পরিণামের ভয় আমি

করেছি, কিন্তু হায়! ভয় যদি আমায় ফিরিয়ে রাখতো! জমররুদ! ছোটবেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখেছি, আসমান থেকে এক শাহজাদা নেমে আসবেন, আমি তার কাছে দিল-জবান সমর্পণ করে দিয়ে আপনার করে নেবো তাকে। আমার শাহজাদা এলেন, কিন্তু তাকে আমি আপনার করে নিতে পারিনি ভয়ে। জমররুদ! এও কি এক স্বপ্ন? এ স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে? জমররুদ! জমররুদ!! আমার কি হলো? তুমি কি এখনও বলবে, আমি সবর করিনি? হায়, সবর করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো!

: নার্গিস! প্রত্যেক স্বপ্নের সাফল্যের সময় ঠিক থাকে। অনন্ত হতাশার মধ্যেও অপেক্ষা আর আশা হবে আমাদের শেষ অবলম্বন। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করো। এমনি বিলাপ করে কোন ফায়দা নেই। ওঠো, এবার ঘুরে আসিগে।

নার্গিস ওঠে জমররুদের সাথে সাথে চললো। কয়েক কদম চলতেই ডান দিকে এক সওয়ারকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেলো। সওয়ার তাদের কাছে এসে ঘোড়া থামালেন। তাকে দেখে জমররুদ চিৎকার করে বললো– নার্গিস! নার্গিস!! তোমার শাহজাদা এসেছেন!

নার্গিস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার অন্তর রাজ্যের বাদশাহ তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেনো। অন্তহীন খুশি অথবা অন্তহীন বিষাদের ভেতর মানুষ যেমন নিশ্চল হয়ে যায়, নার্গিসের অবস্থাও তাই। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নাবেশে চলার মত দু'তিন কদম সামনে গিয়েই সে পড়ে গেলো জমিনের ওপর। নায়ীম তখ্‌খুনি ঘোড়া থেকে নেমে নার্গিসকে ধরে তুললেন।

: নার্গিস! এ কি হলো তোমার?

নার্গিস চোখ খুলে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো– কিছু না।

: আমায় দেখে ভয় পেলে তুমি?

নার্গিস কোন জবাব না দিয়ে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। এত কাছে থেকে তাকে দেখা তার প্রত্যাশার অতীত, কিন্তু নায়ীম তার অবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে দু'তিন কদম দূরে সরে দাঁড়ালেন। নার্গিস তার আঁচলে আসা ফুলের বিচ্ছেদ বরদাশত করতে পারলো না। তার দেহের প্রতি শিরা-উপশিরায় জাগলো এক অপূর্ব কম্পন। নারীসুলভ সংকোচের বাধা কাটিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে মুজাহিদের পায়ের ওপর ঝুঁকলো।

নায়ীমের সংযম বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তিনি নার্গিসের বাহু ধরে তুলে জমররুদের দিকে তাকিয়ে বললেন– জমররুদ! একে ঘরে নিয়ে যাও!

নার্গিস একবার নায়ীমের দিকে, আবার জমররুদের দিকে তাকাতে লাগলো। তার চোখ থেকে নামলো অশ্রুর বন্যা। সে মুখ ফিরিয়ে নিলো অপর দিকে। তারপর একবার নায়ীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরের দিকে চললো। নায়ীম জমররুদের দিকে তাকালেন। সে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়।

নায়ীম বিষণ্ন স্বরে বললেন– যাও জমররুদ! ওকে সান্ত্বনা দাওগে।

জমররুদ জবাব দিলো– কেমন সান্ত্বনা? আপনি এসে ওর শেষ অবলম্বনটুকুও ভেঙে চুরমার করে দিলেন। এর চাইতে না আসাই তো ভালো ছিলো।

: আমি হুমানের সাথে দেখা করতে এসেছি। সে কোথায়?

: সে গেছে শিকার করতে।

: তা হলে ঘর পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে নিরর্থক। হুমানকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, নিরূপায় বলেই আমি দেরি করতে পারিনি। আমাদের ফৌজ এগিয়ে যাচ্ছে ফারগানার দিকে।

কথাটি বলেই নায়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কিন্তু জমররুদ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরে বললো, আমি মনে করেছিলাম আপনার চাইতে নরম মনের মানুষ আর নেই, কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আপনি মাটির তৈরি নন, আর কোন জিনিসের তৈরি। এখন বদনসীবের দেহে জানটুকুও বাকী রইলো না।

নায়ীম একদিকে ইশারা করে বললো– জমররুদ! ওদিকে তাকাও!

জমররুদ তাকিয়ে দেখলো এক বিশাল লশকর এগিয়ে আসছে। সে বললো– হয় তো কোনো ফৌজ আসছে।

নায়ীম বললেন– ওই যে আমাদেরই ফৌজ আসছে। আমি হুমানের সাথে কয়েকটা কথা বলার জন্য ফৌজের আগে চলে এসেছিলাম।

জমররুদ বললো– আপনি দেরি করুন। সে আজ রাতেই এসে পড়বে হয় তো।

: এ মুহূর্তে আমার দেরি করা অসম্ভব। আমি আবার আসবো। নার্গিসের অন্তরে হয় তো আমার সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। তুমি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিও। ওর মন এতটা দুর্বল তা জানতাম না। ওকে আশ্বাস দিও, আমি নিশ্চয়ই আসবো। ওর মনের খবর আমি জানি।

: কথায় যতটা সম্ভব, আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি আগে থেকেই, কিন্তু এখন হয় তো ও আমার কথায় বিশ্বাস করবে না। হায়! আপনি নিজের মুখে যদি ওকে একটি কথা বলেও সান্ত্বনা দিতেন! এখন যদি আপনি ওর জন্য কোন নিশানী দিতে পারেন, তাহলে হয় তো ওকে সান্ত্বনা দিতে পারবো।

নায়ীম এক লহমা চিন্তা করে জেব থেকে রুমাল বের করে দিলেন জমররুদের হাতে। তারপর বললেন– এটা ওকে দিও।

বস্তির লোকেরা ফৌজ আসার খবরে ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। নায়ীম ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বললেন– কোন বিপদের কারণ নেই। তারা আশ্বস্ত হয়ে নায়ীমের আশপাশে জমা হতে লাগলো। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করতে লাগলেন ঘনিষ্ঠ হয়ে। ইতিমধ্যে ফৌজ এসে পৌঁছে বস্তির কাছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিচিত্র আকর্ষণ! বস্তির লোকেরা নায়ীমের সাথে ইসলামী ফৌজকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলো। নায়ীম সিপাহসালারের সাথে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফৌজের লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হবার পর কতক লোক জেহাদে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো। সিপাহসালার তখনই তৈরি হয়ে নেবার হুকুম দিলেন তাদের। এদের মধ্যে সব চাইতে বেশি আগ্রহ নার্গিসের চাচা বারমাকের। জিন্দেগীর পঞ্চাশটি বসন্ত ঋতু অতিক্রম করে আসার পরও তার সুগঠিত দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বস্তির নতুন সিপাহীদের প্রস্তুতির জন্য খানিকক্ষণ দেরি করতে হলো ফৌজকে।

খানিকক্ষণ পর বিশ জন সিপাহী তৈরি হয়ে এলে ফৌজকে এগিয়ে চলার হুকুম দেয়া হলো। বস্তির মেয়েরা ফৌজের অগ্রগতির দৃশ্য দেখার জন্য এসে জমা হলো এ পাহাড়ের ওপর। নায়ীম সবার অগ্রগামী দলের পথনির্দেশ করে চলেছেন। নার্গিস ও জমররুদ আর সব মেয়েদের দল থেকে আলাদা হয়ে ফৌজের আরও কাছে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলে যাচ্ছে। নার্গিসের হাতে নায়ীমের রুমাল।

নায়ীমের দিকে ইশারা করে জমররুদ বললো– নার্গিস! তোমার শাহজাদা তো সত্যি শাহজাদা হয়েই বেরিয়েছেন।

নার্গিস জবাব দিলো– আহা! তিনি যদি সত্যি আমার হতেন!

: তোমার এখনও বিশ্বাস প্রত্যয় আসছে না?

: বিশ্বাস প্রত্যয় আসছে, আবার আসছেও না। গভীর হতাশার মধ্যে যখন একবার আশার প্রদীপ নিভে যায়, তখন তা আর একবার জ্বেলে নেয়া বড়ই

মুশকিল। সত্যি বলতে তোমার কথায়ও আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আসে না। জমররুদ! সত্যি করে বলো তো, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা তো করছো না!

: না, তোমার বিশ্বাস না হলে ওকেই ডাকো। এখনও বেশি দূরে যাননি, কেমন?

: না জমররুদ, কসম খাও!

: কোন কসম খেলে তুমি বিশ্বাস করবে?

: তোমার শাহজাদার কসম খাও!

: কোন শাহজাদার?

: হুমানের।

: সে যে আমার শাহজাদা, তা তোমায় কে বললো?

: তুমিই বলেছো!

: কবে?

: যেদিন সে ভালুক শিকার করতে গিয়ে জখমি হয়ে ফিরে এলো, আর তুমি সারা রাত জেগে কাটালে।

: তাতে তুমি কি আন্দাজ করলে?

: জমররুদ! আচ্ছা, আমার কাছ থেকে কি গোপন করবে তুমি? এমন মুহূর্ত আমারও কেটেছে। উনিও যে জখমি হয়ে এসেছিলেন তা তোমার মনে নেই?

: আচ্ছা, তা হলে আমি ওর কসম খেলে তুমি বিশ্বাস করবে?

: হয় তো করবো।

: আচ্ছা, হুমানের কসম করেই বলছি, আমি ঠাট্টা করছি না।

: জমররুদ! জমররুদ!! নার্গিস তাকে চেপে ধরে বললো– তুমি আমাকে বার বার সান্ত্বনা না দিলে হয় তো আমি মরেই যেতাম! উনি কবে আসবেন, কেন জিজ্ঞেস করলে না তুমি?

: উনি খুব শিগগিরই আসবেন।

নার্গিস ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো– যদি শিগগিরই না আসেন তাহলে... তাহলে?

জমররুদ সলজ্জভাবে বললো– তাহলে আমি তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দেবো ওকে নিয়ে আসতে।

১১

ছয় মাস কেটে গেলো, কিন্তু নায়ীম আসছে না। ইতোমধ্যে কুতায়বা নায্যাককে কতল করে তুর্কিস্তানের বিদ্রোহের ধূমায়িত অগ্নিশিখা অনেকখানি ঠাণ্ডা করে এনেছেন। নায্যাকের জবরদস্ত সমর্থক শাহে জুর্জানও নিহত হয়েছেন। এ অভিযান শেষ করে কুতায়বা সুফদের বাকি এলাকা জয় করতে গিয়ে পৌছলেন সিস্তানে। সেখান থেকে আবার উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন খারেযম পর্যন্ত। খারেযম-শাহ জিযিয়া দেবার ওয়াদা করে শান্তি স্থাপন করলেন। খারেযম থেকে খবর পাওয়া গেলো, সমরকন্দবাসীরা চুক্তিভঙ্গ করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

কুতায়বা ফৌজের কয়েকটি দল সাথে নিয়ে হামলা করলেন সমরকন্দের ওপর এবং শহর অবরোধ করলেন। বোখারার মতোই সুদৃঢ় প্রাচীর ও মজবুত কেল্লা এ শহরটিকেও নিরাপদ করে রেখেছিলো। কুতায়বা আত্মবিশ্বাস সহকারে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। তিন মাস কেটে যাবার পর শাহে-সমরকন্দ শান্তির আবেদন পাঠালেন। জবাবে কুতায়বা সন্ধির শর্ত লিখে পাঠালেন। বাদশাহ শর্ত মঞ্জুর করে নিলে শহরের দরজা খুলে দেয়া হলো।

সমরকন্দের এক মন্দিরে ছিলো এক মহাসম্মানিত প্রস্তর মূর্তি। লোকে বলতো, সে মূর্তির গায়ে কেউ হাত লাগালে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কুতায়বা মন্দিরে ঢুকে 'আল্লাহু আকবার' তকবির ধ্বনি করে একই আঘাতে সে ভয়ঙ্কর মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। মূর্তির পেট থেকে বেরুলো পঞ্চাশ হাজার মিসকাল সোনা। কুতায়বা যখন এমনি সাহসের পরিচয় দিয়েও দেবতার রোষ থেকে নিরাপদ রইলেন, তখন সমরকন্দের বেশুমার লোক কালেমা তাওহিদ পড়লো।

কুতায়বা বিন মুসলিম বিজয় ও খ্যাতির সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে গেলেন। হিজরী

৯৫ সালে তিনি অভিযান চালালেন ফারগানার দিকে। বহু শহর তিনি জয় করলেন। এরপর তিনি ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে পৌঁছলেন কাশগড় পর্যন্ত। এর পরেই চীন সীমান্ত।

কাশগড়ে থেকে কুতায়বা চীন আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করবেন। চীনের শাহ কুতায়বার উদ্যোগ আয়োজনের খবর পেয়ে এক দূত পাঠিয়ে শান্তি আলোচনার জন্য একদল দূত প্রেরণের আবেদন জানান। দূত-দলের কর্তব্য পালনের যোগ্য মনে করে কুতায়বা হুবায়রা ও নায়ীম ছাড়া আরও পাঁচ জন অভিজ্ঞ অফিসারকে মনোনীত করলেন চীন যাবার জন্য।

* * *

চীনের বাদশাহর দূতাবাসে হুবায়রা, নায়ীম ও তাদের সাথীরা এক মনোরম গালিচার ওপর বসে আলাপ আলোচনা করছেন। হুবায়রা নায়ীমের কাছে প্রশ্ন করলেন– কুতায়বাকে কি খবর পাঠানো যায়? চীনের বাদশাহর লশকর আমাদের মোকাবেলায় অনেক বেশি। আপনি লক্ষ্য করেছেন, কতোটা গর্ব সহকারে তারা আমাদের সামনে এসেছে!

নায়ীম জবাবে বললেন– শাহে ইরানের চাইতে বেশি ক্ষমতা-গর্বিত নয় এরা। ক্ষমতার দিক দিয়েও এরা তার চাইতে বড় নয়। এখানকার আরামপিয়াসী ভীতু সিপাহীরা আমাদের ঘোড়ার খুরের দাপটেই ভয় পেয়ে পালাবে। আমরা আমাদের শর্ত পেশ করে দিয়েছি, তা জবাবের অপেক্ষা করুন। আপাততত কুতায়বাকে লিখে দিন, চীন জয়ের জন্য নতুন ফৌজের প্রয়োজন হবে না। লড়াই যদি করতেই হয়, তাহলে তুর্কিস্তানে যে ফৌজ মওজুদ রয়েছে, এদেশ জয় করার জন্য তারা যথেষ্ট।

এক সভাসদ কামরায় প্রবেশ করে নতমস্তকে হুবায়রা ও তার সাথীদের সালাম জানিয়ে বললেন– জাঁহাপনা আর একবার আপনাদের সাথে আলাপ করতে চাচ্ছেন।

হুবায়রা জবাব দিলেন– আপনি গিয়ে বাদশাহকে বলুন, আমরা আমাদের শর্তে কোনো রদবদল করবো না। শর্ত মঞ্জুর না হলে তলোয়ার দিয়েই আমাদের বিরোধ মীমাংসা হবে।

: জাঁহাপনা শর্ত ছাড়া আরও কিছু জানতে চান আপনাদের কাছে। আপনাদের

মধ্যে একজনকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে আমার ওপর। অতো দূর থেকে ধন-দৌলতের আকাঙ্ক্ষায় লুটপাট করতে করতে আপনারা এখানে এসেছেন, তাই জাঁহাপনা আপনাদের কিছু ধন-দৌলত উপহার দিয়ে বন্ধুর মতো বিদায় করতে চান। তিনি আরও কিছু জানতে চান আপনাদের দেশ ও কওম সম্পর্কে।

নায়ীম তার তলোয়ার সভাসদকে দিয়ে বললেন– এটি নিয়ে যান। এটাই আপনাদের বাদশাহর যে কোনো সওয়ালের জবাব দেবে।

সভাসদ হয়রান হয়ে বললেন– আপনার তলোয়ার?

: হ্যাঁ, আপনার বাদশাহকে বলবেন, এ তলোয়ারের মুখেই আমাদের কওমের তামাম ইতিহাস লেখা হয়েছে। তাঁকে আরও বলবেন, তাঁর তামাম ধন-ভাণ্ডারকে আমরা মুজাহিদের ঘোড়ার পায়ের ধুলার সমানও মনে করি না।

সভাসদ লজ্জিত হয়ে বললেন– জাঁহাপনার মকসুদ আপনাদের নারাজ করা নয়। আপনাদের সাহসের তারিফ করেন তিনি। আপনারা আর একবার মোলাকাত করুন! আমার বিশ্বাস, তার ফল ভালোই হবে।

হুবায়রা নায়ীমকে আরবি ভাষায় বললেন– আমাদের উচিত বাদশাহকে আর একবার সুযোগ দেয়া। আপনি গিয়ে তাবলীগ করুন।

নায়ীম জবাব দিলেন– আপনি আমার চাইতে বেশি অভিজ্ঞ।

: আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। তার কারণ, আপনার জবান ও তলোয়ার দুটোই সমান তীক্ষ্ণধার। আপনার আলাপ আমার চাইতে বেশি কার্যকর হবে।

শুনে নায়ীম উঠে সভাসদের সাথে চললেন।

দরবারে প্রবেশের আগে এ শাহী গোলাম সোনার পাত্রে একটি বহুমূল্য পোশাক নিয়ে হাজির হলো। কিন্তু নায়ীম তা পরিধান করতে অস্বীকার করলেন। সভাসদ বললেন– আপনার কামিজ খুবই পুরনো। আপনি বাদশাহর দরবারে যাচ্ছেন।

নায়ীম জবাব দিলেন– এসব দামী লেবাস আপনাদের বাদশাহর দরবারে মাথা নত করতে বাধ্য করে, কিন্তু আপনি দেখবেন, আমার পুরনো জীর্ণ কামিজ আমাকে আপনাদের বাদশাহর সামনে মাথা নীচু করতে দেবে না।

নায়ীমের মোটা শক্ত চামড়ার জুতা জোড়াও ধূলি-মলিন। এক গোলাম নুয়ে পড়ে রেশমী কাপড় দিয়ে তা সাফ করে দিতে চাইলো। নায়ীম তার বাহু ধরে তুলে দিয়ে কিছু না বলেই এগিয়ে চললেন।

চীনের বাদশাহ তাঁর পত্নীকে সাথে নিয়ে সোনার তখতে সমাসীন। তাঁর পাণ্ডুর মুখের ওপর বার্ধক্যের রেখা সুস্পষ্ট। তাঁর পত্নী যদিও অর্ধবয়সী, তবুও তার সুডৌল মুখের ওপর অতীত যৌবনের বিগত বসন্তের রূপের আভাস এখনও মিলিয়ে যায়নি। তিনি ফারগানার শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্কিত। চীনা নারীদের তুলনায় তাঁর মুখশ্রী অধিকতর কমনীয়। রাজ্যের যুবরাজের গলায় জওয়াহেরাতের এক বহু মূল্য মালা। বাদশাহর ডান দিকে একদল সুন্দরী পরিচারিকা শরাবের পেয়ালা ও সোরাহী নিয়ে দণ্ডায়মান। তাদের মাঝখানে হুসনে আরা নাম্নী এক ইরানী নর্তকী। রূপ-লাবণ্যে সে অপর পরিচারিকাদের থেকে অসামান্য। তার দীর্ঘ সোনালী কেশদাম ছড়িয়ে আছে কাঁধের ওপর। তার মাথায় সবুজ রঙের এক রুমাল। গায়ে কালো রঙের কামিজ। কোমরের ওপর দিকে তা দেহের সাথে এমন আঁটসাঁট হয়ে আছে, তার উন্নত বক্ষযুগল সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। নীচে উজ্জ্বল রঙের ঢিলা পায়জামা। হুসনে আরা আর সব মেয়েদের তুলনায় উঁচু।

নায়ীম বিজয়ী বেশে দরবারে প্রবেশ করে বাদশাহ ও দরবারীদের দিকে দৃষ্টি হেনে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন।

বাদশাহ দরবারীদের দিকে আর দরবারীরা বাদশাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। সালামের জবাব না পেয়ে নায়ীম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বাদশাহর দিকে। বাদশাহ মুজাহিদের তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টির সামনে দৃষ্টি অবনত করলেন। যুবরাজ আসন ছেড়ে উঠে নায়ীমের দিকে হাত বাড়ালেন। নায়ীম তার সাথে মোসাফাহা করে তার ইশারায় একটি খালি কুরসিতে বসে পড়েন।

বাদশাহ তার পত্নীর দিকে তাকিয়ে তাতারী ভাষায় বললেন– এ লোকগুলোকে দেখে আমি কৌতুক অনুভব করি। এরাই এসেছেন আমাদের জয় করতে। এর লেবাসটা দেখে নাও!

নায়ীম জবাব দিলেন– সিপাহীর শক্তি তার লেবাস দিয়ে আন্দাজ করা যায় না। তা আন্দাজ করতে হয় তার তলোয়ারের তেজ ও বাহুবল দেখে।

চীনের বাদশাহর ধারণা ছিলো, নায়ীম তাতারী ভাষা জানেন না, কিন্তু জবাব পেয়ে তিনি পেরেশান হলেন। তিনি বললেন, সাবাশ! তুমি তাতারী ভাষাও জানো দেখছি। নওজোয়ান! তোমার সাহসের প্রশংসা করি আমি, কিন্তু শক্তি-পরীক্ষার জন্য আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বাছাই করে নিলেই হয়তো ভালো হতো তোমাদের জন্য। চীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে তুর্কিস্তানের ক্ষুদ্র শাসকদের সমকক্ষ মনে করে তোমরা ভুল করছো। আমার বিদ্যুৎগতি অশ্ব তোমাদের

গর্বিত শির ধুলোয় পিষে দেবে। তোমরা যা কিছু হাতে পেয়েছো, তাই নিয়ে খুশি থাক। এমনও তো হতে পারে, চীন জয় করতে গিয়ে তুর্কিস্তানও হারিয়ে ফেলবে তোমরা!

নায়ীম জোশের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ডান হাত তলোয়ারের হাতলের ওপর রেখে বললেন– গর্বিত বাদশাহ! এ তলোয়ার ইরান ও রোমের শাহানশাহদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এ তলোয়ারের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা নেই আপনাদের। আপনাদের ঘোড়া ইরানীদের হাতীর চাইতে বেশি শক্তিশালী নয়!

নায়ীমের কথা শুনে দরবারে স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। বাদশাহ একটুখানি মাথা নাড়লেন। অমনি হুসনে আরা এগিয়ে এসে শরাবের পেয়ালা পেশ করে আবার গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ায়।

এক পরিচারিকা হুসনে আরার কানের কাছে চুপি চুপি বললো– জাঁহাপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হচ্ছে। এ নওজোয়ান সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

হুসনে আরা মনোমুগ্ধকর হাসি সহকারে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে বললো– এর বাহাদুরী বেওকুফীর সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সাহসের মূল্য কি, তা জানা নেই ওর।

বাদশাহ কয়েক ঢোক শরাব গিলে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন– নওজোয়ান! আমি আর একবার তোমার সাহসের তারিফ করছি। আজ পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি আমার দরবারে এত বড় কথা বলতে। আমরা তোমাদের ধর্মকে ভয় পেয়ে যাব, মনে করা ঠিক হবে না। তোমাদের বাহাদুরীর পরীক্ষাও হবে। কিন্তু আমি জানতে চাই, দুনিয়ার সব শান্তিপূর্ণ সালতানাতে কেন তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করছো? হুকুমতের লোভ থাকলে আগেই তো তোমরা বহুদূর প্রসারিত সালতানাতের মালিক হয়েছো। দৌলতের লোভ থাকলে আমরা খুশি হয়ে তোমাদের অনেক কিছুই দেবো। সোনা চাঁদি দিয়ে ভরে দিলেও আমাদের ধনভাণ্ডারে দৌলতের কমতি হবে না। যা খুশি তোমরা চেয়ে নাও!

নায়ীম জবাব দিলেন– আমরা আমাদের শর্ত পেশ করেছি। আপনি আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করছেন। দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আমরা আসিনি, কিন্তু এমন শান্তির সমর্থক আমরা নই, যাতে অসহায় দুর্বল মানুষ শক্তিমানের জুলুম নীরবে সয়ে যেতে বাধ্য হয়। সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কায়েম করতে চাই এক বিশ্বজয়ী কানুন– যাতে শক্তিমানের হাত দুর্বলকে

আঘাত দিতে পারবে না, মনিব ও গোলামের প্রভেদ থাকবে না, বাদশাহ আর তার প্রজাদের মধ্যে থাকবে না কোন দূরত্ব। এ কানুনই হচ্ছে ইসলাম। দৌলত ও হুকুমতের লোভ নেই আমাদের; বরং দুনিয়ার পাশব শক্তির হাত থেকে মজলুম মানবতার হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যেই আমরা এসেছি। আপনি হয় তো জানেন না, দুনিয়ার বিস্তীর্ণতম হুকুমতের মালিক হয়েও দুনিয়ার ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের দিকে আমাদের নজর নেই।

নায়ীম কথা শেষ করে বসলেন। দরবারে আর একবার স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। হুসনে আরা তার পাশের পরিচারিকাকে বললো– এ সুদর্শন নওজোয়ানকে দেখে আমার মনে দয়া জাগে। জিন্দেগী এর কাছে ভার হয়ে এসেছে, মনে হয়। জাঁহাপনার একটিমাত্র মামুলি ইশারা ওকে নিরব করে দেবে চিরদিনের জন্য, কিন্তু আমি দেখে হয়রান হচ্ছি, জাঁহাপনা আজ প্রয়োজনের চাইতে বেশি দয়ার পরিচয় দিচ্ছেন। দেখি, এর পরিণাম কি হয়। এমনি ভরা-যৌবনে মৃত্যুর পথ খোলাসা করা কত বড় নির্বুদ্ধিতা!

নায়ীমের কথার মধ্যে বাদশাহ দু'একবার চঞ্চল হয়ে ওঠে এপাশ-ওপাশ করে কোনো জবাব না দিয়ে তামাম দরবারীর মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেছেন। তারপর তার পত্নীর কাছে চীনা ভাষায় কি যেনো বলে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন– আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আবার আলোচনা করবো। আজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু অবাঞ্ছিত আলোচনা হয়েছে। আমার ইচ্ছা, মজলিসে কিছুটা আনন্দ পরিবেশন করা হোক। এ কথা বলে বাদশাহ হুসনে আরার দিকে হাতে ইশারা করলেন। হুসনে আরা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলো দরবারীদের মাঝখানে। নায়ীমের দিকে তাকিয়ে সে হেসে ফেললো। তার পা দুটি নৃত্য-চঞ্চল হয়ে ওঠতেই সে দুটি হাত প্রসারিত করলো দু'দিকে। রেশমী পর্দার পেছন থেকে জেগে ওঠলো বিচিত্র বাদ্য-ধ্বনি। স্তিমিত সুরের সাথে সাথে হুসনে আরা ধীরে ধীরে পা ফেলে তখতের কাছে এসে দুই জানুর উপর ভর করে বসে পড়লো। বাদশাহ সামনে হাত বাড়ালে হুসনে আরা সসম্ভ্রমে তাতে চুমু খেলো এবং ওঠে ধীরে ধীরে পেছনে সরে যেতে শুরু করলো। বাদ্য-বাজনার আওয়াজ সহসা উঁচু হয়ে ওঠলো। হুসনে আরা বিজলী-চমকের মতো দ্রুতগতিতে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন যেন নাজুক ও মুগ্ধকর হয়ে দেখা দিলো। কখনও সে মাথা নত করে তার দীর্ঘ কেশদাম ছড়িয়ে দিচ্ছে সুন্দর মুখের ওপর, আবার মাথা নাড়া দিয়ে তা সরিয়ে নিচ্ছে পিঠের ওপর এবং মুখখানিকে আবরণমুক্ত করে দর্শকদের মুগ্ধ বিস্ময় লক্ষ্য করে হাসছে। কখনও সে তার সুডৌল সফেদ বাহু মাথার

ওপর উঁচু করে ধরে আহত ফণিনীর মতো দোলাচ্ছে। নৃত্যের তালে তালে কখনও সে এগুচ্ছে সামনে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও কোমরে হাত রেখে সে সামনে পেছনে ঝুঁকছে, যেনো তার চুলগুলো জমিন ছুঁয়ে যায়। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি যেনো বিজলীর বিচিত্র খেলা। নেচে নেচে সে এক সোনার ফুলদানীর কাছে গিয়ে একটি গোলাপ তুলে নিয়ে গেলো নায়ীমের কাছে। তারপর তার সামনে বসে পড়লো দুই জানুর ওপর।

নর্তকীর কার্যকলাপে তখন তাঁর বুক কাঁপছে। তাঁর কান ও গালে অনুভূত হচ্ছে একটা তীব্র জ্বালা। নর্তকী ফুলটি তার ঠোঁটে লাগিয়ে দু'হাতে নিয়ে এগিয়ে ধরলো নায়ীমের সামনে। নায়ীম চোখ তুলছেন না দেখে সে হাত দুটি আরও এগিয়ে দিলো। এবার তার আঙুল দিয়ে তার বুক স্পর্শ করলো। নায়ীম তার হাত থেকে ফুলটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন নিচে এবং তখ্খুনি উঠে দাঁড়ালেন। নর্তকী অস্থিরভাবে ঠোঁট কামড়ে ওঠে দাঁড়ালো এবং মুহূর্তের জন্য নায়ীমের দিকে রোষদৃপ্ত চাহনি হেনে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলো দরজার রেশমী পর্দার পেছনে। হুসনে আরা চলে যেতেই বাদ্য-বাজনার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো। দরবারে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা।

বাদশাহ বললেন– এ নৃত্য-গীত বুঝি আপনার ভালো লাগলো না?

নায়ীম জবাবে বললেন– আমাদের কানে কেবল সে সুরই ভালো লাগে, যা তলোয়ারের ঝংকার থেকে সৃষ্টি হয়। আমাদের তাহযিব নারীকে নৃত্য করার অনুমতি দেয় না। নামাযের সময় হয়ে এলো। আমায় এখ্খুনি যেতে হচ্ছে– বলে নায়ীম লম্বা লম্বা পা ফেলে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হুসনে আরা দরজায় দাঁড়িয়ে। নায়ীমকে আসতে দেখে সে বিরক্তির সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল। নায়ীম বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে গেলেন। হুসনে আরার মনে আর একবার পরাজয়ের অনুভূতি জাগলো।

নায়ীমের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে সে তাতারী ভাষায় বললো– অতি তুচ্ছ তুমি! তোমাকে আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি। কিন্তু নায়ীম একবারও পিছু ফিরে তাকালেন না। সে তখন আপন মনে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাতে লাগলো। নায়ীম চলে গেলে সে ফিরে গেলো হতাশ হয়ে। জীবনে এই প্রথমবার সে মাথা নীচু করে চললো।

রাতের বেলায় নায়ীম বিছানায় পড়ে ঘুমাবার নিষ্ফল চেষ্টা করছেন। তার সাথীরা গভীর নিদ্রামগ্ন। কামরায় জ্বলছে অনেকগুলো মোমবাতি। দিনের ঘটনাগুলো বার বার মস্তিষ্কে এসে তাকে পেরেশান করে তুলছে। হুসনে

আরার কল্পনা বার বার চিন্তার গতি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নার্গিসের দেশে। দু'জনের চেহারায় কত মিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু, হুসনে আরা সুন্দরী এবং সৌন্দর্যের অনুভূতিও রয়েছে তার মনে। কিন্তু সে অনুভূতি তার ভেতরে এমন বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে, সে তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে গিয়ে বঞ্চিত করছে আপনাকে পবিত্রতা ও নিষ্পাপ সৌন্দর্য থেকে। তার রূপে আকৃতিতে আন্তরিকতার পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করেছে লালসা চরিতার্থ করার অদম্য স্পৃহা।

আর নার্গিস? নার্গিস প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এক সরল, নিষ্পাপ ও অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। বার বার নায়ীমের মনে পড়ে নার্গিসের কাছ থেকে শেষ বিদায়ের দৃশ্য। নায়ীমের কাছে নার্গিস তার মনের যে পরিচয় দিয়েছে, তা তিনি আজও ভোলেননি। তিনি জানেন, নার্গিসের নিষ্পাপ অন্তরের গভীরে তিনি সৃষ্টি করেছেন মহব্বতের তুফান।

গত কয়েক মাসে কতবার তার মনে জেগেছে নার্গিসকে আর একবার দেখা দেবার ওয়াদা পূরণ করার দুরন্ত সাধ, কিন্তু মুজাহিদের উদ্দীপনায় তা চাপা পড়ে গেছে প্রতিবার। প্রত্যেক বিজয় তার সামনে খুলে দিয়েছে নতুন অভিযানের পথ। নায়ীম প্রত্যেক নয়া অভিযানকে শেষ অভিযান মনে করে নার্গিসের কাছে যাবার ইরাদা মুলতবি রেখেছেন প্রতিবার, কিন্তু তার নির্বিকার ঔদাসীন্যের কারণ শুধু তাই নয়। নায়ীমের অবস্থা সেই মুসাফিরের মতো, দীর্ঘ সফরের পথে যে তার মূল্যবান জরুরি পাথেয় ডাকাতের হাতে সমর্পণ করে এমন হতাশ হয়ে যায়, অবশিষ্ট সামান্য জিনিসগুলো নিজের হাতে পথের ধুলায় ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে শূন্য হাতে।

জুলাইখার মৃত্যু আর আযরার কাছ থেকে চিরদিনের বিচ্ছেদ দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম শব্দগুলো নায়ীমের কাছে অর্থহীন করে তুলেছে। যদিও নার্গিসের সাথে তার শেষ মোলাকাত ও শব্দগুলো আবার কিছুটা অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু সে অর্থের গভীরতা তাতে ডুবে যাবার মতো যথেষ্ট নয়। নার্গিসকে তিনি যেমন করে চান, তাতে তার নৈকট্য ও দূরত্ব একই কথা। তবুও নার্গিসের কথা ভাবতে ভাবতে কখনও কখনও তার মনে হয়, সে তার জিন্দেগীর শেষ অবলম্বন। তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদের কল্পনা কত ভয়ঙ্কর!

বিছানায় শুয়ে তার মনে চিন্তা জাগে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, নার্গিস কি অবস্থায় কি ধারণা নিয়ে তার পথ চেয়ে রয়েছে। যদি সে... জুলাইখা... অথবা

আযরার মতো, না না, আল্লাহ তায়ালা যেনো তা না করেন। নার্গিস সম্পর্কে হাজারও চিন্তা নায়ীমকে পেরেশান করে তোলে, আর তিনি সান্ত্বনা দেন নিজের অন্তরকে।

মানুষের স্বভাব, যখন সে গোড়ার দিকে কোনো গৌরবময় সাফল্যের অধিকার লাভ করে, হতাশার ভয়াবহ গভীরতার ভেতরও সে তখন জ্বালিয়ে রাখে আশার দীপ-শিখা, কিন্তু গোড়াতেই যে লোক ব্যর্থতার চরমে পৌঁছে গেছে, সে তো কোনো কিছুকেই তার আশার কেন্দ্রস্থল বানাতে পারে না। আর যদি তা পারেও তবুও লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যয় সত্ত্বেও সে আশ্বস্ত হয় না। হাজারও বিপদের কল্পনা ছাড়া এক পা'ও সে এগুতে পারে না গন্তব্য পথে, আর লক্ষ্য অর্জনের পরও তার অবস্থা হয় এক দেউলিয়া মানুষেরই মতো। যে পথের মাঝে জাওয়াহেরাতের স্তূপ পেয়েও মালদার হবার খুশির পরিবর্তে পুনরায় সর্বস্ব হারানোর ভয়ে বিব্রত থাকে।

হাজারও চাঞ্চল্যকর চিন্তায় ঘাবড়ে গিয়ে নায়ীম ঘুমাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এলো না। অস্থির বেকারার হয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন কামরার মধ্যে। পায়চারি করতে করতে রাতে তিনি কামরার বাইরে এসে দেখতে লাগলেন চাঁদের মুগ্ধকর স্নিগ্ধরূপ।

* * *

মহলের অপর দিকে এক সুদৃশ্য কামরায় হুসনে আরা আবলুস কাঠের এক কুরসীতে বসে বসে তার দেবতাদের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে নায়ীমের কার্যকলাপের। তার পরিচারিকা মারওয়ারিদ সামনে এক গালিচায় বসে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হুসনে আরার অন্তরে এখনও জ্বলছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার অদম্য অগ্নিশিখা।

'এটা কি সম্ভব যে, সে আমার চাইতে বেশি সুন্দরী কোনো নারী দেখেছে?' ভাবতে ভাবতে কুরসি থেকে ওঠে সে প্রাচীরের গায়ে লাগানো একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে নিয়ে কামরার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। মারওয়ারিদ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার কার্যকলাপ। মারওয়ারিদ প্রশ্ন করলো– আপনি আজ ঘুমাবেন না?

: যতক্ষণ সে আমার পায়ে এসে না পড়বে, ততক্ষণ ঘুম নেই আমার!

এ কথা বলে হুসনে আরা আরও খানিকটা দ্রুত পায়ে ঘুরতে লাগলো এদিক ওদিক। মারওয়ারিদ উঠে কামরার খিড়কি দিয়ে তাকিয়ে রইলো পাইন বাগিচার দিকে। আচানক তার নজরে পড়লো, এক লোক বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের ইশারায় হুসনে আরাকে কাছে ডেকে সে বাগিচার দিকে ইশারা করে বললো– দেখুন! বিলকুল আপনারই মতো বেকারার হয়ে কে যেন পায়চারী করছে বাগিচায়।

হুসনে আরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। লোকটি গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলে চাঁদের পূর্ণ রৌশনী যখন তার মুখের ওপর পড়লো, তখন হুসনে আরা নায়ীমকে চিনে ফেললো। হুসনে আরার বিষণ্ন মুখে খেলে গেলো একটা হাসির রেখা।

: মারওয়ারিদ, আমি এখখুনি আসছি– বলে হুসনে আরা কামরার বাইরে চলে গেলো এবং দেখতে দেখতে বাগিচায় গিয়ে নায়ীমকে দেখতে লাগলো এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। নায়ীম তখন ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছের কাছে এলেন, অমনি হুসনে আরা এসে তার সামনে দাঁড়ালো গাছের আড়াল থেকে। নায়ীমও চমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি হয়রান হয়ে তাকাতে লাগলেন তার দিকে।

: আপনি ঘাবড়ে গেলেন? আমি দুঃখিত!

: তুমি কি করে এখানে এলে?

হুসনে আরা আরও এক কদম এগিয়ে এসে বললো– আমি আপনার কাছেও তাই জানতে চাচ্ছি!

: আমার মন-মেযাজ ভালো ছিল না।

: খুব! তাহলে আপনারও মন-মেযাজ বিগড়ে যায়! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমাদের মতো মানুষ থেকে আলাদা ধরনের। মন-মেযাজ বিগড়ে যাবার কারণটা জানতে পারি কি?

: তোমার প্রত্যেক সওয়ালেরই জবাব দিতে হবে, এটা তো আমি জরুরি মনে করছি না। বলে নায়ীম চলে যেতে চাইলেন।

তার চোখের যাদুতে আকৃষ্ট হয়ে নায়ীম রাতের বেলা এমনি পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন, হুসনে আরা এ ধারণা নিয়ে এসেছে, কিন্তু তার সে ধারণা কেমন যেনো ভুল হয়ে গেলো। এ ঘৃণা, না মহব্বত? সে যাই হোক, হুসনে আরা সাহস করে সামনে এগিয়ে এসে নায়ীমের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। নায়ীম

অপর দিক দিয়ে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু সে তার জামার এক প্রান্ত ধরে ফেললো। নায়ীম ফিরে বললেন– কি চাও তুমি?

হুসনে আরার মুখে জবাব যোগায় না। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। তার সকল গর্ব সে ঢেলে দিয়েছে মুজাহিদের পায়ে। নায়ীম তার কম্পিত হাত থেকে জামার প্রান্তটি ছাড়িয়ে একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন তার কামরার দিকে।

হুসনে আরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। লজ্জায় তার দেহে ঘাম বেরিয়ে এসেছে। ঘাম মুছে ফেলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে চলে গেলো নিজের কামরায়। আয়নায় আর একবার নিজের মুখ দেখে নিয়ে রাগে শরাবের একটা সোরাহী ছুঁড়ে মারলো আয়ার ওপর।

'জংলী কোথাকার! আমি কেন ওর পায়ে পড়তে গেলাম!' বলে আর একবার সে কামরার মধ্যে তেমনি পায়চারী করতে লাগলো অস্থির বেকারার হয়ে। 'আমি কেন ওর পায়ে পড়লাম! কেন আমি ওর কাছে গেলাম!' বলতে বলতে হুসনে আরা ভাঙ্গা আয়নার একটা টুকরা তুলে মুখ দেখে নিজের মুখের ওপর এক চাপড় মারলো। তারপর নায়ীম ছাড়া গোটা দুনিয়াকে গাল দিতে দিতে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে।

এ ঘটনার এক মাস পর নায়ীম কাশগড় পৌঁছে কুতায়বার কাছ থেকে ছয় মাসের ছুটি নিলেন। আরব ও ইরানের যেসব মুজাহিদ ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, নায়ীম হলেন তাদের সফরের সাথী। এই ক্ষুদ্র কাফেলায় শামিল নায়ীমের পুরনো দোস্ত ওয়াকি। নায়ীম তার কাছে খুলে বলেছিলেন মনের কথা। কয়েক মনযিল অতিক্রম করে নায়ীম কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইলে সাথীরা জানালো, তারা তাকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

* * *

নার্গিস এক পাহাড়-চূড়ায় বসে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মুগ্ধকর রূপ দেখছে। জমররুদ তাকে দেখে পাহাড়-চূড়ায় ছুটে আসে। 'নার্গিস! নার্গিস!!'

নার্গিস ওঠে জমররুদকে দেখে তার ডাকে সাড়া দিয়ে বসে পড়ে।

: নার্গিস! নার্গিস!! জমররুদ কাছে আসতে আসতে আবার ডাকলো।

: নার্গিস! উনি এসেছেন! তোমার শাহজাদা এসেছেন!

পাহাড়ের মাটি আচানক সোনা হয়ে গেলেও নার্গিস হয় তো এতটা হয়রান হতো না। সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জমররুদ আবার একই কথা বললো– তোমার শাহজাদা এসে গেছেন!

নার্গিসের মুখ খুশির দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। সে ওঠলো, কিন্তু বুকের ধড়ফড়ানি ও দেহের কম্পন সংযত করতে না পেরে বসে পড়লো আবার। জমররুদ এগিয়ে এসে দু'হাত ধরে তাকে তুললো। তারা দু'জন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো।

নার্গিস লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলে বললো– আমার স্বপ্ন সফল হলো।

: নার্গিস! আমি আরও এক খোশখবর এনেছি!

: বলো জমররুদ, বলো! এর চাইতে বড় খোশখবর আর কি হতে পারে?

: আজ তোমার শাদী।

: আজ! ... না!

: নার্গিস, এখ্খুনি!

নার্গিস দ্রুত এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালো। তার আনন্দদীপ্ত মুখ আবার পাণ্ডুর হলো। সে বললো, জমররুদ! এ ধরনের ঠাট্টা ভালো নয়।

: না, না, তোমার শাহজাদার কসম! তিনি এসে গেছেন। এসেই তিনি তোমার কথা জানতে চেয়েছেন। আমি সব কিছু বলেছি তাকে। তার সাথে এসেছেন এক বৃদ্ধ। তিনি চুপি চুপি তোমার ভাইকে কি যেনো বললেন, আর তোমার ভাই আমায় তোমার খোঁজে পাঠাল। হুমানকে আজ খুব খুশি দেখাচ্ছে। চলো নার্গিস!

নার্গিস জমররুদের সাথে পাহাড় থেকে নীচে নামলো। জমররুদ খুব দ্রুতগতিতে চলছে, কিন্তু নার্গিসের পা দুটি কাঁপছে। সে বললো, জমররুদ! একটু ধীরে চলো। অত তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না আমি।

গাঁয়ের বহুলোক এসে জমা হয়েছে হুমানের ঘরে। ওয়াকি নায়ীম ও নার্গিসের নিকাহ পড়ালেন। দুলহা-দুলহানের ওপর চারদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো।

জমররুদ এক কোণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে হুমানের দিকে। হুমানের মুখ খুশির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এক বৃদ্ধ তাতারী তার কানের কাছে কি যেনো বললো। আর বৃদ্ধ তাতারী জমররুদের বাপের কাছে গিয়ে বললো কয়েকটি কথা। জমররুদের বাপ সম্মতি জানালে সে হুমানকে ধরে নিয়ে গেলো খিমার

বাইরে।

জমররুদের বাপ বললেন– আজই?

: যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

: বহুত আচ্ছা! আমি ঘরে গিয়ে পরামর্শ করে আসছি। জমররুদের বাপ ঘরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে সব লোক জমররুদদের ঘরে এসে জমা হলো। হুমান ও জমররুদের নিকাহ পড়াবার ভারও পড়লো ওয়াকির ওপর।

দুলহানকে হুমানের ঘরে আনা হলে যখন নার্গিস ও জমররুদ নির্জন আলাপের সুযোগ পেলো, তখন নার্গিস একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্স খুললো।

: জমররুদ! তোমার শাদীর দিনে আমি তোমায় একটি উপহার দিতে চাচ্ছি। বলে সে নায়ীমের দেয়া রুমালখানি বের করে তার হাতে দিয়ে বললো– এ মুহূর্তে এর চাইতে বেশি দামী আর কিছু নেই আমার কাছে!

জমররুদ বললো– তোমার শাহজাদা না এলে এতটা মহৎপ্রাণের পরিচয় দিতে না তুমি!

নার্গিস জমররুদকে বুকে চেপে ধরে বললো– জমররুদ! এখনও আমার খোশনসীবের কল্পনা করতে ভয় পাই আমি। আজকের সবগুলো ঘটনা যেন একটা স্বপ্ন!

জমররুদ হেসে বললো– যদি সত্যি সত্যি এটা একটা স্বপ্ন হয়?

নার্গিস জবাব দিলো– তাহলে আমি সে মন-ভোলানো স্বপ্নভঙ্গের পর বেঁচে থাকতে চাইবো না।

ওয়াকি আর তার সাথীরা সেখানেই রাত কাটালেন। ফজরের নামাযের পর তারা তৈরি হলেন সফরের জন্য। বিদায় বেলায় নায়ীম বললেন– তিনিও শিগগিরই পৌঁছবেন বসরায়।

হুমানের ঘরের যে কামরায় কিছুকাল আগে নায়ীম অপরিচিত মেহমান ছিলেন, আজ নার্গিস ও তার থাকার জায়গা হলো সে কামরায়। নায়ীমের কাছে এ বস্তি আজ জান্নাতের প্রতিরূপ। দুনিয়ার সব কিছুই তার কাছে আজ আগের চাইতে বেশি মুগ্ধকর। ফুলের ঘ্রাণ, বাতাসের মর্মরধ্বনি, পাখিদের কূজন– সব কিছুই প্রেম মিলনের এক সুর-মূর্ছনায় বিভোর!

১২

খলিফা ওয়ালিদের হুকুমতের শেষভাগে ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে কাশগড় ও সিন্ধু পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছিলো। ইসলামী ইতিহাসের তিন জন সিপাহসালার পৌঁছে গিয়েছিলেন যশ-খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। পূর্বদিকে মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু নদের কিনারে ডেরা ফেলে হিন্দুস্তানের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয়ের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কুতায়বা কাশগড়ের এক উঁচু পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে দরবারে খেলাফত থেকে চীন সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবার হুকুমের অপেক্ষা করছিলেন।

পশ্চিমে মুসার লশকর গিরিপথ পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সীমানায় প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হিজরী ৯৪ সালে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু ও তার স্থলে খলিফা সুলাইমানের অভিষেকের খবর ইসলামী বিজয়-অভিযানের নকশা বদলে দেয়। বহুদিন ধরে সুলাইমানের অন্তরে জ্বলছিলো খলিফা ওয়ালিদ ও তার সহকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধের আগুন। খলিফার মসনদে বসেই তিনি ডেকে পাঠালেন ওয়ালিদের প্রিয় সিপাহসালারদের। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্য তিনি কঠিনতম শাস্তি নির্ধারিত করে রাখলেন। কিন্তু জীবনের দুঃখময় দিন আসার আগেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে গেলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুতেও সুলাইমানের সিনা ঠাণ্ডা হলো না। চাচার উপর তার প্রতিহিংসার ফল ভাতিজার উপর ফললো। মুহাম্মদ বিন কাসেমকে সিন্ধু থেকে ডেকে এনে কঠিন পীড়নের পর হত্যা করা হলো। মুসার খেদমতের বদলায় তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তার নওজোয়ান পুত্রের মস্তক ছেদন করে তাঁর সামনে পেশ করা হলো। এ নৃশংস জুলুমে ইবনে সাদেক ছিলো সুলাইমানের ডান হাত। এ বৃদ্ধ শৃগাল ঝড়-ঝঞ্ঝার হাজারও আঘাত খেয়েও হিম্মত হারায়নি। খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু

তার কাছে ছিলো এক আনন্দবার্তা। হাজ্জাজ আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার প্রিয়জনদের কাউকে কয়েদ করা হলো, আর কাউকে পাঠানো হলো মৃত্যুর দেশে। দুনিয়ায় ইবনে সাদেকের আর কোনো আশঙ্কা রইলো না। সে তার নির্জন আবাস থেকে বেরিয়ে এসে হাজির হলো সুলাইমানের দরবারে। সুলাইমান তার পুরনো দোস্তকে চিনতে পেরে তাকে যথেষ্ট সমাদর করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ইবনে সাদেক হলো খলিফার প্রধান মন্ত্রণাদাতাদের অন্যতম।

মুহাম্মদ বিন কাসেম সম্পর্কে খলিফার অন্যান্য মন্ত্রণাদাতা যখন মত দিলেন, তিনি নিরপরাধ এবং নিরপরাধকে হত্যা করা জায়েয নয়; তখন ইবনে সাদেক এমনি খাঁটি লোকের বেঁচে থাকা তার নিজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করলো। সে মুহাম্মদ বিন কাসেমের হত্যা শুধু জায়েযই নয়, জরুরি প্রমাণ করার জন্য বললো– আমিরুল মুমিনীনের দুশমনের জীবিত থাকার কোনো অধিকার নেই। এ লোক হাজ্জাজের ভাতিজা। সুযোগ পেলেই এ ধরনের লোক বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেবে।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের ভয়াবহ পরিণামের পর মুসার আহত অন্তরের ওপর নুনের ছিঁটা দেয়া হলো। এরপর সুলাইমান কুতায়বাকে জালে ফেলার চক্রান্ত শুরু করলো। কুতায়বার ব্যক্তিত্ব তামাম ইসলামী সাম্রাজ্যের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। আরবি ও ইরানী ফৌজ ছাড়া তুর্কিস্তানের নওমুসলিমরাও তাকে ভক্তি করতো মনেপ্রাণে। সুলাইমানের মনে আশঙ্কা জাগলো, বিদ্রোহ করে বসলে তিনি হয়ে ওঠবেন তার শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী। তার কার্যকলাপের ফলে যারা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, তারা সবাই হবে বিদ্রোহের সমর্থক। এ মুশকিল থেকে বাঁচার কোনো পন্থা তার মাথায় এলো না। তাই তিনি ইবনে সাদেকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। ইবনে সাদেক বললো– হুজুর! ওকে দরবারে হাজির হবার হুকুম পাঠিয়ে দিন। যদি আসে তো ভালো, নইলে আর কোন তরিকা অবলম্বন করা যাবে।

সুলাইমান প্রশ্ন করলেন– কেমন তরিকা?

: হুজুর! সে কর্তব্য এ বান্দার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, ওকে তুর্কিস্তানেই কতল করা যাবে।

* * *

নার্গিসের সাহচর্যে নায়ীমের কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো এক সোনালী স্বপ্নের মতো। উপত্যকা ও পাহাড়ের প্রতিটি প্রাকৃতিক দৃশ্য তার মনে জাগায় এক স্বপ্নময় ভাবালুতা। তারই বর্ণচ্ছটায় বিভোর হয়ে নায়ীম ঘরে ফিরে যাবার ইরাদা কিছুদিনের জন্য মূলতবী রাখলেন, কিন্তু তার অন্তরের এ ভাবাবেগ বেশি দিন থাকলো না। একদিন তিনি ঘুম থেকে জেগে নার্গিসকে বললেন– আমি এতগুলো দিন এখানে কি করে কাটিয়ে দিয়েছি, তা নিজেই ভাবতে পারি না। এখন আমার শিগগিরই চলে যাওয়া দরকার। আমাদের বস্তি এখান থেকে বহু মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে তোমার মন কেমন করবে না তো?

: মন কেমন করবে? হায়! আমার অন্তরে আপনার দেশ দেখার কি যে আগ্রহ, আর সে পবিত্র ধূলি চোখে লাগাবার জন্য আমি কতোটা বেকারার, তা যদি আপনি জানতেন!

: আচ্ছা, পরশু আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো– বলে নায়ীম ফজরের নামায পড়ার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। ইতোমধ্যে হুমান ভেতরে প্রবেশ করলো। সে নায়ীমকে বললো– বস্তির বারমাক নামে এক সিপাহী কুতায়বা বিন মুসলিমের পয়গাম নিয়ে এসেছে। নায়ীম পেরেশান হয়ে বাইরে গেলেন। বারমাক ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ভালো খবর নিয়ে আসেনি বলে নায়ীমের মনে সন্দেহ জাগলো। নায়ীমের প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই বারমাক বললো– আমার সাথে যাবার জন্য আপনি এখ্খুনি তৈরি হয়ে নিন।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– খবর ভালো তো?

বারমাক কুতায়বার চিঠি পেশ করলো। নায়ীম চিঠি খুলে পড়লেন। তাতে লেখা রয়েছে– তোমায় বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হচ্ছে, চিঠি পাওয়ামাত্র সমরকন্দে পৌঁছে যাবে। আমিরুল মুমিনীনের মৃত্যুতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তারই জন্য তোমায় এ হুকুম দেয়া হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ বারমাকের কাছে শুনতে পাবে।

নায়ীম হয়রান হয়ে বারমাকের কাছে প্রশ্ন করলেন– সমরকন্দ থেকে বিদ্রোহের খবর আসেনি তো?

বারমাক জবাব দিলো– না।

: তা হলো আমায় সমরকন্দে যাওয়ার হুকুম কেন দেয়া হলো?

: কুতায়বা তাঁর তামাম সালারকে নিয়ে কি যেনো পরামর্শ করবেন।

: কিন্তু তিনি তো কাশগড়ে ছিলেন।

: না, নানা কারণে তিনি সমরকন্দে চলে গেছেন।

: কি ধরনের কারণ?

বারমাক বললো– আমিরুল মুমিনীনের ওফাতের পর পরবর্তী খলিফা সুলাইমান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিযুক্ত বহু অফিসারকে কতল করে ফেলেছেন। মুসা বিন নুসায়রের পুত্র ও সিন্ধু-বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসেমকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের সালারকেও হুকুম দেয়া হয়েছে দরবারে খেলাফতে হাজির হতে। তিনি সেখানে যেতে বিপদের আশঙ্কা করছেন। কেননা, খলিফার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা নেই। তাই তিনি তাঁর সালারদের জমা করে পরামর্শ করতে চাচ্ছেন। এ কারণেই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

নায়ীম বারমাকের কথার শেষের দিকটা মন দিয়ে শুনতে পারেনি। মুহাম্মদ বিন কাসেমের কতলের খবর শোনার পর আর কোনো কথার ওপর তিনি গুরুত্ব দেননি মোটেই।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তিনি বললেন– বারমাক! তুমি বড়ই দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছো! বসো, আমি তৈরি হয়ে আসছি।

নায়ীম ফিরে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তাঁর বিষণ্ন মুখ দেখে নার্গিসের মনে হাজারও দুর্ভাবনা জেগে ওঠছে। নামায শেষ হলে নার্গিস সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন– আপনি খুবই পেরেশান হয়েছেন দেখছি। কেমন খবর নিয়ে এলো লোকটি?

: নার্গিস! আমরা এখ্‌খুনি সমরকন্দ চলে যাচ্ছি। তুমি জলদি তৈরি হয়ে নাও।

নায়ীমের জবাবে নার্গিসের বিষণ্ন মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে ওঠলো। নায়ীমের সাথে থেকে জিন্দেগীর সব রকম বিপদের মোকাবেলা করার সাহস রয়েছে তার অন্তরে, কিন্তু যে কোনো মসিবতে তার কাছ থেকে আলাদা হওয়া তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয়ানক। নায়ীমের সাথে তিনি যাচ্ছেন, এটাই তার কাছে যথেষ্ট। কোথায় আর কি অবস্থার ভেতরে, সেসব প্রশ্নের জবাব পাবার চেষ্টা তার কাছে অবান্তর।

* * *

সমরকন্দের কেল্লার এক কামরায় কুতায়বা তার বিশ্বস্ত সালারদের মাঝখানে বসে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন। কামরার চারদিকে প্রাচীরের সাথে ঝুলানো বিভিন্ন দেশের বড় বড় নকশা। কুতায়বা চীনের নকশার দিকে ইশারা করে বললেন– আমরা আর কয়েক মাসের মধ্যে এ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয় করে ফেলতাম, কিন্তু নয়া খলিফা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন বড় দুঃসময়ে। তোমরা জানো, ওখানে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে?

এক সালার জবাব দিলেন– মুহাম্মদ বিন কাসেমের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ই হবে।

: কিন্তু কেন? কুতায়বা তেজোদীপ্ত আওয়াজে বললেন– মুসলমানদের এখনও আমার খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে। চীন জয় করার আগে আমি কিছুতেই খলীফার কাছে আত্মসমর্পণ করবো না।

কুতায়বা আবার নকশা দেখতে শুরু করলেন।

আচানক নায়ীম এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা এগিয়ে তার সাথে মোসাফাহা করে বললেন– আফসোস! তোমায় এ অসময়ে তকলিফ দেয়া হয়েছে। একা এসেছ, না...?

: বিবিকেও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মনে করলাম, হয় তো আমার দামেশকে যেতে হবে।

: দামেশক? না, দূত হয় তো তোমায় ভুল খবর দিয়েছে। দামেশকে তোমায় নয়, আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। নয়া খলিফার কেবল আমারই মস্তকের প্রয়োজন।

: তাহলে তো আমিও যাওয়া জরুরি মনে করছি।

কুতায়বা সাদরে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– নায়ীম! আমার বদলে তুমি দামেশকে যাবে, এ জন্য তো তোমায় ডাকিনি। তোমার জান আমার নিজের জানের চাইতেও প্রিয়; বরং আমি আমার প্রত্যেক সিপাহীর জান আমার নিজের জানের চাইতে মূল্যবান মনে করি। তুমি অনেকখানি বিচক্ষণ বলেই আমি তোমায় ডেকে এনেছি। এখন আমায় কি করতে হবে, আমি তোমার ও অন্যান্য অভিজ্ঞ দোস্তদের কাছে তাই জিজ্ঞেস করতে চাই। আমিরুল মুমিনীন আমার রক্তের পিয়াসী।

নায়ীম স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলেন– খলিফার হুকুম অমান্য করা কোন মুসলিম সিপাহীর পক্ষে শোভন নয়।

: তুমি মুহাম্মদ বিন কাসেমের পরিণাম জেনেও আমায় দামেশকে গিয়ে নিজ হাতে নিজের মস্তক খলিফার সামনে পেশ করতে বলছো?

: আমার মনে হয়, খলিফাতুল মুসলিমীন আপনার সাথে হয় তো অতটা খারাপ ব্যবহার করবেন না। কিন্তু যদি কোনো সম্ভাবনা আসেও, তথাপি তুর্কিস্তানের সব চাইতে বড় সিপাহসালারকে প্রমাণ করতে হবে, আমীরের আনুগত্যে তিনি কারও পেছনে নন।

কুতায়বা বললেন– মরণের ভয়ে আমি ঘাবড়াই না, কিন্তু আমি অনুভব করছি, ইসলামী দুনিয়ায় আমার প্রয়োজন রয়েছে। চীন জয়ের আগে আমি নিজের জীবন মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করে দিতে চাই না। আমি বন্দির মৃত্যু চাই না, চাই মুজাহিদের মৃত্যু।

: দরবারে খেলাফতে হয় তো আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে। খুব সম্ভব তা দূর হয়ে যাবে। আপাতত আপনি এখানেই থাকুন এবং আমাকে দামেশকে যাবার এজাযত দিন।

কুতায়বা বললেন– এও কি হতে পারে, আমি নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে তোমার জান বিপদের মুখে ঠেলে দেবো? তুমি আমায় কি মনে করো?

: হ্যাঁ, তাহলে আপনি কি করতে চান?

: আমি এখানেই থাকবো। আমিরুল মুমিনীন যদি অকারণে আমার সাথে মুহাম্মদ বিন কাসেমের অনুরূপ আচরণ করতে চান, তা হলে আমার তলোয়ারই আমাকে হেফাজত করবে।

: এ তলোয়ার আপনাকে দরবারে খেলাফত থেকে দেয়া হয়েছিল। একে খলিফার বিরুদ্ধে লাগানোর খেয়াল মনেও আনবেন না। আমায় ওখানে যাবার এজাযত দিন। আমার বিশ্বাস, খলিফা আমার কথা শুনবেন এবং আমি তাঁর ধারণা বদলাতে পারবো। আমার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা মনে আনবেন না। দামেশকে আমার পরিচিত লোক কমই রয়েছে। ওখানে কোনো দুশমন নেই আমার। এক মামুলি সিপাহী হিসাবে আমি যাবো ওখানে।

: নায়ীম! আমার জন্য কোনো বিপদে পড়ার এজাযত আমি তোমায় দেবো না।

: এ আপনার জন্য নয়। আমি অনুভব করছি, আমিরুল মুমিনীনের

কার্যকলাপে ইসলামী জামাতের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আমার কর্তব্য আমি তাঁকে এ বিপদ-সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করে দেই। আপনি আমায় এজাযত দিন।

কুতায়বা অন্যান্য সালারের দিকে তাকিয়ে তাঁদের মত জানতে চাইলেন। হুবায়রা বললেন– তামাম জিন্দেগীর কুরবানীর পর জিন্দেগীর শেষ অধ্যায়ে এসে আমরা বিদ্রোহীর তালিকায় নাম লেখাতে পারি না। নায়ীমের জবান থেকে আমরা সব কিছুই জেনেছি। আপনি ওকে দামেশকে যাবার এজাযত দিন।

কুতায়বা খানিকক্ষণ পেশানিতে হাত রেখে চিন্তা করে বললেন– আচ্ছা নায়ীম! তুমি যাও। দরবারে খেলাফতে আমার তরফ থেকে আরয করবে– আমি চীন জয়ের পরই এসে হাজির হবো।

: আগামীকাল ভোরেই আমি এখান থেকে রওয়ানা হবো।

: কিন্তু তুমি এইমাত্র বললে, তোমার বিবিকে তুমি সাথে নিয়ে এসেছো। ওকে তুমি...!

: ওকে সাথেই নিয়ে যাবো আমি। কথার মাঝখানে নায়ীম জবাব দিলেন– দামেশকে আমার কর্তব্য শেষ করে আমি ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হবো।

পরদিন নায়ীম ও নার্গিস আরও দশ জন সিপাহী সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন দামেশকের পথে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বারমাককেও তারা নিলেন সাথে করে।

দামেশকে পৌঁছে নায়িম তার সাথীদের থাকার ব্যবস্থা করলেন এক সরাইখানায়। নিজের জন্য এক বাড়ি ভাড়া নিয়ে নার্গিসের হেফাজত করার জন্য বারমাককে নিযুক্ত করে খলিফার মহলে গিয়ে মোলাকাতের আবেদন জানালেন। সেখানে তাকে একদিন অপেক্ষা করার হুকুম হলো। পরদিন দরবারে খেলাফতে হাজির হবার আগে তিনি বারমাককে বললেন– যদি কোনো কারণে দরবারে খেলাফতে আমার দেরী হয়ে যায় তাহলে ঘরের হেফাজত করার ও নার্গিসের খেয়াল রাখার ভার রইলো তোমার ওপর। নার্গিসকেও তিনি আশ্বাস দিলেন, যাতে তার অনুপস্থিতিতে তিনি ঘাড়বে না যান। ওখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি বিদায় চাইলেন।

নার্গিস স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলেন– আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ওই উঁচু উঁচু

বাড়িগুলো গুনতে থাকবো।

নায়ীমকে কিছুক্ষণ খলিফার প্রাসাদ দ্বারে প্রতীক্ষা করতে হলো। অবশেষে দারোয়ানের ইশারায় তিনি দরবারে হাজির হয়ে খলিফাকে সালাম করে দাঁড়ালেন আদবের সাথে। খলিফার ডানে বাঁয়ে কতিপয় বিশিষ্ট সভাসদ উপবিষ্ট। কিন্তু কারোর দিকেই তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন না। খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালেকের মুখে এমন এক তেজের দীপ্তি ফুটে বেরুতো, অতি বড় বাহাদুর লোকও তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস করতেন না।

খলিফা নায়ীমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন– তুমি তুর্কিস্তান থেকে এসেছো?

: জি হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন!

: কুতায়বা তোমায় পাঠিয়েছেন?

এ প্রশ্ন নায়ীমকে হয়রান করে তুললো। তিনি জবাব দিলেন– আমিরুল মুমিনীন! আমি নিজের মর্জিতেই এসেছি।

: বলো, কি বলার আছে তোমার!

: আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে আরজ করতে এসেছি, কুতায়বা আপনার এক ওফাদার সিপাহী। হয় তো মুহাম্মদ বিন কাসেমের মতো তার সম্পর্কেও আপনার মনে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

সুলাইমান তার কথা শুনে কুরসি থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে আবার বসে পড়লেন। 'তুমি জানো?' খলিফা আপন কণ্ঠস্বর বদল করে বললেন– তোমার মতো বেয়াদবের সাথে আমি কেমন করে থাকি, জানো তুমি?

দরবারে খেলাফত থেকে একটি লোক উঠে বললো– আমিরুল মুমিনীন! এ মুহাম্মদ বিন কাসেমের পুরনো দোস্ত। দরবারে খেলাফতের চাইতে এর বেশি সম্পর্ক সেই অভিশপ্ত খান্দানের সাথে।

নায়ীম বক্তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেই ইবনে সাদেক।

অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি সহকারে সে তাকালো নায়ীমের দিকে। নায়ীম অনুভব করলেন, আজদাহা আবার মুখ খুলে দাঁড়িয়েছে। এবার আজদাহা আরও তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে। নায়ীম ইবনে সাদেকের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সুলাইমানের দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনার ক্রুদ্ধদৃষ্টি আমাকে সত্য ভাষণে বিরত করবে না। মুহাম্মদ বিন কাসেমের মতো সিপাহী

আরবমাতা বার বার জন্ম দেবে না। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আমার দোস্ত, কিন্তু আমারও চাইতে বেশি তিনি ছিলেন আপনার দোস্ত। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝলেন আপনি! আপনি হাজ্জাজের প্রতিশোধ নিলেন তাঁর নিরপরাধ ভাতিজার ওপর! আর এখন আপনি ইবনে সাদেকের মতো জঘন্য শয়তানদের ফাঁদে পড়ে কুতায়বা বিন মুসলিমের সাথেও সেই একই আচরণ করতে চাচ্ছেন। আমিরুল মুমিনীন! আপনি মুসলমানদের ভবিষ্যত বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। শুধু মুসলমানদের ভবিষ্যই আপনি বিপন্ন করছেন না, আপনি নিজেও এক জবরদস্ত বিপদ ডেকে নিয়ে আসছেন। এ লোকটি ইসলামের পুরনো দুশমন। ওর কবল থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

: খামুশ!

খলিফা নায়ীমের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তালি বাজালেন। এক কোতোয়াল আর কয়েকজন সিপাহী নাঙ্গা তলোয়ার হাতে এসে দেখা দিলো।

: নওজোয়ান! আমি কুতায়বার চাইতে বেশি করে সন্ধান করছি মুহাম্মদ বিন কাসেমের দোস্তদের। খুব ভালো হলো, তুমি নিজে এসে ধরা দিয়েছো। ওকে নিয়ে যাও আর ভালো করে ওর দেখাশোনা করো গে।

সিপাহী নাঙ্গা তলোয়ারের পাহারায় নায়ীমকে বাইরে নিয়ে গেলো। তখনও দরজায় কয়েকজন সাথী তার জন্য অপেক্ষা করছে। নায়ীমকে বন্দী হতে দেখে তারা পেরেশান হলো। নায়ীম তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন– তোমরা জলদি ফিরে চলে যাও। বারমাককে বলবে– সে যেনো নার্গিসের কাছেই থাকে। আর কুতায়বাকে আমার তরফ থেকে বলবে– তিনি যেনো বিদ্রোহ না করেন।

কোতোয়াল বললো– আফসোস! আমরা আপনাদের বেশি সময় কথা বলার এজাযত দিতে পারছি না।

: বহুত আচ্ছা! নায়ীম কোতোয়ালের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিয়ে এগিয়ে চললেন।

১৩

সুলাইমান খেলাফতের মসনদে সমাসীন। তাঁর মুখের উপর চিন্তার রেখা সুপরিস্ফুট। তিনি ইবনে সাদেকের দিকে তাকিয়ে বললেন– এখনও তুর্কিস্তান থেকে কোনো খবর এলো না।

: আমিরুল মুমিনীন! নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাআল্লাহ তুর্কিস্তান থেকে প্রথম খবরের সাথেই কুতায়বার শির আপনার সামনে হাজির করা হবে।

সুলাইমান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন– দেখা যাক।

খানিকক্ষণ পরই এক দারোয়ান এসে আরয করলো– স্পেন থেকে আবদুল্লাহ নামে এক সালার এসে হাজির হয়েছেন।

খলিফা বললেন– হ্যাঁ, তাকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান চলে গেলে আবদুল্লাহ এসে হাজির হলেন। খানিকটা উঁচু হয়ে বসে খলিফা ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ এগিয়ে এসে খলিফার সাথে মোসাফাহা করে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন।

: তোমার নাম আবদুল্লাহ?

: জি হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন!

: স্পেন থেকে আমি তোমার বীরত্বের তারিফ শুনেছি। তোমায় অভিজ্ঞ নওজোয়ান বলে মনে হচ্ছে। স্পেনের ফৌজে তুমি কবে ভর্তি হয়েছিলে?

: আমিরুল মুমিনীন! তারেকের সাথে আমি গিয়েছিলাম স্পেনের উপকূলে। তারপর থেকে আমি ওখানেই ছিলাম এত দিন।

: বেশ। তারেক সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?

: আমিরুল মুমিনীন! তিনি এক সত্যিকার মুজাহিদ।

: আর মুসা সম্পর্কে তোমার মত?

: আমিরুল মুমিনীন! এক সিপাহী অপর সিপাহী সম্পর্কে কোনো খারাপ মত পোষণ করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসার সমর্থক এবং তাঁর সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য মুখ থেকে বের করা আমি গুনাহ মনে করি।

: ইবনে কাসেম সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

: আমিরুল মুমিনীন! তিনি এক বাহাদুর সিপাহী। এর বেশি আমি কিছু জানি না।

সুলাইমান বললেন– এদের প্রতি আমি কতটা বিদ্বেষপরায়ণ, তা তুমি জানো?

: আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি মুনাফেক নই। আপনি আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চেয়েছেন, তা আমি প্রকাশ করেছি।

: আমি তোমার কথার কদর করছি। তুমি কখনও আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে অংশ নাওনি, তাই আমি তোমায় বিশ্বাস করি।

: আমিরুল মুমিনীন! আমাকে বিশ্বাসের যোগ্যই পাবেন।

: বহুত আচ্ছা! কস্তুনতুনিয়া অভিযানের জন্য একজন অভিজ্ঞ সালারের প্রয়োজন আমাদের। ওখানে আমাদের ফৌজ কোনো কামিয়াবি হাসিল করতে পারেনি। সে জন্যই তোমায় ডেকে আনা হয়েছে স্পেন থেকে। তুমি খুব জলদি এখান থেকে পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও কস্তুনতুনিয়ার পথে।

সুলাইমান একটি নকশা নিয়ে আবদুল্লাহকে কাছে ডেকে তাঁর সামনে খুলে ধরে লম্বা-চওড়া আলোচনা শুরু করে দিলেন।

দারোয়ান এসে এক চিঠি পেশ করলো।

সুলাইমান জলদি করে চিঠিটা পড়ে ইবনে সাদেকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– কুতায়বা কতল হয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে তার মস্তক এসে পৌছবে এখানে।

: মুবারক হোক। ইবনে সাদেক খলিফার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে পড়তে বললো– ওই নওজোয়ান সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন, কুতায়বার তরফ থেকে কিছুদিন আগে যে এখানে এসেছিলো? খুব বিপজ্জনক লোক বলে মনে

হয় ওকে।

: হ্যাঁ, তার সম্পর্কেও আমি শিগগিরই ফয়সালা করবো।

খলিফা আবার আবদুল্লাহর দিকে মনোযোগ দিলেন।

: তোমার পরামর্শ আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। তুমি জলদি রওয়ানা হয়ে যাও।

: আমি আগামীকালই রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। বলে আবদুল্লাহ সালাম করে বেরিয়ে পড়লেন।

আবদুল্লাহ দরবারে খেলাফত থেকে বেরিয়ে বেশি দূর যাননি। পেছন থেকে একটি লোক তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে দাঁড় করালেন। আবদুল্লাহ পেছন ফিরে দেখলেন– এক সুদর্শন নওজোয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আবদুল্লাহ তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন।

: ইউসুফ! তুমি এখানে কি করে এলে? তুমি স্পেন থেকে এমনি করে গায়েব হয়ে গেলে, আর তোমার চেহারা দেখা গেল না কোনোদিন।

: এখানে আমাকে কোতোয়ালের চাকরি দেয়া হয়েছে। তোমাকে দেখে খুব খুশিই হয়েছি। আবদুল্লাহ তুমিই প্রথম ব্যক্তি, যার স্পষ্ট কথায় খলিফা রেগে যাননি।

: কেননা আমাকে তাঁর প্রয়োজন। আবদুল্লাহ হাসি মুখে জবাব দিলেন। তুমি ওখানেই ছিলে?

: আমি একদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি লক্ষ করোনি। ভোরেই তুমি চলে যাচ্ছো?

: তুমি তো শুনেছো।

: আজ রাতে আমার কাছে থাকবে না?

: তোমার কাছে থাকতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু ভোরেই লশকরকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিতে হবে। তাই আমার সেনাবাসে থাকাই ভালো হবে।

: আবদুল্লাহ, চলো। তোমার ফৌজকে তৈরি থাকার হুকুম দিয়ে আসবে। আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি। খানিকক্ষণ পরেই আমরা ফিরে আসবো। এতদিন পর দেখা। অনেক কথা বলা যাবে।

: আচ্ছা চলো।

আবদুল্লাহ ও ইউসুফ কথা বলতে বলতে সেনানিবাসে প্রবেশ করলেন। আবদুল্লাহ আমীরে লশকরের কাছে খলিফার হুকুমনামা দিয়ে ভোরে পাঁচ হাজার সিপাহী তৈরি রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি ইউসুফের সাথে ফি'র চলে এলেন শহরের দিকে।

রা তের বেলায় ইউসুফের ঘরে খাবার খেয়ে আবদুল্লাহ ও ইউসুফ কথাবার্তায় মশ'গুল হলেন। তাঁরা কুতায়বা বিন বাহেলীর বিজয় অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর মর্মান্তিক পরিণামে আফসোস প্রকাশ করলেন।

আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন– কুতায়বার কতলের খবরে আমিরুল মুনিনীনকে মুবারক জানালো যে লোকটি, সে কে?

ইউসুফ জবাব দিলেন– এ লোকটি তামাম দামেশকের কাছে এক রহস্য। ওর নাম ইবনে সাদেক। খলিফা ওয়ালিদ ওর মস্তকের মূল্য এক হাজার আশরাফী পুরস্কার নির্ধারণ করেছিলেন। ওর সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানা নেই আমার। খলিফা ওয়ালিদের ওফাতের পর সে কোনো গোপন আবাস থেকে বেরিয়ে এসেছে সুলাইমানের কাছে। নয়া খলিফা ওকে যথেষ্ট খাতির করেন এবং বর্তমান অবস্থায় খলিফা ওর চাইতে কারো কথায় বেশি আমল দেন না আর।

আবদুল্লাহ বললেন– বহুদিন আগে আমি কিছু শুনেছিলাম ওর সম্পর্কে। দরবারে খেলাফতে ওর আধিপত্য মুসলমানদের জন্য বিপদের কারণ হবে। বর্তমান অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সামনে এক দুঃসময় আসন্ন।

ইউসুফ বললেন– আমি ওর চাইতে কঠিন-হৃদয় নীচ প্রকৃতির লোক এ যাবত দেখিনি। মুহাম্মদ বিন কাসেমের মর্মান্তিক পরিণতিতে চোখের পানি না ফেলেছে, এমন লোক দেখিনি। সুলাইমান কঠিন-হৃদয় হয়েও কয়েকদিন কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু এ লোকটিই সেদিন ছিলো যারপরনাই খুশি। আমার হাতে ক্ষমতা এলে আমি ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম। এ লোকটি কারো দিকে আঙুলের ইশারা করলে আমিরুল মুমিনীন তাকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করে দেন। কুতায়বাকে কতল করার পরামর্শ এ লোকটিই দিয়েছে এবং আজ তুমি শুনেছো, সে খলিফাকে আর একজন কয়েদীর কথা স্মরণ করে দিয়েছে?

: হ্যাঁ, সে লোকটি কে?

: তিনি হচ্ছেন কুতায়বার এক জোয়ান সালার। তাঁর কথা মনে পড়লে আমার

দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মুহাম্মদ বিন কাসেমের চাইতে তাঁর পরিণতি আরো মর্মান্তিক হবে বলে আমার ধারণা। আবদুল্লাহ! আমার মন চায়, এ কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার আমি গিয়ে ফৌজে শামিল হই। বিবেক আমায় দংশন করছে অনবরত। মুহাম্মদ বিন কাসেমকে নিয়ে আরবের তামাম বাচ্চা-বুড়ো গর্ব করছে, কিন্তু নিকৃষ্টতম অপরাধীর প্রতিও যে আচরণ করা হয় না, তাই করা হয়েছে তার সাথে। তাঁকে যখন ওয়াসেতের কয়েদখানায় পাঠানো হয়, তখন তাঁর দেখাশোনা করার জন্য আমায় হুকুম দেয়া হলো সেখানে যেতে। আগে থেকেই ওয়াসেতের হাকিম সালেহ ছিলো তাঁর রক্তপিয়াসী। সে মুহাম্মদ বিন কাসেমের উপর কঠিন নির্যাতন চালায়।

কয়েক দিন পর ইবনে সাদেকও সেখানে পৌছে। মুহাম্মদ বিন কাসেমের মনে ব্যথা দেবার নিত্য-নতুন তরিকা সে উদ্ভাবন করতো। সে মুহূর্তটি আমি ভুলতে পারি না। কতল হবার একদিন আগে যখন মুহাম্মদ বিন কাসেম কয়েদখানার কুঠরীর ভেতরে পায়চারী করছিলেন তখন আমি লৌহ কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ। তাঁর খুবসুরত মুখের ভাবগাম্ভীর্য দেখে আমার মনে চাইতো ভেতরে গিয়ে পায়ে চুমু খেতে। রাতের বেলায় কঠিন পাহারার হুকুম ছিলো আমার ওপর। আমি তাঁর অন্ধকার কুঠরীতে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। এশার নামাযের পর তিনি ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন। এক প্রহর রাত কেটে গেলে এ ঘৃণিত কুকুর ইবনে সাদেক কয়েদখানার ফটকে এসে চিৎকার শুরু করলো। পাহারাদার দরজা খুলে দিলে সাদেক আমার কাছে এসে বললো– আমি মুহাম্মদ বিন কাসেমের সাথে দেখা করবো।

আমি জবাব দিলাম– সালেহ হুকুম দিয়েছেন তার সাথে কারো মোলাকাতের এজাযত দেয়া হবে না।

সে রাগ করে বললো– তুমি জান আমি কে?

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সালেহ কিছু বলবে না বলে সে আমায় আশ্বাস দিলো। আমি বাধ্য হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসেমের কুঠরীর দিকে ইশারা করলাম। ইবনে সাদেক এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। মুহাম্মদ বিন কাসেম তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি তার দিকে লক্ষ্য করলেন না। অবজ্ঞার স্বরে ইবনে সাদেক বললো– হাজ্জাজের দুলাল! তোমার অবস্থা কি?

মুহাম্মদ বিন কাসেম চমকে ওঠে তাকালেন তার দিকে, কিন্তু মুখে কোনো কথা বললেন না।

ইবনে সাদেক প্রশ্ন করলো– আমায় চিনতে পারো?

মুহাম্মদ বিন কাসেম বললেন– আপনি কে, আমার মনে পড়ছে না।

সে বললো– দেখলে, তুমি আমায় ভুলে গেছো, কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি!

মুহাম্মদ বিন কাসেম এগিয়ে এসে দরজার লৌহ-শলাকা ধরে ইবনে সাদেকের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন– আপনাকে হয় তো কোথাও দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

ইবনে সাদেক কোনো কথা না বলে তাঁর হাতের উপর নিজের ছড়ি দিয়ে আঘাত করলো এবং তাঁর মুখের উপর থুতু ফেললো।

কি আশ্চর্য! মুহাম্মদ বিন কাসেমের মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেলো না। তিনি তাঁর কামিজের প্রান্ত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন– বুড়ো! তোমার বয়সের কোনো লোককে কখনও আমি তকলিফ দেইনি। না জেনে যদি আমি তোমায় কোনো দুঃখ দিয়ে থাকি, তাহলে আর একবার থুতু দিতে আমি তোমাকে খুশি মনে অনুমতি দিচ্ছি। ...'আমি সত্যি বলছি, তখন মুহাম্মদ বিন কাসেমের সামনে পাথর থাকলেও তা গলে যেতো। আমার মন চাইছিলো, ইবনে সাদেকের দাড়ি উপড়ে ফেলি। কিন্তু দরবারে খেলাফতের ভয় অথবা আমার কাপুরুষতা আমায় কিছুই করতে দিলো না। তারপর ইবনে সাদেক তাঁকে গাল দিতে দিতে চলে গেলো। মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে আমি কয়েদখানায় ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, মুহাম্মদ বিন কাসেম দুই জানুর ওপর বসে হাত তুলে দোয়া করছেন। আমি আর তাকাতে পারলাম না। তালা খুলে আমি ভেতরে গেলাম। দোয়া শেষ করে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁকে বললাম– উঠুন!

তিনি হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন– কেন?

আমি বললাম– এ গুনাহর কাজে আমি হিস্যা দিতে চাই না। আমি আপনার জান বাঁচাতে চাই।

তিনি বসতে বসতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরলেন। আমায় কাছে বসিয়ে তিনি বললেন– একে তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমিরুল মুমিনীন আমায় কতল করার হুকুম দেবেন। আর যদি তা হয়, তাহলেও কি আমি জান বাঁচাতে তোমায় বিপদের মুখে ঠেলে দেবো?

আমি বললাম– আমার জানের ওপর কোনো বিপদ আসবে না। আমিও

আপনার সাথে চলে যাবো। আমার দুটি অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া আছে। আমরা শিগগিরই চলে যাবো বহুদূরে। আমরা গিয়ে কুফা ও বসরার লোকদের কাছে আশ্রয় নেবো। তারা আপনার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিতেও প্রস্তুত। ইসলামী দুনিয়ার সব বড় বড় শহর আপনার আওয়াজে সাড়া দেবে।

তিনি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– তোমার ধারণা, আমি বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়ে মুসলমানদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখতে থাকবো? না, তা হতে পারে না। এ হবে কাপুরুষতা। বাহাদুর লোকদের বাহাদুরের মৃত্যু কামনা করাই উচিত। আমি নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে হাজারো মুসলমানের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দেবো না। তুমি কি চাও, দুনিয়া মুহাম্মদ বিন কাসেমকে মুজাহিদ হিসাবে স্মরণ না করে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করুক?

আমি বললাম– কিন্তু মুসলমানদের তো আপনার মতো বাহাদুর সিপাহীর প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বললেন– মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের মতো সিপাহীর অভাব হবে না। ইসলামকে যারা কমবেশি বুঝেছে তাদের ভেতরে শ্রেষ্ঠ সিপাহীর গুণরাজি পয়দা করে তোলা কিছু কঠিন কাজ নয়।

আমার মুখে কথা যোগালো না। আমি ওঠতে ওঠতে বললাম, মাফ করবেন। আপনি আমার কল্পনার চাইতেও বহু উর্ধ্বের। তিনি ওঠে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললেন– দরবারে খেলাফত হচ্ছে মুসলমানদের শক্তিকেন্দ্র। তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের খেয়াল কখনও মনে এনো না।

ইউসুফের কথা শেষ হলো। আবদুল্লাহ তার ব্যথাতুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন– তিনি ছিলেন এক সত্যিকার মুজাহিদ।

ইউসুফ বললেন– এখন আর একটি ব্যাপার আমার কাছে মর্মপীড়ার কারণ হয়ে পড়েছে। আমি এখখুনি তোমায় বলেছিলাম কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলীর এক সালারের কথা। তার আকৃতি ও দেহাবয়ব তোমার সাথে অনেকখানি মেলে। উচ্চতায় সে তোমার চাইতে কিছুটা লম্বা। তার সাথে আমার অনেকটা ভাব জন্মেছে। আল্লাহ না করুন, যদি তারও পরিণতি একই হয়, তাহলে আমি বিদ্রোহ করবো। সে বেচারার একমাত্র কসুর, তিনি কয়েকটি ভালো কথা বলেছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসেম ও কুতায়বা সম্পর্কে। এখন ইবনে সাদেক হররোজ কয়েদখানায় গিয়ে তাকে দুঃখ দেয়। আমি বুঝি, ইবনে সাদেকের কথায় তার মনে অশেষ বেদনা লাগে। আমার কাছে কতবার তিনি প্রশ্ন করেছেন, কবে তাকে আজাদ করা হবে। আমার ভয় হয়, ইবনে

সাদেকের কথামতো খলিফা তাকে ছেড়ে দেবার পরিবর্তে কতল করে না ফেলেন। মুহাম্মদ বিন কাসেমের আরো কয়েকজন দোস্ত কয়েদখানায় বন্দী রয়েছেন। তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়, তা খুবই লজ্জাজনক। সেই নওজোয়ান সালারের তাতারী বিবিও এসেছেন তার সঙ্গে। তিনি তার এক আত্মীয়ের সাথে থাকেন শহরে। কয়েকদিন আগে তিনি আমায় তার বিবির খবর দিয়েছেন। তার নাম সম্ভবত নার্গিস। তার বাড়ির কাছেই আমার খালার বাড়ি। তার সাথে আমার খালার খুব ভাব জমেছে। তিনি সারা দিনই ওখানে থাকেন এবং আমায় অনুরোধ করেন তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করতে। আমি কি করবো আর কি করে তার জান বাঁচাবো কিছুই ভেবে পাই না।

আবদুল্লাহ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় ইউসুফের কথা শুনলেন। তার মনে জন্ম নিচ্ছে নানা রকম ধারণা। তিনি ইউসুফকে প্রশ্ন করলেন– তার আকৃতি আমার সাথে মেলে তো?

: কিন্তু তিনি তোমার চাইতে কিছুটা লম্বা।

: তার নাম নায়ীম তো নয়? আবদুল্লাহ বিষণ্নকণ্ঠে বললেন।

: হ্যাঁ, নায়ীম! তুমি চেনো তাকে?

: তিনি আমার ভাই, আমার ছোট ভাই।

: ওহ্, আমি তো তা জানতাম না!

আবদুল্লাহ মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন– যদি তার নাম নায়ীম হয়ে থাকে, তার পেশানী আমার পেশানীর চাইতে চওড়া, তার নাক আমার নাকের চাইতে কিছুটা পাতলা, চোখ আমার চোখের চাইতে বড়, ঠোঁট আমার ঠোঁটের চাইতে পাতলা ও খুবসুরত, উচ্চতা আমার চাইতে একটু বেশি, আর দেহ আমার দেহের চাইতে খানিকটা পাতলা হয়ে থাকে, তাহলে আমি কসম খেতে পারি, লোকটি আমার ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি কতদিন বন্দি রয়েছেন?

: প্রায় দু'মাস হলো তিনি কয়েদ হয়েছেন। আবদুল্লাহ, এখন ওকে বাঁচাবার পরামর্শ করতে হবে আমাদের।

আবদুল্লাহ বললেন– নিজের জান বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে তুমি তার জন্য কিছু করতে পারো না।

: আবদুল্লাহ! তোমার মনে পড়ে, কর্ডোভা অবরোধকালে আমি আহত হয়ে

মরতে চলেছিলাম, তখন তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিয়েছিলে এবং তীর বৃষ্টির মাঝখানে লাশের স্তূপের ভেতর দিয়ে আমায় উদ্ধার করে এনেছিলে?

: সে ছিলো আমার ফরয। তোমার উপকার আমি করিনি।

: আমিও একে মনে করছি আমার ফরয। একে তোমার উপকার আমি মনে করছি না।

আবদুল্লাহ খানিকক্ষণ ইউসুফের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ইতোমধ্যে ইউসুফের হাবশী গোলাম জেয়াদ এসে খবর দিলো- ইবনে সাদেক তার সাথে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইউসুফের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেলো। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে আবদুল্লাহকে বললেন- তুমি আর এক কামরায় চলে যাও। ও যেনো সন্দেহ না করে।

আবদুল্লাহ জলদি পেছনের কামরায় চলে গেলেন। ইউসুফ কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর জেয়াদকে বললেন- ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।

জেয়াদ চলে যাবার পরেই ইবনে সাদেক ভেতরে এলো। ইবনে সাদেক কোনো রকম সৌজন্য না দেখিয়ে এসেই সরাসরি বললো- আপনি আমায় দেখে খুবই হয়রান হয়েছেন, না?

ইউসুফ মুখের ওপর অর্থপূর্ণ হাসি টেনে এনে বললো- এখানে কেন, যে কোনো জায়গায় আপনাকে দেখে আমি হয়রান হই, আপনি তাশরিফ রাখুন।

ইবনে সাদেক কামরার চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে পেছনের কামরার দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, আজ আমি খুবই ব্যস্ত। আচ্ছা, আপনার সে দোস্ত কোথায়?

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললো- কোন দোস্ত?

: কোন দোস্তের কথা জিজ্ঞেস করছি তা আপনি জানেন।

: আপনার মতো ইলমে-গায়েব তো আমার নেই!

: আমার মতলব, নায়ীমের ভাই আবদুল্লাহ কোথায়?

: আপনি কি করে জানেন, আবদুল্লাহ নায়ীমের ভাই?

: নায়ীমের সব খবর জানতে আমি কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছি। ওর সাথে

আমার কতখানি জানাজানি, তা আপনি জানেন?

ইউসুফ তীব্রকণ্ঠে জবাব দিলেন– তা আমি জানি। কিন্তু আবদুল্লাহর কাছে আপনার কি কাজ, আমি জানতে পারি কি?

ইবনে সাদেক বললো– তাও আপনি জানতে পারেন। আগে বলুন সে কোথায়?

: আমি কি জানি? কারো সাথে আপনার জানাজানি থাকলে আমি যে তার গোপন খবর নিয়ে বেড়াবো, এ তো জরুরী নয়!

ইবনে সাদেক বললো– দরবারে খেলাফত থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো, তখন আপনি তার সাথে ছিলেন। যখন সে সেনানিবাসে গেলো, তখনও আপনি তার সাথে। যখন সে ফিরে শহরে এলো, তখনও আপনি তার সাথে। ভেবেছিলাম, এখনও সে আপনার সাথে রয়েছে।

: এখানে খাবার খেয়ে তিনি চলে গেছেন।

: কখন?

: এখখুনি।

: কোন দিকে?

: হয় তো সেনানিবাসের দিকে।

: এও তো হতে পারে, কয়েদখানার দিকে অথবা ভাইয়ের বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে গেছে।

: ভাইয়ের বিধবা? আপনার মতলব...?

ইবনে সাদেক দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে জবাব দিলো– আমার মতলব কাল পর্যন্ত সে বিধবা হয়ে যাবে। আমি আপনাকে আমিরুল মুমিনীনের হুকুম শোনাতে এসেছি– মুহাম্মদ বিন কাসেমের তামাম দোস্তকে ভালো করে দেখাশোনা করবেন। তাদের সম্পর্কে আগামীকালই হুকুম জারি করা হবে। আর নিজের তরফ থেকে আমি আপনার খেদমতে আরয করছি, আপনি নিজের জানকে প্রিয় মনে করলে আবদুল্লাহর সাথে মিলে নায়ীমের মুক্তির ষড়যন্ত্র করবেন না।

ইউসুফ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন– আমি এরূপ ষড়যন্ত্র করতে পারি, তা আপনি কি করে বললেন?

: আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু হয় তো আবদুল্লাহর দোস্তির জন্য আপনি

বাধ্য হতে পারেন। আচ্ছা, আপনি কয়েদখানার পাহারায় কত সিপাহী রেখেছেন?

ইউসুফ জবাব দিলেন– চল্লিশ জন, আর আমি নিজেও যাচ্ছি ওখানে।

: সম্ভব হলে আরও কিছু সিপাহী রাখুন। কেননা শেষ মুহূর্তে সে ফেরার হয়ে যেতে পারে।

: এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আপনি? এ তো একটি সাধারণ লোক। পাঁচ হাজার লোক কয়েদখানার ওপর হামলা করেও তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

: আমার স্বভাবই আমায় আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। আরও কিছু সিপাহী আমি পাঠিয়ে দেবো। আপনি তাদের নায়ীমের কুঠুরির পাহারায় লাগিয়ে দিন।

ইউসুফ আশ্বাসের স্বরে বললেন– আপনি আশ্বস্ত থাকুন। নতুন পাহারাদারের প্রয়োজন নেই। আমি নিজে পাহারা দেবো। আপনি এত উদ্বিগ্ন কেন?

ইবনে সাদেক জবাব দিলো– আপনি হয় তো জানেন না, ওর মুক্তির অর্থই হচ্ছে আমার মৃত্যু। ওর গর্দানে যতক্ষণ জল্লাদের তলোয়ার না পড়ছে, ততক্ষণ আমি স্থির হতে পারবো না।

ইবনে সাদেকের কথা শেষ হতেই অকস্মাৎ পেছনের কামরার দরজা খুলে গেলো। আবদুল্লাহ বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন– আর এও তো হতে পারে যে, নায়ীমের মৃত্যুর আগেই তোমাকে কবরের মাটিতে শুইয়ে দেয়া হবে।

ইবনে সাদেক চমকে ওঠে পিছু হটলো। সে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলো। কিন্তু ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে খঞ্জর দেখিয়ে বললেন– এখন তুমি যেতে পারছো না!

ইবনে সাদেক বললো– তোমরা জানো, আমি কে?

: তা আমরা ভালো করেই জানি! আর আমরা কে, তাও এখনই তোমায় জানতে হবে। বলে ইউসুফ তালি বাজালেন। তার গোলাম জেয়াদ ছুটে এসে ঢুকলো কামরায়। তাকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে, রূপ ও আকৃতিতে মনে হলো যেনো এক কালো দৈত্য। তার ভুঁড়িটি এত বেড়ে গেছে, চলার সময় তার পেট ওপর নীচে থলথল করছে। বিরাট এক মোটা নাক। নীচের ওষ্ঠ এত মোটা, মাড়িসুদ্ধ দাঁতগুলো দেখা যায়, আর ওপরের দাঁত ওষ্ঠের তুলনায় অনেকখানি

লম্বা। চোখ দুটো ছোট অথচ উজ্জ্বল। সে ইবনে সাদেকের দিকে তাকিয়ে মনিবের হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলো।

ইউসুফ একটা রশি নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। জেয়াদ তেমনি তার পেট ওপরে নীচে নাচিয়ে নাচিয়ে বাইরে গিয়ে রশি ছাড়া একটা চাবুকও নিয়ে এলো।

ইউসুফ বললেন– জেয়াদ, ওকে রশি দিয়ে জড়িয়ে এ খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলো।

জেয়াদ আগের চাইতেও ভয়ানক মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে গেলো এবং ইবনে সাদেকের বাহু ধরে ফেললো। ইবনে সাদেক খানিকটা ধস্তাধস্তি করে শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মুঠোর চাপে অসহায় হয়ে পড়লো। জেয়াদ তার বাহু ধরে এমন করে ঝাঁকুনি দিলো যে, সে বেহুশ ও নিঃসাড় হয়ে পড়লো। তারপর বেশ স্বস্তির সাথে সে তার হাত-পা এক খুঁটির সাথে শক্ত করে বেঁধে দিলো। আবদুল্লাহ জেব থেকে রুমাল বের করে তার মুখটা বেঁধে দিলেন মজবুত করে। ইউসুফ আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন– এখন আমাদের কি করতে হবে?

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন– সব কিছুই আমি ভেবে রেখেছি। তুমি তৈরি হয়ে আমার সাথে চলো। নায়ীমের বিবি যে বাড়িতে থাকেন, তা তোমার জানা আছে?

: জি হ্যাঁ, সে বাড়িটা এখান থেকে কাছেই।

: বহুত আচ্ছা। ইউসুফ! তুমি এক দীর্ঘ সফরে চলেছো। জলদি তৈরি হয়ে নাও।

ইউসুফ লেবাস বদল করতে ব্যস্ত হলেন এবং আবদুল্লাহ কাগজ-কলম নিয়ে জলদি এক চিঠি লিখে পকেটের মধ্যে ফেললেন।

: কার কাছে চিঠি লিখেছেন?

: এ ঘৃণিত কুকুরের সামনে তা বলা ঠিক হবে না। বাইরে গিয়ে আমি সব বলবো। তোমার গোলামকে বলে দাও, আমি যা বলি, সে যেন তেমনি করে। আজ ভোরে আমি ওকে সাথে নিয়ে যাবো।

ইউসুফ ইবনে সাদেকের দিকে ইশারা করে বললেন– আর ওর কি হবে?

আবদুল্লাহ জবাবে বললেন– ওর জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি

জেয়াদকে বলে যাও, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত ওর হেফাযত করবে। ... তোমার এখানে কোনো বড় কাঠের সিন্দুক আছে, যা এ বিপজ্জনক ইঁদুরের জন্য পিঁজরার কাজে লাগতে পারে?

ইউসুফ আবদুল্লাহর মতলব বুঝে হাসলেন। তিনি বললেন– জি হ্যাঁ, পাশের কামরায় একটা বড় সিন্দুক পড়ে রয়েছে। তাতে ওর জন্য চমৎকার পিঁজরা হবে। এসো, তোমায় দেখাচ্ছি।

ইউসুফ আবদুল্লাহকে অপর কামরায় নিয়ে কাঠের এক সিন্দুকের দিকে ইশারা করে বললেন– আমার মনে হয়, এটি দিয়ে তোমার প্রয়োজন মিটবে।

: হ্যাঁ, এটি চমৎকার! এটি শিগগির খালি করো।

ইউসুফ ঢাকনা তুলে ফেলে সিন্দুক উলটে দিয়ে জিনিসপত্র মেঝের ওপর ঢেলে ফেললেন। আবদুল্লাহ চাকু দিয়ে সিন্দুকের ঢাকনায় দু'তিনটি ছিদ্র করে বললেন– ব্যস, এবার ঠিক আছে। জেয়াদকে বলে দাও, এটা তুলে কামরায় দিয়ে যাক।

ইউসুফ জেয়াদকে হুকুম দিলে সে সিন্দুকটি অপর কামরায় নিয়ে গেলো।

আবদুল্লাহ বললেন– এখন তুমি জেয়াদকে বলো, সে ভালো করে ওকে দেখাশোনা করবে। আর যদি সে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে ওর গলা টিপে দেবে।

ইউসুফ জেয়াদের দিকে তাকিয়ে বললেন– জেয়াদ তোমায় কি করতে হবে, বুঝে নিয়েছো তো?

জেয়াদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

আবদুল্লাহ বললেন– চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ইউসুফ ও আবদুল্লাহ বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ইউসুফ কি যেনো চিন্তা করে থেমে বললেন– হয় তো এ লোকটার সাথে আমার আর দেখা হবে না। আমার কিছু কথা আছে ওর সাথে।

আবদুল্লাহ বললেন– এখন কথার সময় নয়।

ইউসুফ বললেন– কোনো লম্বা আলাপ নয়। তুমি একটু দাঁড়াও।

ইউসুফ ইবনে সাদেককে লক্ষ্য করে বললেন– আমি আপনার কাছে ঋণী। এখন আমি আপনার কাজ কিছুটা আদায় করে যাচ্ছি। দেখুন, আপনি মুহাম্মদ

বিন কাসেমের মুখে থুতু দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার মুখে থুতু দিচ্ছি। ... বলে তিনি ইবনে সাদেকের মুখে থুতু দিলেন। আপনি তার হাতের ওপর ছড়ি মেরেছিলেন, এই নিন ... বলে ইউসুফ তাকে এক ঘা কোড়া মারলেন। মনে পড়ে, আপনি নায়ীমের মুখে চড় মেরেছিলেন– এই তার জবাব... বলে ইউসুফ জোরে চড় মারলেন তার গালে। আপনি নায়ীমের মাথার চুল উপড়ে দিয়েছিলেন। ইউসুফ তার দাড়ি ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

: ইউসুফ ছেলেমি করো না! আবদুল্লাহ ফিরে তার বাহু ধরে টেনে বললেন– বাকিটা পরে হবে। জেয়াদ, ওর দিকে ভালো করে খেয়াল করো।

জেয়াদ আবার তেমনি মাথা নাড়লো। ইউসুফ আবদুল্লাহর সাথে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

পথে ইউসুফ প্রশ্ন করলেন– কি মতলব করলে তুমি?

আবদুল্লাহ বললেন– শোন! তুমি আমাকে নায়ীমের বিবির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কয়েদখানায় চলে যাও। ওখান থেকে নায়ীমকে বের করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না তো?

: কোনো অসুবিধা নেই।

: আচ্ছা, তুমি বলেছিলে, তোমার কাছে দুটি ভালো ঘোড়া রয়েছে। আমার ঘোড়া রয়েছে ফৌজি আস্তাবলে। তুমি আর একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না?

: দশটি ঘোড়ার ব্যবস্থাও করা যাবে। কিন্তু নায়ীমের তিনটা ঘোড়াও তো তার বাড়িতে মওজুদ রয়েছে।

: আচ্ছা, তুমি নায়ীমকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে নিজের বাড়িতে এসো। এর মধ্যে তার বিবিকে নিয়ে আমি শহরের পশ্চিম দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকবো। তোমরা দু'জন ঘর থেকে সওয়ার হয়ে এসো ওখানে।

আবদুল্লাহ তার লেখা চিঠিখানা বের করে ইউসুফের হাতে দিয়ে বললেন– তোমরা এখান থেকে সোজা কায়রোয়ান চলে যাবে। ওখানকার সালারে-আলা

আমার দোস্ত ও নায়ীমের মকতবের সাথী। তিনি তোমাদের স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। স্পেনে পৌঁছে তেতলার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দের হাতে দেবে এ চিঠি। তিনি তোমাদের ফৌজে ভর্তি করে নেবেন। তিনি আমার বিশ্বস্ত দোস্ত। তিনি তোমাদের পূর্ণ হেফাজত করবেন। নায়ীম আমার ভাই, তা তাকে বলার প্রয়োজন নেই। আমি লিখেছি, তোমরা দু'জনই আমার দোস্ত। তোমাদের অবস্থা বলো না আর কারোর কাছে। কস্তুনতুনিয়া থেকে ফিরে আমি আমিরুল মুমিনীনের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করবো।

ইউসুফ চিঠিখানা পকেটে রেখে একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে বললেন– নায়ীমের বিবি এখানে থাকেন।

আবদুল্লাহ বললেন– আচ্ছা তুমি যাও। হুশিয়ার হয়ে কাজ করো।

: বহুত আচ্ছা। আল্লাহ হাফেয!

: আল্লাহ হাফেয!

ইউসুফ কয়েক কদম চলে যাবার পর আবদুল্লাহ বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন। বারমাক ভেতর থেকে দরজা খুলে আবদুল্লাহকে নায়ীম মনে করে খুশিতে উচ্ছ্বল হয়ে তাতারী ভাষায় বললো– আপনি এসেছেন, আপনি এসেছেন? নার্গিস! নার্গিস! উনি এসেছেন!

আবদুল্লাহ প্রথম জীবনে কিছুকাল তুর্কিস্তানে কাটিয়ে এসেছেন। তাতারী ভাষা তিনি কমবেশি জানেন। বারমাকের মতলব বুঝে তিনি বললেন– আমি তার ভাই। এর মধ্যে নার্গিস ছুটে এসেছেন। তিনি এসেই প্রশ্ন করলেন– কে এসেছেন?

বারমাক জবাব দিলেন– ইনি নায়ীমের ভাই।

: আমি ভেবেছিলাম তিনি। নার্গিস আর্তস্বরে বললেন– আমি মনে করেছিলাম, বুঝি তিনিই...! নার্গিসের উচ্ছ্বসিত অন্তর দমে গেলো। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

: বোন! আমি নায়ীমের পয়গাম নিয়ে এসেছি। আবদুল্লাহ বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতে বললেন।

নার্গিস অশ্রুসজল চোখে বললেন– তার পয়গাম? আপনি তার সাথে দেখা করে এসেছেন! বলুন, বলুন!

: তুমি আমার সাথে যাবার জন্য জলদি তৈরি হয়ে নাও!

: কোথায়?

: নায়ীমের সাথে দেখা করতে।

: তিনি কোথায়?

: শহরের বাইরে তার সাথে দেখা হবে তোমাদের।

নার্গিস সন্দেহের দৃষ্টিতে আবদুল্লাহ দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনি তো স্পেনে ছিলেন।

আবদুল্লাহ বললেন– আমি ওখান থেকেই এসেছি। আজই আমি জানলাম, নায়ীম কয়েদখানায় পড়ে রয়েছে। আমি তাকে বের করে আনার অপেক্ষা করছি। তুমি জলদি করো।

বারমাক বললো– কামরার ভেতরে চলুন। এখানে অন্ধকার।

বারমাক, নার্গিস ও আবদুল্লাহ বাড়ির একটি আলোকোজ্জ্বল কামরায় প্রবেশ করলেন। নার্গিস আবদুল্লাহকে দীপালোকে ভালো করে দেখলেন। নায়ীমের সাথে তার আকৃতির অসাধারণ সাদৃশ্য তাকে অনেকখানি আশ্বস্ত করলো। তিনি আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন– আমরা পায়ে হেঁটে যাবো?

: না, ঘোড়ায় চড়ে। বলে আবদুল্লাহ বারমাকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন– ঘোড়া কোথায়?

সে জবাব দিলো– সামনের আস্তাবলে রয়েছে।

: চলো, আমরা ঘোড়া তৈরি করে নিয়ে আসি।

আবদুল্লাহ ও বারমাক আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার জিন লাগালেন। এর মধ্যে নার্গিস তৈরি হয়ে এসেছেন। তাকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে দিয়ে বাকি দুটি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন আবদুল্লাহ ও বারমাক। শহরের দরজায় পাহারাদাররা বাধা দিলো। আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন– তিনি কস্তনতুনিয়াগামী ফৌজের সাথে শামিল হবার জন্য যাচ্ছেন সেনানিবাসের দিকে। প্রমাণস্বরূপ তিনি পেশ করলেন খলিফার হুকুমনামা। পাহারাদাররা আদবের সাথে সালাম করে দরজা খুলে দিলো। দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে গিয়ে তারা তিন জন ঘোড়া থেকে নামলেন এবং গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইউসুফ ও নায়ীমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

: উনি কখন আসবেন? নার্গিস বার বার অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন। আবদুল্লাহ সস্নেহে জবাব দেন– ব্যস, এখ্খুনি এসে যাবে।

তারা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় কাটালেন এবং দরজার দিক থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো। আবদুল্লাহ আওয়াজ শুনে বললেন– ওরা আসছেন।

সওয়ারদের আগমনে আবদুল্লাহ ও নার্গিস গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন সড়কের ওপর।

নায়ীম কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে ভাইয়ের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। আবদুল্লাহ বললেন– ভোর হলো বলে, আর দেরি করো না। কায়রোয়ান পৌঁছার আগে কোথাও দম নেবে না। বারমাক আমার সাথে যাবে।

নায়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনে। আবদুল্লাহ তার হাতে চুমু খেলেন এবং চোখে স্পর্শ করলেন।

নায়ীম বিষণ্ন আওয়াজে প্রশ্ন করলেন– ভাইয়া! আযরা কেমন আছে?

: সে ভালোই আছে। আল্লাহর মনযুর হলে আমরা স্পেনে তোমাদের সাথে মিলবো আবার।

আবদুল্লাহ এরপর ইউসুফের সাথে মোসাফাহা করলেন এবং নার্গিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়ালেন। নার্গিস তার মতলব বুঝে মাথা নিচু করলেন। আবদুল্লাহ সস্নেহে তার মস্তকে হাত বুলিয়ে দিলেন।

নার্গিস বললেন– ভাইজান! আযরাকে আমার সালাম বলবেন।

আবদুল্লাহ বললেন– আচ্ছা, আল্লাহ হাফেয!

তিন জন সমস্বরে তার জবাবে 'আল্লাহ হাফেয' বলে ঘোড়ার বাগ ঢিলা করে দিলেন। আবদুল্লাহ ও বারমাক খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। নায়ীম আর তার সাথীরা রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেলে তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে গেলেন সেনানিবাসে।

পাহারাদাররা আবদুল্লাহকে চিনতে পেরে সালাম করলো। আবদুল্লাহ বারমাকের ঘোড়া এক সিপাহীর হাতে সঁপে দিয়ে তার সওয়ারীর জন্য উটের ব্যবস্থা করে আবার ফিরে গেলেন শহরের দিকে।

* * *

জেয়াদ তার মালিকের হুকুম পেয়েছে ইবনে সাদেকের দিকে পুরোপুরি খেয়াল রাখার। সে এতটা খেয়াল রেখেছে ইবনে সাদেকের দিকে, তার মুখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি আর কোনোদিকে। ঘুম পেলে সে উঠে সেই খুঁটির চারদিকে ঘুরতে থাকে। এ নিঃসঙ্গতা তার আর ভালো লাগে না। আচানক এক খেয়াল এলো তার মাথায়। সে ইবনে সাদেকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তাকে ভালো করে দেখতে লাগলো। তার মুখে আচানক এক ভয়ংকর হাসি দেখা দিলো। সে ইবনে সাদেকের চিবুকের নীচে হাত দিয়ে তার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে থুতু দিতে লাগলো তার মুখে। তারপর সে পূর্ণশক্তি দিয়ে কয়েকটা কোড়া মারলো ইবনে সাদেকের পিঠে এবং এমন জোরে তার মুখে এক চড় মারলো যাতে সে বেহুশ হয়ে পড়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার হুশ ফিরে এলে জেয়াদ তার দাড়ি ধরে টানতে লাগলো। ইবনে সাদেক যখন অসহায়ভাবে গর্দান ঢিলা করে দিলো, তখন জেয়াদও তাকে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরতে থাকলো তার আশপাশে।

ইবনে সাদেকের হুশ হলে যখন সে চোখ খুললো, জেয়াদ তখন আবার তেমনি উত্তম মাধ্যম লাগালো। কয়েকবার এমনি করে যখন সে বুঝলো তার আর কোড়া খাবার মতো শক্তি নেই, তখন সে বিড়বিড় করে খুঁটির আশপাশে ঘুরতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে ইবনে সাদেকের দাড়ি ধরে এক আধটা টান মারলো। কখনও কখনও সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে, আবার খানিকক্ষণ পর খানিকটা তামাশা করে।

ভোরের আযানের সময় জেয়াদ দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, আবদুল্লাহ ও বারমাক আসছেন। সে শেষ বার ইবনে সাদেককে থুতু দিতে, কোড়া ও চড় মারতে এবং দাড়ি ধরে টানতে চাইলো। তখনও ইবনে সাদেকের দাড়ি ধরে ঝাঁকুনি দেয়া শেষ হয়নি। এর মধ্যে আবদুল্লাহ ও বারমাক এসে পৌঁছলেন।

আবদুল্লাহ বললেন– বেওকুফ, কি করছো তুমি? ওকে জলদি সিন্দুকে ঢুকাও।

জেয়াদ তখ্খুনি তার হুকুম তামিল করে আধমরা আজদাহাকে সিন্দুকে ঢুকালো।

সূর্যোদয়ের পরক্ষণেই আবদুল্লাহ ফৌজ নিয়ে চললেন কস্তুনতুনিয়ার পথে। রসদ-বোঝাই উটগুলোর মধ্যে একটির পিঠে চাপানো হয়েছে একটি সিন্দুক। জেয়াদের উট তার পাশে। লশকরের মধ্যে আবদুল্লাহ, বারমাক ও জেয়াদ

ছাড়া আর কেউ জানে না সিন্দুকের মধ্যে কি রয়েছে।

আবদুল্লাহর হুকুমে বারমাকও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললো সিন্দুকওয়ালা উটের পাশে পাশে।

---

* * *

নায়ীম নার্গিস ও ইউসুফকে সাথে নিয়ে কায়রোয়ান পৌঁছলেন। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা গেলেন কর্ডোভায়। কর্ডোভা থেকে ধরলেন তেতলার পথ। সেখানে পৌঁছে নার্গিসকে এক সরাইখানায় রেখে তিনি ইউসুফকে সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দের খেদমতে হাজির হয়ে পেশ করলেন আবদুল্লাহর চিঠি।

আবু ওবায়দ চিঠি পড়ে ইউসুফ ও নায়ীমের দিকে ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন– আপনারা আবদুল্লাহর বন্ধু। আজ থেকে আমাকেও আপনাদের দোস্ত মনে করবেন। আবদুল্লাহ নিজে ফিরে আসবেন না?

নায়ীম জবাব দিলেন– আমিরুল মুমিনীন তাকে পাঠিয়েছেন কস্তুনতুনিয়া অভিযানে।

কস্তুনতুনিয়ার চাইতে এখানেই তার প্রয়োজন ছিলো বেশি। তারিক ও মুসার স্থান নেবার মতো আর কেউ নেই এখানে। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, পূর্ণ উদ্যম সহকারে কর্তব্য পালন করতে পারছি না। আপনারা জানেন, শাম ও আরব থেকে এদেশ অনেকটা আলাদা। এখানকার পাহাড়ী লোকদের যুদ্ধের তরিকাও আমাদের থেকে স্বতন্ত্র। পরে এখানে আপনাদের ফৌজের কোনো উঁচু পদ দেয়া যাবে। আপাতত মামুলি সিপাহী হিসাবে অভিজ্ঞতা হাসিল করতে হবে বেশ কিছুদিন। তারপর আপনাদের হেফাজতের সওয়াল। সে সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি আমিরুল মুমিনীন এখান পর্যন্ত আপনাদের তালাশ করেন, তাহলে আপনাদের পৌঁছে দেয়া যাবে কোনো নিরাপদ জায়গায়। কিন্তু আমার নীতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির যোগ্যতার পরীক্ষা না নিয়ে তার ওপর কোনো জিম্মদারী দেই না।

নায়ীম সিপাহসালারের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন– আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ বিন কাসেমের ডান পাশে থেকে যতটা আনন্দ লাভ করেছি, সিপাহীদের পেছনের কাতারে দাঁড়িয়েও অনুরূপ আনন্দই

পাবো।

: আপনার মতলব হচ্ছে, আপনি... ।

আবু ওবায়দের কথা শেষ হবার আগেই ইউসুফ বলে ওঠলেন– ইনি ছিলেন কুতায়বা ও ইবনে কাসেমের নামজাদা সালার।

: মাফ করবেন! আমি জানতাম না, আমি আমার চাইতে যোগ্যতর ও অধিকতর অভিজ্ঞ সালারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি! আবু ওবায়দ আর একবার নায়ীমের সাথে মোসাফাহা করেন।

: এবার আমি বুঝেছি, আপনি কেন আমিরুল মুমিনীনের বিষ-নজরে পড়েছেন। এখানে কোনো বিপদ নেই আপনার। তবু সতর্কতার খাতিরে আজ থেকে আপনার নাম জুবায়র ও আপনার দোস্তের নাম হবে আবদুল আজীজ। আপনার সাথে কেউ আছেন?

নায়ীম বললেন– জি হ্যাঁ, আমার বিবিও সাথে আছেন। তাকে আমি রেখে এসেছি এক সরাইখানায়।

: ওহ্হো! তার জন্যও আমি একটা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

আবু ওবায়দ আওয়াজ দিয়ে এক নওকরকে ডেকে হুকুম দিলেন শহরে একটা ভালো বাড়ি খুঁজে দিতে।

* * *

চার মাস পর একদিন নায়ীম বর্ম পরিহিত হয়ে নার্গিসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন– যে রাতে ভাই আবদুল্লাহ ও আযরার শাদী হয়েছে, সে রাতেই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন জেহাদের ময়দানে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, আযরার মুখে চিন্তা ও দুঃখের মামুলি রেখাটিও নেই।

: আপনার মতলব আমি বুঝেছি। নার্গিস হাসার চেষ্টার করে বললেন– আপনি কতবার বলেছেন, তাতারী মেয়েরা আরব মেয়েদের মোকাবেলায় অনেক দুর্বল, কিন্তু আমি আপনার ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেবো।

নায়ীম বললেন– পর্তুগাল বিজয়ে আমার প্রায় ছয় মাস লেগে যাবে। আমি চেষ্টা করবো, এরই মধ্যে একবার এসে তোমায় দেখে যেতে। আমি না আসতে পারলেও ঘাবড়ে যেয়ো না। আবু ওবায়দ আজ এক পরিচারিকাকে পাঠাবেন তোমার কাছে।

: আমি আপনাকে... । নার্গিস দৃষ্টি অবনত করে বললেন– একটা নতুন খবর শোনাতে চাই ।

নায়ীম নার্গিসের চিবুক সস্নেহে উপরে তুলে বললেন– শোনাও!

: আপনি যখন ফিরে আসবেন... ।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো!

নার্গিস নায়ীমের হাত ধরে মৃদু চাপ দিতে দিতে বললেন– আপনি জানেন না?

: আমি জানি তোমার মতলব! শিগগিরই আমি বাচ্চার বাপ হতে চলেছি, এই তো?

জবাবে নার্গিস মস্তক নায়ীমের সিনার সাথে লাগালেন ।

: নার্গিস! আমি তার নাম বলে যাবো? ... তার নাম হবে আবদুল্লাহ । আমার ভাইয়ের নাম ।

: আর যদি মেয়ে হয়, তবে?

: না, ছেলেই হবে । আমার চাই এমন বেটা, যে তীর বৃষ্টি ও তলোয়ারের ঝংকারের ভেতর খেলে বেড়াবে । আমি তাকে তীরন্দাজি, নেযাবাজি, ঘোড়সওয়ার শিক্ষা দেবো । পূর্বপুরুষের তলোয়ারের দীপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য পয়দা করতে হবে তার বাহুতে শক্তি, অন্তরে হিম্মত ।

* * *

ওফাতের কিছুকাল আগে খলিফা ওয়ালিদ কস্তুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন জঙ্গী জাহাজের এক বহর এবং এক ফৌজ পাঠিয়েছিলেন এশিয়া মাইনরের পথে । কিন্তু সে হামলায় মুসলমানরা কঠিন ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় । কস্তুনতুনিয়ার মজবুত পাঁচিল জয় করার আগেই মুসলমানদের রসদ ফুরিয়ে যায় । আর এক মসিবত হলো, শীতের মওসুম শুরু হতেই লশকরের ভেতর মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে হাজারো মুসলমানের প্রাণ বিনষ্ট হয় । এসব মসিবতের ভেতর দিয়ে এক বছর অবরোধের পর মুসলিম বাহিনীকে ফিরে আসতে হয় ।

মুহাম্মদ বিন কাসেম ও কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলীর মর্মান্তিক পরিণতির পর সিন্ধু ও তুর্কিস্তানে ইসলামী বিজয় অভিযানের গতি প্রায় শেষ হয়ে পড়ে ।

সুলাইমান এ অখ্যাতির কলংক অপসারণের জন্য কস্তুনতুনিয়া জয় করতে চাইলেন। তার ধারণা ছিলো, কস্তুনতুনিয়া জয় করতে পারলে তিনি বিজয় গৌরবে খলিফা ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে যাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিজয় অভিযানের জন্য তিনি বাছাই করলেন এমন সব লোক, সিপাহীর জিন্দেগীর সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর সিপাহসালার যখন পায়ে পায়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে লাগলেন, তখন তিনি আন্দালুসের ওয়ালীকে হুকুম দিলেন একজন অভিজ্ঞ বাহাদুর সালারকে পাঠিয়ে দিতে। সে হুকুম অনুযায়ী আবদুল্লাহ হাজির হয়ে দামেশক থেকে পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে রওয়ানা হলেন কস্তুনতুনিয়ার পথে। যাতে কস্তুনতুনিয়ার ওপর হামলকারী ফৌজের দেখাশোনা করা যায়, তার জন্য সুলাইমান নিজেও দামেশক ছেড়ে রামলায় তার দারুল খেলাফত বানালেন। কয়েকবার তিনি হামলাকারী ফৌজ পরিচালনা করলেন। কিন্তু কোনো সাফল্যই লাভ হলো না। সুলাইমানের বেশির ভাগ নির্দেশের সাথে আবদুল্লাহ একমত হতেন না। তিনি চাইতেন, তুর্কিস্তান ও সিন্ধুর যেসব মশহুর সালার কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ বিন কাসেমের অনুরক্ত বলে পদচ্যুত হয়েছেন, তাদের আবার ফৌজে শামিল করে নেয়া হোক। কিন্তু খলিফা তাদের বদলে তার কতিপয় অযোগ্য দোস্তকে ফৌজে ভর্তি করে দিলেন।

সুলাইমানের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনিও সচেতন ছিলেন। কেবল খলিফার তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাহে জান-মাল উৎসর্গকারী সিপাহীরা রক্তপাত পছন্দ করতো না। তাই ইসলামের পথে আত্মোৎসর্গের সে পুরনো মনোভাব ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে। ইবনে সাদেক গায়েব হয়ে যাওয়ায় খলিফার পেরেশানী বেড়ে যায়। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আসন্ন মসিবত সম্পর্কে তাকে বেপরোয়া করে তোলার মতো আর কেউ নেই তখন। মুহাম্মদ বিন কাসেমের মতো বেগুনাহ মানুষকে হত্যা করার ফলে বিবেক তাকে কষাঘাত করতে লাগলো। ইবনে সাদেককে খুঁজে বের করার সব রকম প্রচেষ্টা করা হলো। গুপ্তচররা ছুটে বেড়াতে লাগলো, পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কোথাও তার কোনো সন্ধান মিললো না।

১৪

আবদুল্লাহ জানতেন, খলিফা ইবনে সাদেকের সন্ধানে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টাই করবেন। তাই তাকে জীবিত রাখা বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি তার মতো নীচু মানুষের রক্তে হাত কলংকিত করা বাহাদুর সিপাহীর পক্ষে শোভন মনে করেননি। কস্তুনতুনিয়ার পথে তার ফৌজ যখন কাওনিয়া নামক স্থানে এসে থামলো, তখন আবদুল্লাহ শহরের শাসনকর্তার সাথে দেখা করে তার দামী জিনিসপত্র হেফাযত করার জন্য একটি বাড়ি পাবার ইচ্ছা জানালেন। শহরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহকে একটি পুরনো জনহীন বাড়ি দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাদেককে আবদ্ধ করে রাখলেন সেই বাড়ির গোপন কক্ষে। বারমাক ও জেয়াদের ওপর হেফাযতের দায়িত্ব অর্পণ করে ফৌজ নিয়ে তিনি চললেন কস্তুনতুনিয়ার পথে।

জেয়াদের কাছে তার জীবন আগের চাইতে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠেছে। আগে সে ছিলো নিছক গোলাম। কিন্তু এখন একটা মানুষের দেহ ও জানের ওপর তার পুরো এখতিয়ার। সে যখন চায়, ইবনে সাদেককে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। ইবনে সাদেক তার কাছে একটা খেলনার শামিল। এ খেলনা নিয়ে খেলতে ক্লান্তি অনুভব করে না সে। তার নিরানন্দ জীবনে ইবনে সাদেক প্রথম ও শেষ আকর্ষণ। এটা তার প্রতি বিদ্বেষ না প্রীতির আকর্ষণ! যেভাবেই হোক সে হররোজ তাকে চড়-চাপ্পড় মারার, দাড়ি ধরে টানার ও মুখে থুতু দেবার যে কোনো সুবিধা বের করে নেয়। বারমাক তার সামনে এসব করতে দেয় না। কিন্তু যখন সে খাবার সংগ্রহের জন্য বাজারে যায়, তখন জেয়াদ তার খুশিমতো কাজ করে।

আবদুল্লাহর হুকুম মোতাবেক ইবনে সাদেককে দেয়া হতো ভালো ভালো খাবার। তাঁর আরও হুকুম ছিলো যেনো ইবনে সাদেককে কোনো তকলিফ দেয়া না হয়। কিন্তু জেয়াদ এ হুকুম তামিল অতো বেশি জরুরি মনে করতো না। আরবি ভাষা কিছুটা জানা থাকলেও জেয়াদ ইবনে সাদেকের সাথে কথা বলতো তার মাতৃভাষায়। গোড়ার দিকে ইবনে সাদেকের অসুবিধা হতো, কিন্তু কয়েক মাস পরে সে বুঝতো জেয়াদের কথা।

একদিন বারমাক বাজার থেকে খানাপিনার জিনিসপত্র আনতে চলে গেলো। জেয়াদ বাড়ির এক কামরায় দাঁড়িয়ে খিড়কি থেকে উঁকি মেরে দেখলো, এক হাবশী গাধায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে আসছে শহর থেকে। দৈত্যাকৃতি হাবশীর বোঝা বয়ে জীর্ণ গাধার কোমর বেঁকে যাচ্ছে। গাধা চলতে চলতে শুয়ে পড়লো আর হাবশী শুরু করলো কোড়া বর্ষণ। গাধা নিরূপায় হয়ে ওঠে দাঁড়ালো। হাবশী আবার চাপলো তার পিঠে। খানিকটা পথ চলে গাধা আবার বসে পড়লো। হাবশী আবার কোড়া মারতে লাগলো। জেয়াদ অট্টহাসি করে কামরা থেকে একটা কোড়া হাতে নিয়ে নীচে এসে ইবনে সাদেকের কয়েদখানার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

ইবনে সাদেক জেয়াদকে দেখেই তৈরি হলো অভ্যাসমতো দাড়ি টানা ও কোড়ার ঘা খেতে, কিন্তু তার প্রত্যাশার বিরুদ্ধে জেয়াদ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। অবশেষে সে সামনে ঝুঁকে দু'হাত জমিনের ওপর ভর করে এক চার পেয়ে জানোয়ারের মতো হাত-পা দিয়ে দু'তিন গজ চলার পর ইবনে সাদেককে বললো– এসো!

ইবনে সাদেক তার মতলব বুঝলো না। আজ কোনো নতুন খেলার ভয়ে সে ঘাবড়ে গেলো। ভয়ের আতিশয্যে তার পেশানীতে দেখা দিলো ঘাম।

জেয়াদ বললো– এসো, আমার ওপর সওয়ার হও।

ইবনে সাদেক জানতো, তার ভালো-মন্দ যে কোনো হুকুম মেনে চললেই তার ভালাই। হুকুম অমান্য করার শাস্তি হবে তার পক্ষে অসহনীয়। তাই ভয়ে ভয়ে সে সওয়ার হলো জেয়াদের পিঠে। জেয়াদ গোপন কক্ষের দেওয়ালের চারদিকে দু'তিন চক্কর লাগিয়ে ইবনে সাদেককে নীচে নামিয়ে দেয়। জেয়াদকে খুশি করতে গিয়ে সে খোশামুদির স্বরে বললো– আপনি বেশ শক্তিমান!

কিন্তু জেয়াদ তার কথায় কান না দিয়ে উঠেই হাত ঝেড়ে ইবনে সাদেককে ধরে নীচে ঝুঁকিয়ে বললো– এবার আমার পালা।

ইবনে সাদেক জানতো, এ দৈত্যের বোঝা পিঠে নিয়ে সে পিষে যাবে, কিন্তু নিরূপায় হয়ে সে নিজেকে তাকদীরের ওপর ছেড়ে দিলো।

জেয়াদ কোড়া হাতে ইবনে সাদেকের পিঠে সওয়ার হলে তার কোমর বেঁকে গেলো। এত ভারী বোঝা বয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। বহু কষ্টে দু'তিন কদম চলে সে পড়ে গেলো। এবার জেয়াদ তার ওপর কোড়া বর্ষণ করতে শুরু করলো। কোড়ার ঘা খেয়ে ইবনে সাদেক বেহুশ হয়ে গেলো। জেয়াদ তাকে দেয়ালে ভর করে বসিয়ে দিয়ে ছুটে গেলো বাইরে। খানিকক্ষণ পর আবার কয়েদখানার দরজা খুলে সে ঢুকলো এক তশতরিতে কয়েকটা সেব ও আঙুর নিয়ে। ইবনে সাদেক জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুললো। জেয়াদ আপন হাতে তার মুখে দিলো কয়েকটা আঙুর। তারপর নিজের খঞ্জর দিয়ে একটা সেব কেটে সে তার অর্ধেকটা দিলো ইবনে সাদেককে। ইবনে সাদেক তার হিস্‌সা শেষ করলে জেয়াদ তাকে কেটে দিলো আর একটি সেব।

ইবনে সাদেক জানে, জেয়াদ কখনও কখনও তার প্রতি প্রয়োজনের চাইতে বেশি মেহেরবান হয়ে ওঠে। তাই সে দ্বিতীয় সেবটি শেষ করে নিজেই জেয়াদকে তুলে দিলো তৃতীয় সেবটি। জেয়াদ তার খঞ্জর রেখে দিয়েছে সেবগুলোর মাঝখানে। ইবনে সাদেক বেপরোয়া হয়ে সেটি হাতে তুলে নিয়ে সেবের খোসা ফেলতে শুরু করলো। জেয়াদ সবকিছুই দেখছে মনোযোগ দিয়ে। ইবনে সাদেক খঞ্জর রেখে দিয়ে বললো– এগুলো খোসাসুদ্ধ খেলে ক্ষতি হয়।

: হুঁ! জেয়াদ মাথা নেড়ে আওয়াজ করলো এবং একটি সেব তুলে নিজেও ইবনে সাদেকের মতো খোসা ফেলতে লাগলো। জেয়াদের হাত কেমন যেনো নিঃসাড় হয়ে আসছে। সে হাত মুখে দিয়ে ভাবতে লাগলো।

ইবনে সাদেক বললো– দিন, আমি খোসা তুলে দিচ্ছি।

জেয়াদ মাথা নেড়ে সেব ও খঞ্জর দিলো তার হাতে। ইবনে সাদেক সেবের খোসা তুলে ফেলে তার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলো– আরও খাবেন আপনি?

জেয়াদ মাথা নাড়লো এবং ইবনে সাদেক আর একটি সেব তুলে তার খোসা ফেলতে লাগলো।

ইবনে সাদেকের হাতে খঞ্জর। তার অন্তর ধড়ফড় করছে। সে চায়, একবার আবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু তার ভয়, হামলা করার আগেই জেয়াদ তাকে ধরে ফেলবে বজ্রমুষ্টিতে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে দরজার

দিকে ফিরে দেখে পেরেশান হবার ভান করে বললো– 'কে যেনো আসছে'। জেয়াদও জলদি ফিরে তাকালো দরজার দিকে। ইবনে সাদেক অমনি অলক্ষ্যে তার সিনায় আমূল বিদ্ধ করে দিলো তার হাতের চকচকে খঞ্জর এবং দ্রুত এক লাফে কয়েক কদম পিছলে গেলো। জেয়াদ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওঠে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে গেলো ইবনে সাদেকের গলা টিপে দিতে। ইবনে সাদেক তার সামনে অনেকখানি হালকা। দ্রুতগতিতে সে চলে গেলো তার নাগালের বাইরে গোপন কক্ষের এক কোণে। জেয়াদ সেদিকে এগুলে সে গেলো আর এক কোণে। জেয়াদ চারদিক দিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

জেয়াদের পা ক্রমে নিঃসাড় হয়ে এলো। জখমের রক্তধারা কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জমিনের উপর। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দু'হাতে সিনা চেপে সে গড়িয়ে পড়লো জমিনের উপর। ইবনে সাদেক এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। সে যখন বুঝলো, জেয়াদ মরে গেছে অথবা বেহুশ হয়ে গেছে তখন সে এগিয়ে তার জেব থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

বারমাক তখনও বাজার থেকে ফেরেনি। ইবনে সাদেক মুক্তি পেয়ে খানিকটা দৌড়ে ছুটে চললো। তারপর সে ভাবলো, শহরে কোনো বিপদ নেই তার। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে লাগলো। শহরের লোকের কাছ থেকে বাইরের দুনিয়ার খবর নিয়ে সে এবার চললো রামলার পথে খলিফাকে তার কাহিনী শোনাতে।

ইবনে সাদেকের মুক্তির কয়েক দিন পর শোনা গেলো, খলিফা আবদুল্লাহকে সরিয়ে দিয়েছেন সিপাহসালারের পদ থেকে এবং তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নেয়া হচ্ছে রামলার দিকে। ইবনে সাদেক সম্পর্কে খবর রটলো, তাকে স্পেনে পাঠানো হয়েছে মুফতিয়ে আযমের পদে নিযুক্ত করে।

* * *

হিজরী ৯৯ সালে খলিফা সুলাইমান ফৌজের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে কস্তুনতুনিয়ার ওপর হামলা চালালেন। কিন্তু পূর্ণ বিজয় লাভের আগেই তিনি বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে। ওপর বিন আবদুল আজীজ খেলাফতের তখতে আসীন হলেন। ওমর বিন আবদুল আজীজ স্বভাব ও চালচলনে ছিলেন বনু উমাইয়ার তামাম খলিফা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর খেলাফত আমল ছিলো বনু উমাইয়া খেলাফতের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। মজলুম মানুষের প্রতি জুলুমের প্রতিকার হলো নয়া খলিফার প্রথম কর্তব্য। যেসব বড় বড় মুজাহিদ সুলাইমান বিন আবদুল মালেকের রোষের শিকার হয়ে কয়েদখানার অন্ধকার কুঠরীতে দিন যাপন করছিলেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হলো। অত্যাচারী বিচারকদের পদচ্যুত করে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো নেক-দিল ও ন্যায়নিষ্ঠ হাকিমদের। রামলার কয়েদখানায় বন্দী আবদুল্লাহকে মুক্তি দিয়ে ডেকে আনা হলো দরবারে খেলাফতে।

আবদুল্লাহ দরবারে খেলাফতে হাজির হয়ে তাঁর মুক্তির জন্য শোকরিয়া জানালেন।

আমিরুল মুমিনীন প্রশ্ন করলেন— এখন কোথায় যাবে?

: আমিরুল মুমিনীন! বহুদিন হয় আমি ঘর ছেড়ে এসেছি। এখন আমি ঘরেই ফিরে যেতে চাই।

: তোমার সম্পর্কে আমি এক হুকুম জারি করেছি।

: আমি খুশির সাথে আপনার হুকুম তামিল করবো।

দ্বিতীয় ওমর এক টুকরো কাগজ আবদুল্লাহর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— আমি তোমায় খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি। তুমি এক মাস ঘরে থেকে ফিরে এসে খোরাসানে পৌঁছে যাবে।

আবদুল্লাহ সালাম করে কয়েক কদম গিয়ে আবার থেমে দাঁড়িয়ে আমিরুল মুমিনীনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমিরুল মুমিনীন প্রশ্ন করলেন— তুমি আরও কিছু বলবে?

: আমিরুল মুমিনীন! আমি আমার ভাইয়ের সম্পর্কে আরয করতে চাচ্ছি। আমি তাকে দামেশকের কয়েদখানা থেকে মুক্ত করার চক্রান্ত করেছিলাম। তিনি বেকসুর। তার একমাত্র কসুর, তিনি কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ

বিন কাসেমের ঘনিষ্ঠ দোস্ত ছিলেন এবং দরবারে খেলাফতে হাজির হয়ে তিনি আমিরুল মুমিনীনকে কুতায়বাকে হত্যার ইরাদা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ওমর বললেন– তুমি নায়ীম বিন আবদুর রহমানের কথা বলছো?

: জি হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন! তিনি আমার ছোট ভাই।

: এখন তিনি কোথায়?

: স্পেনে। আমি তাকে আবু ওবায়দের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আগের খলিফা ইবনে সাদেককে ওখানকার মুফতিয়ে আযম নিযুক্ত করেছেন এবং সে নায়ীমের খুনের পিয়াসী।

আমিরুল মুমিনীন বললেন– ইবনে সাদেক সম্পর্কে আজই আমি স্পেনের গভর্নরকে লিখে হুকুম দিচ্ছি, তার পায়ে শিকল বেঁধে দামেশকে পাঠাতে। তোমার ভাইয়ের দিকেও আমার খেয়াল থাকবে।

: আমিরুল মুমিনীন! নায়ীমের সাথে তার এক দোস্ত রয়েছে। তিনিও আপনার সদয় দৃষ্টিলাভের যোগ্য।

আমিরুল মুমিনীন স্পেনের গভর্নরের কাছে চিঠি লিখে এক সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন– এবার তুমি খুশি হয়েছো? তোমার ভাইকে আমি দক্ষিণ পর্তুগালের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি এবং তার দোস্তকে ফৌজের উচ্চপদে নিযুক্ত করার সুপরিশ করেছি। ইবনে সাদেক সম্পর্কেও আমি লিখে দিয়েছি।

আবদুল্লাহ আদব সহকারে সালাম করে বিদায় নিলেন।

* * *

আন্দালুসের গভর্নর থাকতেন কর্ডোভায়। তিনি দক্ষিণ পর্তুগাল থেকে জুবায়র নামক এক নয়া সিপাহসালারের বিজয়ের খবর শুনে অত্যন্ত খুশি। তিনি আবু ওবায়দকে চিঠি লেখলেন এবং জুবায়রের সাথে মোলাকাত করার ইচ্ছা জানালেন। নায়ীম কর্ডোভায় পৌছে আন্দালুসের গভর্নরের খেদমতে হাজির হলেন। গভর্নর তাকে সাদর অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করলেন।

গভর্নর বললেন– আপনার মোলাকাত পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আবু ওবায়দ তাঁর চিঠিতে আপনার যথেষ্ট তারিফ করেছেন। কয়েকদিন আগে আমি খবর পেয়েছি, উত্তর এলাকার পাহাড়ী লোকেরা বিদ্রোহ করছে। আমি তাদের দমন করার জন্যে আপনাকে পাঠাতে চাই। আগামীকাল পর্যন্ত আপনি তৈরি হবেন।

: বিদ্রোহ থাকলে তো আমার আজই যাওয়া দরকার। বিদ্রোহের আগুন ছড়ানোর সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।

: বহুত আচ্ছা। এখ্খুনি আমি সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে ডাকাচ্ছি পরামর্শের জন্য।

নায়ীম ও আন্দালুসের গভর্নর আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। এক সিপাহী এসে বললো– মুফতিয়ে আযম আপনার সাথে দেখা করতে চান।

গভর্নর বললেন– তাকে তাশরিফ আনতে বলো।

: আপনার সাথে হয় তো তার দেখা হয়নি। নায়ীমকে লক্ষ্য করে গভর্নর বললেন– এক মাসের বেশি হয়নি তিনি এখানে এসেছেন। তাকে আমিরুল মুমিনীনের প্রিয়পাত্র মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার আফসোস! তিনি এ পদের যোগ্য নন।

: তাঁর নাম কি?

গভর্নর জবাব দিলেন– ইবনে সাদেক।

নায়ীম চমকে ওঠে বললেন– ইবনে সাদেক!

: আপনি তাকে চেনেন?

এরই মধ্যে ইবনে সাদেক ভিতরে প্রবেশ করলো। তাকে দেখে নায়ীমের মনে হলো যেনো এক নতুন মসিবত আসন্ন।

ইবনে সাদেকও তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে অন্তর্জ্বালা অনুভব করলো।

ইবনে সাদেকের প্রতি লক্ষ্য করে গভর্নর বললেন– আপনি একে জানেন না! এর নাম জুবায়র! আমাদের ফৌজের সবচাইতে বাহাদুর সালার।

: বে-শ! বলে ইবনে সাদেক নায়ীমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু নায়ীম মোসাফাহা করলেন না।

নায়ীম ইবনে সাদেককে আমল না দিয়ে গভর্নরকে বললেন– আপনি আমায় এজাযত দিন!

: একটু দেরি করুন! আমি সিপাহসালারকে হুকুমনামা লিখে দিচ্ছি। আপনার সাথে যতো ফৌজের দরকার, তিনি রওয়ানা করে দেবেন। আর আপনিও তাশরিফ রাখুন। তিনি ইবনে সাদেককে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন।

ইবনে সাদেক তাঁর পাশে বসলে তিনি কাগজ নিয়ে হুকুমনামা লিখে নায়ীমের হাতে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন। ইবনে সাদেক বললেন– আমি একবার দেখতে পারি কি?

: খুশির সাথে। বলে গভর্নর হুকুমনামা ইবনে সাদেকের হাতে দিলেন। ইবনে সাদেক তা পড়ে গভর্নরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো– এখন আর এ ব্যক্তির খেদমতের প্রয়োজন নেই। এর জায়গায় আর কোনো লোককে পাঠিয়ে দিন।

গভর্নর হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন– এর সম্পর্কে আপনার সন্দেহ হলো কি করে? উনি হচ্ছেন আমাদের ফৌজের সবচাইতে যোগ্য সালার।

: কিন্তু আপনি জানেন না, এ লোকটি আমিরুল মুমিনীনের নিকৃষ্টতম দুশমন, আর এর নাম জুবায়র নয়, নায়ীম। ইনি দামেশকের কয়েদখানা থেকে ফেরার হয়ে এখানে তাশরিফ এনেছেন।

গভর্নর পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন– এ কথা সত্যি?

নায়ীম নীরব রইলেন।

ইবনে সাদেক বললো– আপনি এখখুনি একে গ্রেফতার করে আমার আদালতে পেশ করুন।

: আমি বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে একজন সালারকে গ্রেফতার করতে পারি না। প্রথম মোলাকাতেই আপনারা পরস্পরের সাথে এমন আচরণ করছেন, যাতে মনে হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে পুরনো বিদ্বেষ রয়েছে। এ অবস্থায় ইনি অপরাধী হলেও এর ভাগ্য নির্ধারণের ভার আমি আপনার ওপর সোপর্দ করবো না।

: আপনার জানা উচিত, আপনি স্পেনের মুফতিয়ে আযমের সাথে কথা বলছেন!

: আর আপনারও জানা উচিত ছিলো, আমি স্পেনের শাসনকর্তা।

: ঠিক, কিন্তু আপনি জানেন না, আমি স্পেনের মুফতিয়ে আযমের চাইতে আরও বেশি কিছু।

নায়ীম বললেন– উনি জানেন না। আমি বলে দিচ্ছি। আপনি আমিরুল মুমিনীনের দোস্ত এবং কুতায়বা বিন মুসলিম, মুহাম্মদ বিন কাসেম ও ইবনে

আমেরের হত্যাকারী। তুর্কিস্তানের বিদ্রোহের মূলে ছিলো আপনার অনুগ্রহ। আর আপনি সেই নির্মম নিষ্ঠুর লোক, যিনি আপন ভাই ও ভাতিজীকে কতল করতে দ্বিধা করেননি। এখন আপনি আমার কাছে অপরাধী।

নায়ীম বিজলী চমকের মতো কোষ থেকে তলোয়ার বের করে তার অগ্রভাগ ইবনে সাদেকের সিনার ওপর রেখে বললেন– আমি বহুত খুঁজেছি তোমায়, কিন্তু পাইনি। আজ কুদরত তোমায় এখানে এনেছেন। আমিরুল মুমিনীনের দোস্ত তুমি! তোমার পরিণাম তাঁর খুবই মর্মবেদনার কারণ হবে কিন্তু আমার কাছে ইসলামের ভবিষ্যত, খলিফার খুশির চাইতে অধিকতর প্রিয়।

নায়ীম তলোয়ার উঁচু করলেন। ইবনে সাদেক কাঁপতে লাগলো বেতসের মতো। মৃত্যুকে মাথার ওপর দেখে সে চোখ বন্ধ করলো। নায়ীম তার অবস্থা দেখে তলোয়ার নীচু করে বললেন– না, তা হয় না। এ তলোয়ার দিয়ে আমি সিন্ধু ও তুর্কিস্তানের ময়দানে কতো উদ্ধত শাহজাদার গর্দান উড়িয়ে দিয়েছি। তোমার মতো নীচ ভীরু কাপুরুষের খুনে আমি এ তলোয়ার রঞ্জিত করবো না। নায়ীম তার তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন। কামরায় ছেয়ে গেলো এক গভীর নিস্তব্ধতা।

এক ফৌজি অফিসার এসে কামরার নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। তিনি এসেই একটা চিঠি দিলেন আন্দালুসের গভর্নরের হাতে। তিনি চিঠিখানা বিস্ফারিত চোখে দু'তিনবার পড়ে নায়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন– যদি আপনার নাম জুবায়র না হয়ে নায়ীম হয়ে থাকে, তাহলে আপনারও খবর আছে এ চিঠিতে। বলতে বলতে তিনি চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলেন নায়ীমের দিকে।

নায়ীম চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। আমিরুল মুমিনীন ওমর বিন আবদুল আজীজের তরফ থেকে চিঠি।

আন্দালুসের গভর্নর তালি বাজালেন। অমনি কয়েকজন সিপাহী এসে দেখা দিলো।

ইবনে সাদেকের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন– ওকে গ্রেফতার করো।

ইবনে সাদেকের ধারণাই হয়নি, তার তাকদিরের সেতারা উদয়ের সাথে সাথেই ঢেকে যাবে এমনি কালো মেঘে।

একদিকে নায়ীম দক্ষিণ পর্তুগালের দিকে চলে যাচ্ছেন শাসনকর্তার পদ গ্রহণের জন্য, অপর দিকে কয়েকজন সিপাহী ইবনে সাদেকের পা শিকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে দামেশকের পথে।

কয়েকদিন পর নায়ীম জানলেন, ইবনে সাদেক দামেশকে পৌঁছার আগেই পথে বিষ খেয়ে তার জিন্দেগী শেষ করে দিয়েছে।

আবদুল্লাহকে চিঠি লেখে নায়ীম ঘরের খবর জানার চেষ্টা করলেন। বহুদিন সে চিঠির জবাব মিললো না। নায়ীম অপেক্ষা করতে করতে অধীর হয়ে তিন মাসের ছুটি নিয়ে গেলেন বসরার দিকে। নার্গিস তখনও তার সাথে। তাই সফরে বিলম্ব হলো। ঘরে পৌঁছে তিনি জানলেন, আবদুল্লাহ খোরাসানে চলে গেছেন। আযরাকেও নিয়ে গেছেন সাথে। নায়ীম খোরাসানে যেতে চাইলেন কিন্তু স্পেনের উত্তর দিকে ইসলামী ফৌজের অগ্রগতির কারণে তিনি নিজের ইরাদা মুলতবি রেখে নিরুপায় হয়ে ফিরে গেলেন।

১৫

দিন আসে, দিন যায়... ...!

এমনি করে কত মাসের পর মাস, বছরের পর মিশে যায় অতীতের কোলে। নায়ীম দক্ষিণ পর্তুগালের শাসনকর্তার পদ গ্রহণের পর কেটে যায় আঠারো বছর। তাঁর যৌবন চলে গিয়ে বার্ধক্য আসে। কালো দাড়ি সাদা হয়ে আসে। নার্গিসের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু তার দেহ-সৌন্দর্য চোখে পড়ার মতো কোনো পরিবর্তন নেই।

তাদের বড় ছেলে আবদুল্লাহ বিন নায়ীম পনের বছরে পা দিয়ে ভর্তি হয়েছেন স্পেনের ফৌজে। তিন বছরের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি এমন করে ছড়িয়ে পড়েছে যে, বাহাদুর পুত্ররত্নের গর্বে ফুলে ওঠে নার্গিস ও নায়ীমের বুক। দ্বিতীয় পুত্র হোসাইন বড় ভাইয়ের চাইতে আট বছরের ছোট।

একদিন হোসাইন বিন নায়ীম বাড়ির আঙিনায় এক কাঠের ফলককে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তীরন্দাজির অভ্যাস করছে। নার্গিস ও নায়ীম বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন তাদের কলিজার টুকরার দিকে। হোসাইনের কয়েকটি তীর নিশানায় লাগলো না। নায়ীম হাসিমুখে হোসাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হোসাইন লক্ষ্য স্থির করে বাপের দিকে তাকিয়ে নিশানা করলো।

: বেটা, তোমার হাত কাঁপছে আর তোমার গর্দান উঁচু করে রেখেছো।

: আব্বাজান! আপনি যখন আমার মতো ছিলেন তখন কি আপনার হাত কাঁপতো না?

: তোমার বয়সে আমি উড়ন্ত পাখিকে জমিনে ফেলে দিয়েছি। আর যখন আমি

তোমার চাইতে চার বছরের বড় ছিলাম, তখন আমি বসরার ছেলেদের মধ্যে সবচাইতে বড় তীরন্দাজ বলে নাম করেছি।

: আব্বাজান! আপনি নিশানা লাগিয়ে দেখুন না!

নায়ীম তার হাত থেকে ধনুক নিয়ে চালালে তীর গিয়ে লাগলো লক্ষ্যের ঠিক মাঝখানে। তারপর তিনি পুত্রকে নিশানা লাগাবার তরিকা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। নার্গিসও এসে দাঁড়ালেন তাদের কাছে।

এক নওজোয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাড়ির ফটকে। নওকর ফটক খুললো। সওয়ার ঘোড়ার বাগ নওকরের হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকলেন বাড়ির আঙিনায়।

নায়ীম পুত্র আবদুল্লাহকে দেখে তাকে বুকে চেপে ধরলেন। নার্গিস হাজারো দোয়া-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বললেন– বেটা! তুমি এসেছো? আলহামদুলিল্লাহ!

নায়ীম জিজ্ঞেস করলেন– কি খবর নিয়ে এলে বেটা?

আবদুল্লাহ বিন নায়ীম মাথা নত করে বিষণ্ন মুখে বললেন– আব্বাজান! কোনো ভালো খবর নেই। ফ্রান্সের লড়াইয়ে আমরা কঠিন ক্ষতি স্বীকার করে ফিরে এসেছি। ফ্রান্সের অনেকগুলো এলাকা জয় করে আমরা প্যারিস নগরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন খবর পেলাম, ফ্রান্সের রাজা এক লাখ ফৌজ নিয়ে মোকাবেলা করতে আসছেন আমাদের। আমাদের ফৌজ আঠারো হাজারের বেশি ছিলো না। আমাদের সিপাহসালার ওকবা কর্ডোভা থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকে খবর এলো, মরক্কোতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তাই ফ্রান্সের দিকে বেশি সংখ্যক ফৌজ পাঠানো যাবে না। নিরুপায় হয়ে আমরা ফ্রান্সের রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলা করলাম এবং আমাদের অর্ধেকের বেশি সিপাহী ময়দানে ভূপাতিত হলো।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– ওকবা এখন কোথায়?

: তিনি কর্ডোভায় পৌঁছে গেছেন এবং শিগগিরই মরক্কোর দিকে অগ্রসর হবেন। বিদ্রোহের আগুন মরক্কো থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তিউনিসের দিকে। বার্বার বাহিনী তামাম মুসলমান হাকিমকে কতল করে ফেলেছে। জানা গেছে, এ বিদ্রোহে খারেজী ও রোমকদের হাত আছে।

নায়ীম বললেন– ওকবা এক বাহাদুর সিপাহী বটে; কিন্তু যোগ্য সিপাহসালার নয়। আমাকে ফৌজে নেবার জন্যে আমি স্পেনের গভর্নরকে লিখেছিলাম।

কিন্তু তিনি মানলেন না।

: আচ্ছা আব্বাজান, আমায় এজাযত দিন!

নার্গিস প্রশ্ন করলেন– এজাযত! কোথায় যাবে তুমি?

: আম্মি! আপনাকে ও আব্বাজানকে দেখে যেতেই শুধু এসেছিলাম। ফৌজের সাথে আমায় যেতে হবে মরক্কোর দিকে।

নায়ীম বললেন– আচ্ছা, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেফাযত করুন।

: আচ্ছা আম্মি, আল্লাহ হাফেয! বলে আবদুল্লাহ হোসাইনকে একবার বুকের সাথে লাগিয়ে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

বার্বারদের বিদ্রোহে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে। তারা মুসলমান শাসনকর্তাদের হত্যা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ওকবা মরক্কোর উপকূলে অবতরণ করলেন এবং ১২৩ হিজরীতে তাঁর সাহায্যের জন্যে শাম থেকে কিছুসংখ্যক ফৌজ পৌঁছে। ঘোরতর লড়াই হলো। বার্বার বাহিনী চারদিক থেকে বেরিয়ে এলো সয়লাবের মতো। হিস্পানিয়া ও শামের সেনাবাহিনী ভীষণভাবে তাদের মোকাবেলা করলো। কিন্তু অগণিত প্রতিদ্বন্দ্বী ফৌজের সামনে তারা টিকতে পারলেন না। ওকবা লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হলেন এবং মুসলিম ফৌজের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। বার্বাররা চারদিক থেকে বেষ্টন করে মুসলিম সেনাদের কতল করতে লাগলো।

নায়ীমের বেটা আবদুল্লাহ দুশমনদের বিরুদ্ধে সারি ভেদ করে এগিয়ে গেলেন বহু দূরে। তিনি জখমী হয়ে যখন ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক আরবী সালার তার কোমরে হাত দিয়ে তাকে তুলে ঘোড়ার ওপর বসালেন এবং তাকে নিয়ে পৌঁছে দিলেন ময়দানের বাইরে এক নিরাপদ জায়গায়।

হিস্পানিয়া ও শামের সেনাবাহিনী প্রায় তিন চতুর্থাংশ নিহত হলো। বাকী সিপাহীরা সরে যেতে লাগলো একদিকে। বার্বাররা তাদের পিছপা হতে দেখে অনুসরণ করলো কয়েক মাইল। পরাজিত ফৌজ আল-জাযায়েরে গিয়ে দম ফেললো।

স্পেনের গভর্নরের কাছে এ পরাজয়ের খবর পৌঁছলে তিনি হিস্পানিয়ার সব প্রদেশ থেকে নয়া ফৌজ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন এবং এ নয়া ফৌজের নেতৃত্ব নেবার জন্য নির্বাচন করলেন নায়ীমকে। নায়ীম তার বেটার চিঠিতে জখমী

হবার ও এক আরব সালারের ত্যাগ স্বীকারের ফলে জানে বেঁচে যাবার খবর পেয়েছেন আগেই। ১২৫ হিজরীতে যখন বার্বার বাহিনী তামাম উত্তর আফ্রিকায় জুলুমের তাণ্ডব-নৃত্য চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন নায়ীম আচানক দশ হাজার সিপাহী নিয়ে অবতরণ করলেন আফ্রিকার উপকূলে। বার্বাররা তাদের আগমন সম্পর্কে বেখবর ছিলো। নায়ীম তাদের বার বার পরাজিত করে এগিয়ে চললেন পূর্ব দিকে।

ওদিকে আল্-জাযায়ের থেকে পরাজিত সৈনিকরাও অগ্রাভিযান শুরু করে। বার্বারদের দমন করা হতে লাগলো দু'দিক থেকে। এক মাসের মধ্যে মরক্কোর বিদ্রোহের আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কিন্তু আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব এলাকার কোথাও কোথাও তখনও এ বিপদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খারেজী ও বার্বাররা মরক্কো থেকে সরে গিয়ে তিউনিসকে তাদের কর্মকেন্দ্র বানায়। নায়ীম তখন মরক্কোর ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত। তাই তিনি তিউনিসের দিকে যেতে পারলেন না। তিনি ফৌজের বাছাই করা অফিসারদের নিজের খিমায় একত্র করে তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতা করে বললেন– তিউনিসের ওপর হামলা করার জন্য একজন জীবনপণকারী সালারের প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে কে এ খেদমতের জিম্মা নিতে তৈরি আছেন?

নায়ীমের কথা শেষ না হতেই তিন জন মুজাহিদ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে একজন তার পুরনো দোস্ত ইউসুফ, দ্বিতীয় তার নওজোয়ান বেটা আবদুল্লাহ, আর তৃতীয় নওজোয়ানের চেহারা-আকৃতি আবদুল্লাহর সাথে অনেকটা মিলে। কিন্তু নায়ীম তাকে চেনেন না।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– তোমার নাম কি?

নওজোয়ান উত্তর দিলেন– আমার নাম নায়ীম।

: নায়ীম বিন?

নওজোয়ান জবাব দিলেন– নায়ীম বিন আবদুল্লাহ।

নায়ীম প্রশ্ন করলেন– আবদুল্লাহ! আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান?

: জি হ্যাঁ!

নায়ীম এগিয়ে এসে নওজোয়ানকে বুকে চেপে ধরে বললেন– আমায় চেনো তুমি?

: জি হ্যাঁ! আপনি আমাদের সিপাহসালার।

: তাছাড়া আমি আরও কিছু। নওজোয়ানের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নায়ীম বললেন– আমি তোমার চাচা। আবদুল্লাহ! এ তোমার ভাই।

: আব্বাজান! ইনিই তো আমার জান বাঁচিয়েছিলেন মরক্কোর লড়াইয়ের সময়।

নায়ীয় প্রশ্ন করলেন– ভাইয়া কেমন আছেন?

: দু'বছর হলো তিনি শহীদ হয়েছেন। এক খারেজী তাঁকে কতল করেছে।

নায়ীমের অন্তর ধড়ফড় করে ওঠলো। খানিকক্ষণ তিনি নীরব রইলেন। হাত তুলে তিনি মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে প্রশ্ন করলেন– তোমার ওয়ালেদা?

: তিনি ভালো আছেন।

: তোমার ভাই কটি?

: এক ভাই আর একটি ছোট বোন?

নায়ীম বাকি অফিসারদের বিদায় করে তাদের যাবার পর নিজের কোমর থেকে তলোয়ার খুলে নায়ীম বিন আবদুল্লাহকে দিতে দিতে বললেন– তুমি এ আমানতের হকদার, আর তুমি এখানেই থাক। আমি নিজেই যাব তিউনিসের দিকে।

: চাচাজান! আমায় কেন পাঠাচ্ছেন না?

: বেটা, তুমি জোয়ান। তোমরা দুনিয়ার প্রয়োজনে আসবে। আজ থেকে তুমি এখানকার সেনাবাহিনীর সিপাহসালার। ... ... আবদুল্লাহ! ইনি তোমার বড় ভাই। এঁর হুকুম মনেপ্রাণে মেনে নেবে।

নায়ীম বিন আবদুল্লাহ বললেন– চাচাজান! আপনার কাছে কিছু বলার আছে আমার।

: বলো বেটা!

: আপনি ঘরে যাবেন না?

: বেটা, তিউনিস অভিযানের পর আমি শিগগিরই ঘরে যাবো।

: চাচাজান! অবশ্যই যাবেন। আম্মি প্রায়ই আপনাকে মনে করেন। আমার ছোট বোন আর ভাইও আপনার কথা বলে বার বার।

: তিনি কি জানেন আমি জীবিত রয়েছি?

: আম্মির বিশ্বাস ছিলো আপনি জীবিত আছেন। তিনি আমায় মরক্কো অভিযানের পর স্পেনে গিয়ে আপনাকে তালাশ করার তাকিদ করেছেন এবং চাচীকে নিয়ে আপনাকে ঘরে তাশরিফ নিতে বলেছেন।

: আমি খুব শিগগিরই ওখানে পৌঁছে যাবো। আবদুল্লাহ্ তুমি আন্দালুসে চলে যাও। ওখান থেকে তোমার মাকে নিয়ে খুব শিগগিরই ঘরে পৌঁছে যাবে। তিউনিস থেকে কর্তব্য শেষ করে আমি আসবো। আমি আন্দালুসের গভর্নরকে চিঠি লেখছি। তিনি তোমাদের সাগর-পথে সফরের ব্যবস্থা করে দেবেন।

* * *

তিউনিস বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে নায়ীমকে বহুবিধ অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বার্বার বিদ্রোহীরা এক জায়গায় পরাজয় স্বীকার করে অপর জায়গায় গিয়ে লুটপাট করতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকটি সংঘর্ষের পর তিনি তিউনিসের বিদ্রোহ দমন করেছেন। তিউনিস থেকে বিদ্রোহী দল পিছপা হয়ে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নায়ীম বিদ্রোহীদের দমন করার সিদ্ধান্ত স্থির করে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। তিউনিস ও কায়রোয়ানের মাঝখানে বিদ্রোহীরা কয়েকবার মোকাবেলা করলো নায়ীমের ফৌজের সাথে, কিন্তু তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। কায়রোয়ানের কাছে যে শেষ লড়াই হয়, তাতে নায়ীম গুরুতর আহত হন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে কায়রোয়ানে নেয়া হয়। সেখানকার শাসনকর্তা তাকে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করাবার জন্য ডাকলেন এক অভিজ্ঞ চিকিৎসককে। বহুক্ষণ পর নায়ীমের হুশ ফিরে এলো। কিন্তু প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলে তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি দিনের মধ্যে কয়েকবার মূর্ছা যেতে লাগলেন। এক সপ্তাহকাল নায়ীম জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের ভেতরে বিছানায় পড়ে রইলেন। তার অবস্থা দেখে কায়রোয়ানের গভর্নর ফেসতাত থেকে এক মশহুর হাকিমকে ডেকে পাঠান। হাকিম নায়ীমের জখম পরীক্ষা করে তাঁকে আশ্বাস দিলেন। তবে এও বললেন– তাঁকে দীর্ঘকাল শুয়ে শুয়ে কাটাতে হবে।

তিন সপ্তাহ পর নায়ীমের অবস্থা কিছুটা ভালো হলে তিনি ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হাকিম বললেন– জখম এখনও সারেনি। সফরে ওগুলো ফেটে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আপনাকে কমপক্ষে আরো এক

মাস চিকিৎসা করাতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে, কোনো বিষাক্ত হাতিয়ার থেকে এসব আঘাত লেগেছে। হয় তো রক্ত বিষাক্ত হয়ে আবার খারাপ কিছু হতে পারে।

* * *

নায়ীম আর এক সপ্তাহ দেরী করলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে যাবার জন্য তাঁর অস্থিরতা বেড়ে চললো প্রতি মুহূর্তে। বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করে তিনি কাটিয়ে দেন সারা রাত। মন চায়, আর একবার তিনি উড়ে যান তার দুনিয়ার বেহেশতে।

তার বিশ্বাস, নার্গিস পৌঁছে গেছেন সেখানে। আযরার সাথে বালুর ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে তিনি তার পথ চেয়ে রয়েছেন।

আরও বিশ দিন চলে গেলো। যে জখম কতকটা সেরে এসেছিলো, তা আবার খারাপ হতে লাগলো। হালকা হালকা জ্বর হতে লাগলো। হাকিম তাকে বললেন– এসব বিষাক্ত হাতিয়ারের জখমের ফল। তার শিরা-উপশিরায় বিষক্রিয়া হয়ে গেছে। বেশ কিছু দিন সেখানে থেকে চিকিৎসা করাতে হবে।

একদিন মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে বিছানায় শুয়ে নায়ীম চিন্তা করছেন– ঘরে ফিরে তিনি আযরাকে কি অবস্থায় দেখবেন। সময় তার নিষ্পাপ মুখে কতটা পরিবর্তন এনেছে। তার বিষাদক্লিষ্ট রূপ দেখে কি ভাবের উদয় হবে তার মনে। তার মনে আরও খেয়াল জাগে– হয় তো এখনও তার ঘরে ফিরে যাওয়া কুদরতের মনযুর নয়। তিনি আগেও কতবার জখমি হয়েছেন। কিন্তু এবারকার জখমের অবস্থা অন্য রকম। তিনি মনে মনে বলেন– এ জখমের ফলেই হয় তো আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো। কিন্তু নার্গিস ও আযরার কাছে কত কথা আছে বলার। নিজের ছেলে ও ভাতিজাদের কত উপদেশ দেয়া দরকার। মৃত্যুর ভয় নেই আমার। মৃত্যু নিয়ে তো আমি হামেশা খেলেছি। কিন্তু এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা আমি করবো না। আযরা আমায় ঘরে ফিরে যাবার পয়গাম পাঠিয়েছে। ... সেই আযরা– যার মামুলি ইচ্ছার জন্য আমি জীবনবাজি রাখা সহজ মনে করেছি। তাছাড়া নার্গিসের অবস্থাই বা কি হবে? আমি তো অবশ্যই চলে যাবো, কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না।

বলতে বলতে নায়ীম বিছানা থেকে ওঠে বসেন। মুজাহিদের দৃঢ় সংকল্প শারীরিক দুর্বলতার ওপর জয়ী হলো। মানসিক প্রেরণার বলে তিনি ওঠে টহল দিতে লাগলেন কামরার মধ্যে। তিনি জখমী, তা তার মনে নেই। তার শারীরিক অবস্থা দীর্ঘ সফরের উপযোগী নয়– তা তিনি ভুলে গেছেন বিলকুল। তখন তার কল্পনায় ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু নার্গিস, আযরা, আবদুল্লাহর ছোট বাচ্চা আর বস্তির সুদৃশ্য বাগ-বাগিচার রূপ। 'আমি নিশ্চয়ই চলে যাবো'– এই হলো তার শেষ সিদ্ধান্ত।

তিনি কামরার ভেতর টহল দিতে দিতে আচানক থেমে গিয়ে মেজবানের নওকরকে আওয়াজ দিলেন। নওকর ছুটে এসে কামরায় ঢুকে নায়ীমকে শুয়ে না থেকে পায়চারী করতে দেখে হতবম্ব হয়ে গেলো। সে বললো– হাকিম সাহেবের হুকুম, আপনি চলাফেরা করবেন না।

: তুমি আমার ঘোড়া তৈরি করে দাও।

: আপনি কোথায় যাবেন?

: তুমি ঘোড়া তৈরি করোগে।

: কিন্তু এখন?

নায়ীম কঠোর স্বরে বললেন– এখ্খুনি!

: রাতের বেলা আপনি কোথায় যাবেন?

: যা তোমায় বলেছি তাই করো। কোনো বাজে প্রশ্নের জবাব নেই আমার কাছে।

নওকর ঘাবড়ে গিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

নায়ীম আবার বিছানার ওপর বসে ভাবনার দুনিয়ায় হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। খানিকক্ষণ পর নওকর ফিরে এসে বললো– ঘোড়া তৈরি, কিন্তু ...!

নায়ীম তার কথার মাঝখানে জবাব দিলেন– তুমি কি বলতে চাও, তা আমি জানি। আমার একটা জরুরি কাজ রয়েছে। তোমার মালিককে বলবে, তার এজাযত হাসিল করার জন্য এত রাতে তাঁকে জাগানো আমি ঠিক মনে করিনি।

ভোর হবার আগেই নায়ীম কায়রোয়ান থেকে দুই মনযিল আগে চলে গেছেন। এতটা পথ তিনি বেশ হুশিয়ার হয়েই চলেছেন। ঘোড়া তিনি জোরে হাঁকাননি। এক এক মনযিলের পর খানিকটা বিশ্রাম করেছেন। ফেসতাতে গিয়ে তিনি

দু'দিন সেখানে থাকলেন। এখানকার শাসনকর্তা নায়ীমকে তার কাছে থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নায়ীম যখন কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন তিনি পথের সব চৌকিকে জানিয়ে দিলেন তাঁর আগমন সংবাদ। তাঁর সফরের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে তিনি হুকুম জারি করলেন।

নায়ীম যতোই এগিয়ে যান মনযিলে মকসুদের দিকে, ততই শরীরের অবস্থা ভালো বোধ করেন। কয়েকদিন পর তিনি এক মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন। কয়েক ক্রোশ পরেই তার বস্তি। প্রতি পদক্ষেপে তার মনে জাগে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ-সাগরে ভেসে চলে তার মন। আচানক ধূলিরাশি দেখা গেলো। খানিকক্ষণ পর পূর্ব-দিগন্তে অন্ধকার ধূলিঝড় ছেয়ে ফেললো চারদিক। চারদিক ধুলোর অন্ধকার মরুভূমির তুফানের খবর নায়ীম জানেন ভালো করে। তিনি চাইলেন মরুঝড়ের মসিবতে পড়ার আগেই ঘরে পৌঁছতে। ঘোড়ার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠলো। প্রথম ঝাপটায় তিনি ঘোড়া ছুটিয়েছেন পূর্ণগতিতে। বাতাসের তেজ আর চারদিকের অন্ধকার বেড়ে চলেছে। ঘোড়া ছুটানোর ফলে নায়ীমের সিনার জখম ফেটে রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে। সে অবস্থায় তিনি অতিক্রম করেছেন দুই ক্রোশ। ঝড়ের হামলা চলছে পূর্ণ বিক্রমে, ঝলসে ওঠা বালু ছুটে আসছে তার দিকে। চলার পথ না পেয়ে ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে নায়ীম ঘোড়া থেকে নেমে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। নায়ীম তার মুখে ছুটে আসা বালু থেকে বাঁচার জন্য মুখ-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাবলা কাঁটা আর ডালপালা বাতাসের বেগে ছুটে এসে তার গায়ে লেগে চলে যাচ্ছে। নায়ীম এক হাতে ঘোড়ার বাগ ধরে অপর হাতে নিজের কাপড়-চোপড় থেকে কাঁটা ডাল ছাড়াচ্ছিলেন। ঘোড়ার বাগের উপর তাঁর হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এসেছে। হঠাৎ বাবলার একটা শুকনো ডাল উড়ে এসে ঘোড়ার পিঠে লাগলো বেশ জোরে। ঘোড়াটা এক লাফে নায়ীমের হাত ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ালো কিছুটা দূরে। আর একটা কাঁটার ডাল এসে ঘোড়ার কানে কাঁটা ফুটিয়ে চলে গেলে ঘোড়াটা একদিকে ছুটে পালালো। নায়ীম বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন অসহায় অবস্থায়। সিনার জখম ফেটে তার কামিজ রক্তধারায় প্লাবিত হয়ে গেছে। আর মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে আসছে তার দেহের শক্তি। ভয়ে তিনি ওঠে কাপড় ঝাড়েন, আবার বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর রাতের নিকষ কালো আবরণ আরো বাড়িয়ে তুললো ঝড়ের অন্ধকার। রাতের এক প্রহর কেটে যাবার পর বাতাসের বেগ শেষ হলো। ধীরে ধীরে আসমান পরিষ্কার হলে হেসে ওঠলো দীপ্তিমান সেতারারাজি।

নায়ীমের বস্তি আট ক্রোশ দূরে। ঘোড়া কোথায় চলে গেছে! পায়ে নেই চলার শক্তি। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে এসেছে। তার মনে খেয়াল এলো, ভোর হবার আগে এ বালুর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছলে দিনের প্রখর রোদে তাকে মরতে হবে ধুঁকে ধুঁকে।

নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় পথ দেখে নিয়ে তিনি চলতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। এক ক্রোশ গিয়ে তার পা আর চলে না। হতাশ হয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন বালুর ওপর। মনযিলের এত কাছে এসে হিম্মত হারানো মুজাহিদের সংকল্প ও সহিষ্ণুতার খেলাফ। তিনি আর একবার কাঁপতে কাঁপতে ওঠে পা বাড়ালেন মনযিলে মকসুদের দিকে। বালুর মধ্যে পা বসে যায়। চলতে চলতে তিন বার তিনি পড়ে গেলেন। আবার সংকল্প দৃঢ় করে ওঠে তিনি এগিয়ে চলার চেষ্টা করলেন। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে, আর দুর্বলতার দরুন তার চোখে ছেয়ে আসছে অন্ধকার। মাথা ঘুরছে ভীষণভাবে। বস্তি এখনও চারক্রোশ দূরে। তিনি জানেন, বস্তির দিকে প্রবহমান নদীটি এখান থেকে কাছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে একবার পড়ে আবার ওঠে আরও এক ক্রোশ গেলে তার নজরে পড়লো তার বহু পরিচিত নদীটি।

নদীর পানি ঝড়ের ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে গেছে। নদীর পানিতে ভাসছে বেশুমার ডালপালা। নায়ীম সাধ মিটিয়ে পান করলেন নদীর পানি। নদীর কিনারে খানিক্ষণ শুয়ে থেকে তাঁর মনে এসেছে কিছুটা শান্তি। তাই তিনি আবার পথচলা শুরু করলেন।

নদী পার হলে তার নজরে পড়লো বস্তির বাগ-বাগিচা। ক্লান্তি ও দৈহিক দুর্বলতার অনুভূতি কমে এলো অনেকখানি। প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে যাচ্ছে তাঁর চলার বেগ। খানিকক্ষণ পরেই তিনি পার হতে লাগলেন বালুর টিবি– যেখানে ছেলেবেলায় তিনি খেলা করতেন আযরাকে নিয়ে, গড়ে তুলতেন ছোট ছোট বালুর ঘর। তারপর উঁচু খেজুর গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন নিজের ঘরের দিকে। কম্পিত বুক চেপে ধরে কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়। তারপর সাহস করে দরজায় করাঘাত করলেন। ঘরের বাসিন্দারা একে অন্যকে জাগাতে লাগলেন। এক যুবতী এসে দরজা খুললো। নায়ীম হয়রান হয়ে যুবতীর দিকে তাকালেন। এ যে হুবহু আযরাই চেহারা। নায়ীমকে দেখে মেয়েটি ফিরে গেলো ঘরের ভেতরে। একটু পরেই তার পুত্র আবদুল্লাহ ও নার্গিস এসে হাজির হলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আবদুল্লাহ ও নার্গিসের পেছনে কম্পিত পদে এসে দাঁড়ালেন আযরা।

চাঁদের রৌশনিতে নায়ীম দেখলেন– সৃষ্টির সৌন্দর্য-রানীর যৌবনের দীপ্তিতে ভাটা এলেও তার মুখের যে মোহময় আকর্ষণ, আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

নায়ীম বেদনার্ত আওয়াজে ডাকলেন– বোন!

আযরা অশ্রুসজল চোখে আওয়াজ জবাব দিলেন– ভাই!

নার্গিস এগিয়ে ভালো করে তাকালেন নায়ীমের দিকে। তার কামিজে রক্তের দাগ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন– আপনি কি আহত?

আযরা সন্ত্রস্ত মুখে বললেন– আহত!

এতক্ষণ যে দৃঢ় সংকল্প তার দৈহিকশক্তি অটুট রেখেছিলো, তা মুহূর্তে ভেঙে পড়লো।

তিনি বললেন– আবদুল্লাহ! বেটা, আমায় ধরো!

আবদুল্লাহ তাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ভোর বেলায় নায়ীম বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। নার্গিস, আযরা, আবদুল্লাহ বিন নায়ীম, হোসাইন বিন নায়ীম, আযরার ছোট ছেলে খালেদ ও মেয়ে আমেনা তার শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে। নায়ীম চোখ খুলে সবার দিকে তাকালেন। ইশারায় খালেদ ও আমেনাকে ডেকে কাছে বসালেন।

: বেটা, তোমার নাম কি?

: খালেদ!

মেয়েটিকে লক্ষ্য করে নায়ীম প্রশ্ন করলেন– আর তোমার?

সে জবাব দিলো– আমেনা। খালেদের বয়স সতেরো বছরের কাছাকাছি মনে হয়। আমেনার চেহারা দেখে বয়স চৌদ্দ পনেরো অনুমান করা যায়।

নায়ীম খালেদকে লক্ষ্য করে বললেন– বেটা, আমাকে কুরআন মাজীদ পড়ে শোনাও।

খালেদ শিরিন আওয়াজে সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করলেন।

পরদিন ফেটে যাওয়া জখম আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। নায়ীমের ভীষণ জ্বর দেখা দিলো। সিনার জখম থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। রক্ত কমে যাওয়ায় তিনি মূর্ছা যাচ্ছেন বার বার। এমনি করে এক সপ্তাহ কেটে গেলো। আবদুল্লাহ বসরা থেকে এক হাকিম নিয়ে এলেন। তিনি প্রলেপ পট্টি বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হলো না।

নায়ীম একদিন খালেদকে প্রশ্ন করলেন— বেটা! তুমি এখনও জেহাদে যাওনি?

: চাচাজান, আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। খালেদ জবাব দিলো— আমার চলে যাবার কথা ছিল কিন্তু ...।

: তুমি চলে যাবে তো গেলে না কেন?

: চাচাজান! আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে...।

: বেটা! জেহাদের জন্য মুসলমানকে ছেড়ে যেতে হয় দুনিয়ার সবচাইতে প্রিয় বস্তু। আমার জন্য চিন্তা করো না তুমি। তোমার ফরয তুমি পূর্ণ করো। তোমার ওয়ালেদা কি তোমায় শেখাননি, মুসলমানের সবচাইতে বড় ফরয হচ্ছে জেহাদ!

: চাচাজান! আম্মি আমাদের ছেলেবেলা থেকেই শিখিয়েছেন এ সবক। আমি একটা দিন শুধু আপনার শুশ্রূষার জন্য থেকে গেছি। আমার ভয় ছিলো, যদি আমি আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে যাই, তাতে আপনি হয় তো রাগ করবেন।

: আমার মাওলার খুশিতেই আমার খুশি। যাও, আবদুল্লাহকে ডেকে নিয়ে এসো।

খালেদ আর এক কামরা থেকে আবদুল্লাহকে ডেকে আনলেন। নায়ীম প্রশ্ন করলেন— বেটা! তোমার ছুটি এখনও শেষ হয়নি?

: আব্বাজান! পাঁচ দিন আগে আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে।

: তুমি কেন গেলে না বেটা?

: আব্বা, আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষা করছিলাম।

নায়ীম বললেন— বেটা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের হুকুমের পর আর কারো হুকুমের প্রয়োজন নেই। যাও বেটা! যাও।

: আব্বা! আপনার তবিয়ত কেমন?

নায়ীম মুখের ওপর আনন্দের দীপ্তি টেনে আনার চেষ্টা করে বললেন— তুমি যাও বেটা! আমি ভালোই আছি!

: আব্বা! আমরা তৈরি।

খালেদ ও আবদুল্লাহ নিজ নিজ ঘোড়ায় যিন লাগাচ্ছেন। তাদের মায়েরা দু'জন কাছে দাঁড়ানো। নায়ীম তাদের চলে যাবার দৃশ্য চোখে দেখার জন্য তার কামরার দরজা খুলে রাখার হুকুম দেন। তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে

আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। আমেনা প্রথমে তলোয়ার বেঁধে দিলো তার ভাই খালেদের কোমরে, তার পর লাজকুণ্ঠিতভাবে আবদুল্লাহর কোমরে। নায়ীম ওঠে কামরার বাইরে যেতে চাইলেন। কিন্তু দু'তিন কদম গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ও খালেদ তাকে তোলার জন্য ছুটে এলেন। কিন্তু তাদের আসার আগেই নায়ীম ওঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন– আমি বিলকুল ঠিকই আছি। একটু পানি দাও।

আমেনা পানির পেয়ালা এনে দিলো। নায়ীম পানি পান করে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন।

: বেটা! তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে, তাই আমি দেখবো এখানে দাঁড়িয়ে। তোমরা জলদি সওয়ার হও।

খালেদ ও আবদুল্লাহ সওয়ার হয়ে বাড়ির বাইরে বেরুলেন। নায়ীমও ধীরে ধীরে পা ফেলে গেলেন বাড়ির বাইরে।

নার্গিস বললেন– আপনি আরাম করুন। আপনার বিছানা ছেড়ে ওঠা ঠিক নয়।

নায়ীম তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন– নার্গিস! আমি ভালো আছি। তুমি চিন্তা করো না।

বাগিচার বাইরে গিয়ে খালেদ ও আবদুল্লাহ 'আল্লাহ হাফেয' বলে ঘোড়া ছোটালেন দ্রুতগতিতে। নায়ীম দূর পর্যন্ত তাদের দেখার জন্য বালুর টিবির ওপর চড়লেন। নার্গিস ও আযরা পেরেশান হয়ে তাকে মানা করলেন। কিন্তু নায়ীম পরোয়া করলেন না। তাই তারাও টিবির ওপর চড়লেন নায়ীমের সঙ্গে। দুই তরুণ মুজাহিদ ঘোড়া ছুটিয়ে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেলেন বহু দূর দিগন্তে, ততক্ষণ নায়ীম সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি জমিনের ওপর বসে সেজদায় মাথা নত করলেন।

নায়ীমকে দীর্ঘ সময় সেজদায় পড়ে থাকতে দেখে আযরা ঘাবড়ে গিয়ে কাছে এসে ধরা গলায় 'ভাই' বলে ডাকলেন। কিন্তু নায়ীম মাথা তুললেন না। নার্গিস ভয় পেয়ে নায়ীমের বাহু ধরে নাড়া দিলেন। নায়ীমের দেহ নড়ছে না। নার্গিস তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে অলক্ষ্যে বলে ওঠলেন– 'আমার স্বামী, স্বামী আমার!'

আযরা তার নাড়ির ওপর হাত রেখে আমেনাকে বললেন– বেটি, উনি বেহুশ হয়ে পড়েছেন। যাও, জলদি পানি নিয়ে এসো।

আমেনা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে পেয়ালা ভরে পানি আনলো। আযরা নায়ীমের মুখে পানির ঝাপটা দিলেন। নায়ীমের হুশ ফিরলে তিনি চোখ খুলে পেয়ালা মুখে নিলেন।

আযরা বললেন– হোসাইন, যাও! বস্তি থেকে কয়েকটি লোক ডেকে আন। তারা ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

নায়ীম বললেন– না, না, থামো! আমি নিজেই যেতে পারবো।

নায়ীম ওঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। বুকে হাত রেখে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

নার্গিস চোখ মুছতে মুছতে বললেন– আমার স্বামী! আমার মালিক!!

নায়ীম নার্গিসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আযরা, আমেনা ও হোসাইনের দিকে তাকালেন। সবারই চোখে পানি ছলছল করছে। ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন– হোসাইন, বেটা! তোমার চোখে আঁসু দেখে বড়ই তকলিফ হচ্ছে আমার। মুজাহিদের বেটা জমিনের ওপর চোখে আঁসু ফেলে না, ফেলে বুকের রক্ত। নার্গিস, তুমিও সংযত হও। আযরা, দোয়া করো আমার জন্য।

জীবনের তরণী মৃত্যুর তুফানের আঘাতে টলমল করছে। নায়ীম কালেমা শাহাদাত পড়ার পর অস্পষ্ট আওয়াজে কয়েকটি কথা বলে চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

স মা প্ত